কৃষ্ণরাও

বৃক্ষরাজ

শ্রীগোরক্ষচন্দ্র দত্ত

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩২৪

মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২ দুর্গাপিতুরী লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীঅম্বিকাচরণ বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ৪।৫ ষ্টিফেন হাউস হইতে শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রস্তাবনা

গল্পগুলি কাল্পনিক। যে দেশে আমার সারা কর্ম্মজীবন কাটিয়াছে, বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়, এই আমার উদ্দেশ্য। বাঙ্গলা সাহিত্যের দরবারে ঢুকিবার দুরাশা আমার নাই।

—লেখক

কৃষ্ণরাও

আমাদের এই যে বিশাল সংসার, এর প্রকৃত স্বরূপ বোঝা বড় কঠিন। কজনই বা বোঝে? বর্ণনা করতে গিয়ে একে কেউ বলে ভবের হাট, কেউ বা বলে ভবের নাট, আবার কেউ বা বলে আজব চিড়িয়াখানা। কিন্তু এই সংসারের অন্তঃস্থল দিয়ে যে একটা তীব্র কান্নার সুর বেজে যাচ্ছে, তার আভাস হাটে নাটে চিড়িয়াখানায় পাওয়া যায় না। আমি ত বুঝি সংসার এক বিস্তীর্ণ মরুভূমি। এখানে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ আছে, দিগন্তবিস্তৃত বালির রাশি আছে, মাঝে মাঝে এক আধটা সুন্দর সুশীতল ওয়েসিস্‌ও আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশী আছে অনন্ত পিপাসা, আর পিপাসাতুরকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবার জন্য মায়াবিনী মরীচিকা। তৃষ্ণাতুর হরিণ এক চুমুক জলের জন্য ভীষণ রোদে চারিদিকে পাগলের মত ঘুরছে। এমন সময় দূরে দেখলে সুন্দর সবুজ গাছের তলায় শান্ত স্নিগ্ধ হ্রদ। দিলে এক ছুট। এইবার জল খেয়ে প্রাণ বাঁচবে। কিন্তু যত যায়, হ্রদও তত পেছিয়ে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দৌড়ে শেষে আর পা চলে না, টলতে টলতে ঘাড় মটকে পড়ল তপ্ত বালির উপর। তৃষ্ণা মিটল চিরদিনের জন্য। আর তার জলের দরকার হবে না। এই মৃগ-তৃষ্ণিকা। সংসারে অনেক মানুষের দশা এই হরিণের মত। একজনের কথা নীচে লিখছি। নাম তার করসনদাস

মূলজী। তার দৌড় শেষ হয়েছে, ঘাড় মটকেও পড়েছে, তবে কে জানে আর উঠবে কি না।

*   *   *   *

এই শেঠ করসনদাসের ইতিহাস একটু বিচিত্র রকমের। সে মোটেই গুজরাতী শেঠ নয়, জন্মেছে মরাঠা ক্ষত্রিয়ের ঘরে, নাম কৃষ্ণরাও। বাপের নাম সুবেদার বলবন্তরাও পওয়ার। তাঁদের বাড়ী বিজয়গড় কেল্লা, সহ্যাদ্রির কোলে।, আগেকার দিনে বলবন্তরাওয়ের এক পূর্ব্বপুরুষ শিবাজীর বংশধরদের কাজ বাজিয়ে এই কেল্লা বকশীশ পেয়েছিলেন। সেই থেকে এঁরা বিজয়গড়ের হেপাজৎ ক'রে আসছেন। ইদানীং পূর্ব্বতন মনিবদের যুদ্ধবিগ্রহের ধান্দা বন্ধ হয়েছে ব'লে দুপুরুষ ইংরেজের পল্টনে চাকরী করেন। অন্য কাজ এঁরা কখনও শেখেন নেই, জানেনও না। জায়গীরদার মরাঠা ঘরানা, এঁদের চালচলন বনেদী ও সেকেলে। মেয়েরা পরদানশীন। পুরুষরা সিপাহী হলেও রোজ পূজা ক'রে ফোঁটা কাটেন। কৃষ্ণরাও বাপের এক সন্তান। শৈশবে মাতৃবিয়োগ হয়। তাই বলবন্তরাওয়ের বড় আদরের ছেলে। বাপকে চাকরী উপলক্ষে নানাস্থানে ফিরতে হত। ছেলে কেল্লায় থাকত। মানুষকরা বিশ্বস্ত ঝি জানকী ছিল। সে যতদূর পারে মার অভাব পূরণ করত। কর্ম্মচারী রামরাও শাস্ত্রী এই পওয়ারদের ক্ষুদ্র জায়গীরের তত্ত্বাবধান করতেন। তিনিই শিশু কৃষ্ণরাওয়ের হাতেখড়ি দিয়েছিলেন আর প্রথম শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। লেখাপড়া কিন্তু বিশেষ কিছু হচ্ছিল না। শিক্ষক ছাত্র দুজনেরই বেশী ঝোঁক ছিল কুস্তি ও ঘোড়ায় চড়ার দিকে। কোমরে ছোট্ট তলোয়ার বেঁধে কৃষ্ণরাও

যখন তার মিশ্ কালো রঙ্গের টাট্টুর উপর ব'সে পাহাড়ের গা বেয়ে চড়ত তখন বড় চমৎকার দেখাত। ছেলে বড় ভাবপ্রবণ ছিল। রামায়ণ মহাভারতের গল্প, শিবছত্রপতির জীবন কথা শুনে কেঁদে ফেলত। একদিন রামশাস্ত্রী ভূষণের কবিতা ছেলেকে শেখাচ্ছেন। নিজে স্থর ক'রে বলছেন, আর ছেলে তার পরে আবৃত্তি করছে,

ইন্দ্র জিমি জম্ভ পর, বাড়ব স্থ অম্ভ পর।
রাবণ স্থদম্ভ পর, জেঁও রঘুকুল রাজ হ্যায়।
তেঁও ম্লেচ্ছ বংশ পর শূর শিবরাজ হ্যায়॥

বলতে বলতে শাস্ত্রীর চোখে জল এল, বললেন,

"কৃষ্ণাজী, আমি দাদাজী কোণ্ডদেব হতে রাজী আছি।"

বালক কৃষ্ণরাও চোখ মুছতে মুছতে উত্তর দিলে,

"গুরুদেব, আমিও আপনার শিউবা হতে নারাজ নই, কিন্তু আমার জিজাবাই নেই যে।"

গুরু মনে মনে আশীর্ব্বাদ করলেন, "স্বয়ং অষ্টভূজা তোমার জিজাবাই হবেন, বাবা।"

এই ভাবে শিক্ষা চলছে এমন সময় বলবন্তরাও ছুটীতে বাড়ী এলেন। তাঁর এক ইংরেজ অফিসার তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে ছেলেকে ভাল ক'রে ইংরেজী শেখান উচিত, নইলে আজকাল উন্নতির উপায় নেই। রামরাও একটু আপত্তি করলেন, বললেন যে "ইংরেজী পড়লে মানুষের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না।"

বলবন্তরাও উত্তর দিলেন, "আমারও সে ভয় যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাই ব'লে কি এক ক্ষুদ্র জায়গীরদারের কেল্লায় আতুরে ছেলে হয়ে থাকবে? কোন দিন মানুষ হবে না যে, শাস্ত্রী মহাশয়। আমি ঠিক করেছি কৃষ্ণাজীকে পাঁচগানি পাহাড়ে ইস্কুলে কয়েক বছর রেখে দেব।"

রামরাও শাস্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, কিন্তু আপত্তির কথা আর কিছু বললেন না।

যে ইস্কুলে কৃষ্ণরাও পড়তে গেল, সেটা হিন্দুদের ইস্কুল হলেও সম্পূর্ণ সাহেবী রকমের। সেখানে ছেলেরা ইংরেজী কাপড় চোপড় প'রে খুব চোস্ত ইংরেজী বলতে শিখত। কিন্তু ব্যায়াম খেলাধূলোরও খুব বন্দোবস্ত ছিল। কৃষ্ণরাও সব বিষয়েই বেশ ওয়াকিফ হয়ে উঠল। পনের বছর বয়সে তাকে দেখে বাপ বলবন্তরাও ভারী খুসী হয়েছিলেন।

ব'লেই ফেললেন, "বাঃ, তোকে দেখতে ঠিক আমাদের নূতন লেফ্‌টেনেণ্ট সাহেবের মত হয়েছে। ইংরেজী খুব বলতে কইতে শিখেছিস্ ত ?"

ছেলে ইস্কুলে কেডেট্ ছিল। কাওয়াজ করা, বন্দুক ছোঁড়া এ সব তার খুব ভাল লাগত। সে এই সুযোগে বাপকে নিজের সাধটা জানিয়ে রাখলে, "বাবা, আমাকেও বিলেত পাঠিয়ে লেফ্‌টেনেণ্ট ক'রে আনুন না। আমার ঐ কাজই সব চেয়ে ভাল লাগবে।"

সুবেদার মেজর সাহেব গোঁফে চাড়া দিয়ে এক গাল হেসে বললেন, "তা ত লাগবেই বাবা। কিন্তু আমাদের ছেলেদের কি অফিসার হতে দেবে ? কর্নেল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করব।"

এর কিছুদিন পরে কৃষ্ণরাও ইস্কুলের বিদ্যা শেষ ক'রে বোম্বাইয়ে গেল কলেজে পড়তে। সেখানেও পড়াশুনো ভালই করছিল। উপরন্তু কর্নেল সাহেবের পরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং কোরে সেপাইগিরিও শিখতে লাগল। চার বছর হয়ে গেছে। কৃষ্ণরাও বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে। ট্রেনিং কোর পল্টনে সে এখন সার্জেণ্ট হয়েছে। তার বাবার কর্নেল সাহেব আজ ব্রিগেডিয়ার জেনেরাল,

সেনাপতি। তিনি খুব আশা দিয়েছেন যে বিলেতে কলেজে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে কমিশন জোগাড় ক'রে দেবেন।

কলেজের লম্বা ছুটী। কৃষ্ণরাও বাড়ী এসেছে। বলবন্তরাও ও রামশাস্ত্রী দুজনেই তাকে দেখে বড় খুসী হয়েছেন। কিন্তু শাস্ত্রী হাসতে হাসতে বললেন, "রাও সাহেব, বলেছিলাম না যে কলেজে প'ড়ে বাবা আমাদের একেবারে সাহেব হয়ে যাবে। চেয়ে দেখুন, ঠিক যেন বিলেতী সাহেব। কে বলবে আমাদের কৃষ্ণরাও।"

বাপ বললেন, "এই কালের গতি শাস্ত্রী মহাশয়। আমাদের মত থাকলে একালে চলবে কেন? আমি চিরদিন তাবেদারী সুবেদারী করলাম, কৃষ্ণাজী আমার কর্নেল, জেনেরাল হবে এইটা আমি চোখে দেখে যেতে চাই। তবে বাবা, ভুলিস্ না যে তুই হিন্দুর ছেলে, মরাঠার ছেলে।"

এইখানেই কিন্তু মুস্কিল। হিন্দুর ছেলে মানে যে কি সেইটাই কৃষ্ণরাওয়ের গোলমাল হয়ে গেছল। ইস্কুলে ত খাওয়া পরা শোওয়া বসায় ফিরিঙ্গীয়ানা চাল শিখলে। তার পর বোম্বাইয়ে গিয়ে কলেজের হোষ্টেলে বাস। সেখানে ফিরিঙ্গী কাপড় পরার রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু খাওয়াদাওয়ার ব্যভিচার একেবারে পাকা হয়ে গেল। উপরন্তু যে সমস্ত সনাতন নীতির উপর হিন্দুর গৃহস্থাশ্রম প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোকে নিয়ে দিবারাত্র অশ্রদ্ধ তর্কবিচার উপহাস টিটকারী শুনতে হত। ফলে, কৃষ্ণরাওয়ের হিন্দুত্ব আমাদের আর পাঁচজনের হিন্দুয়ানীর মত নামে মাত্র পর্য্যবসিত হল। রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে হোষ্টেলের সাধারণ মত ছিল রুশিয়ার সোভিয়েট্ প্রবর্ত্তিত নীতি। মরাঠা যুবকটী সেকেলে আবেষ্টনের মধ্যে মানুষ হয়েছিল, তবু এই নূতন নীতি তার মন্দ লাগত না।

তার সব চেয়ে বন্ধু ছিল শেষাচারী। এই শেষাচারীকে অতি-মানব ব'লে বর্ণনা না করলেও এটা স্বীকার করতে হয় যে সে নিজগুণে হোষ্টেলের সর্ব্বজনস্বীকৃত নেতা হয়েছিল। এমন কি, মুসলমান পার্সী ছেলেরাও তার কথায় উঠত বসত। পড়াশুনো খেলাধূলো সম্বন্ধে তার মন্তব্য ছেলেরা মেনে নিত। কিন্তু এ সবের পেছনে শেষাচারীর একটা প্রচ্ছন্ন রূপ ছিল। সময় সময় সে গোখলে, লেখরাজ প্রভৃতি তিন চার জনকে নিয়ে দোর বন্ধ ক'রে কি কথাবার্ত্তা কইত, আর কেউ জানতে পারত না। কৃষ্ণরাও একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, তা'তে বন্ধু উত্তর দিয়েছিল, "তোকে ছাড়ব না কৃষ্ণাজী। শেষ পর্য্যন্ত তোকে ধরবই। তোর মত লোক কেবল তর্ক করে, কাজ করতে চায় না এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না। কিল্লেদারই হোস্ আর কমাণ্ডারই হোস্ তোর কাছে আমাদের অনেক আশা।"

কৃষ্ণরাও আর কিছু শোনবার আগ্রহ করে নেই, শেষাচারীও আর কিছু বলে নেই। কৃষ্ণাজী দেশকে গোখলেদের চেয়ে কম ভালবাসত তা নয়। তাদের তুলনায় সে যে কোন বিষয়ে সেকেলে তাও নয়। তবে গোখলে ছুরী মারা, পিস্তল মারার কথা তুললেই সে নাক সিটকে বলত, "ও ভদ্রলোকের কাজ নয়।"

পরীক্ষা দিয়ে কৃষ্ণরাও যখন ছুটীতে বাড়ী গেল, তখন বুঝতে পারলে যে বিজয়গড়ের আবেষ্টন থেকে সে কতটা দূরে চলে গেছে। কারও সঙ্গে কথা কয়ে সুখ পেত না। তার মনের ধারা আর সহ্যাদ্রিবাসীদের মনের ধারা একেবারে বিপরীত দিকে চলেছে। বন্ধুদের জন্য মনটা হাঁপিয়ে উঠত। কি করে, যতটা সময় পারে ঘোড়ায় চ'ড়ে শিকার ক'রে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াত।

* * * *

একদিন এই রকম ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূর গিয়ে পড়েছে, এক দেশী রাজ্যের সীমার ভেতর। পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা উঠেছে। কৃষ্ণাজী অন্যমনস্কভাবে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে চলেছে। যত ভাবছে, তত ঘোড়াকে গোড়ালী দিয়ে মারছে, ঘোড়াও বেশী জোরে ছুটছে। ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ তার স্বপ্নের সুরের সঙ্গে তাল দিচ্ছে। স্বপ্নের তাল দুপট, চৌপট, দ্রুত হতে দ্রুততর হয়ে চলেছে। এমন সময় হঠাৎ এক মোটারের শিঙ্গার কর্কশ আওয়াজ সঙ্গৎটা নষ্ট ক'রে দিলে। রসভঙ্গ হ'ল। চেয়ে দেখে, দূরে একখানা প্রকাণ্ড মোটর বেগে নেমে আসছে। রাস্তা অল্পপরিসর। ঘোড়ার রাশ আচম্‌কা টানায় ঘোড়ার মেজাজ বিগড়ে গেছে, সে ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করলে। এতদিন হয়ে গেল, আজও ঘোড়ার সঙ্গে মোটরের, বন্ধুত্ব দূরে থাক, একটা বনিবনাও হ'ল না। ভদ্রবংশীয় কোন ঘোড়াই মোটরের শিঙ্গার আওয়াজ বরদাস্ত করতে পারে না, মনে করে শত্রুর রণতূর্য্য। শত্রু কাছে এল। ঘোড়ার মনিব দেখলে স্বয়ং রাজা মহাশয় মোটর হাকাচ্ছেন আর তাঁর পাশে একটী মেয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে রয়েছে, যেন কাঁদছে। রাজা কৃষ্ণাজীর দূর আত্মীয়। সে জানত মহারাজের পাঁচরকম বদখেয়াল আছে। তবু ভাবলে, "দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি?" রাজা হাঁকলেন, "কৃষ্ণরাও সামাল, পথ ছেড়ে দাও।" কৃষ্ণাজী চুপিচুপি ঘোড়াকে গোড়ালীর গুঁতো দুই একটা দিতেই সে পেছনের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে উঠে মোটরের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। রাজা পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সওয়ার ও ঘোড়া কেউই সেদিকে তাঁকে সাহায্য করলে না। একটা ঘোটচক্র হয়ে রাজাকে গাড়ী

থামাতে হ'ল। কৃষ্ণরাও টপ্ ক'রে নেমে মহারাজকে নমস্কার করলে, আর ন্যাকা সেজে জিজ্ঞেস করলে, "সরকারের সঙ্গে উনি কে?" তার কথা শোনবামাত্র মেয়েটী মুখ তুলে চেঁচিয়ে উঠল গুজরাতী ভাষায়, "ভাই সাহেব, তুমি যেই হও, আমাকে বাঁচাও।" সুন্দর মুখ, তার চেয়েও মিঠে আওয়াজ! কৃষ্ণাজী বুঝলে যে নৃপেন্দ্র মৃগয়ায় রত হয়েছেন। মহিষী সংগ্রহ ব্যাপারে তাঁর নৈপুণ্য দেশবিশ্রুত। অবরোধে মহত্যপি। রাজা আবার চেষ্টা করলেন মোটরখানা বের ক'রে নিয়ে যেতে। কৃষ্ণরাওয়ের ঘোড়া এক লাফ দিয়ে রাস্তার মাঝে এসে পড়ল। ফলে মোটরের মুখ ঘুরে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে জোরে ধাক্কা লাগল। দুম্ ক'রে একটা টায়ার গেল ফেটে। মেয়েটী মোটেই বোকা নয়, চকিতের মত রাজা মহাশয়কে এক ঠেলা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কৃষ্ণাজী এদিক ওদিক ভাববার সময় পেলে না। মেয়েটীকে তুলে নিয়ে ঘোড়ায় বসিয়ে দিলে এক ছুট। রাজা নিরুপায়, শিকার হাতে এসেও এল না। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলেন।

কিন্তু কৃষ্ণাজী এখন করে কি? যায় কোথায়? মেয়েটীর নাম কমলাবাই। সে ঐ রাজ্যেরই প্রজা। বাপ ও সৎমার সঙ্গে তীর্থ থেকে ফিরছিল। পথিমধ্যে মহারাজ তাকে দেখতে পেয়ে গাড়ী থামিয়ে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে আসেন। বাজ যেমন ঘুঘুর বাচ্ছাকে ধরে। বাপ মা একটা কথা বলতেও সাহস করেন নেই। রাজা সাক্ষাৎ দেবতা, তাঁকে বলবেনই বা কি? দৈবের সামনে মাথা নোয়ান ত হিন্দুর সনাতন রীতি। যখন কৃষ্ণাজী জিজ্ঞেস করলে,

"কমলা, তোমাকে কোথায় নিয়ে যাব?" সে হতাশ ভাবে উত্তর দিলে, "রাও সাহেব, আপনি আমার ধর্ম্মরক্ষা করেছেন আপনিই বলুন কোথায় যাব? আমার সৎমা ত আর আমায় ঘরে নেবেন না, বাবার ইচ্ছা থাকলেও?"

কৃষ্ণাজীকে চিন্তিত ও নিরুত্তর দেখে কমলা আবার বললে, "আপনি পর, আমায় নিয়ে কেন বিব্রত হবেন? আমার ধর্ম্ম ত বাঁচিয়েছেন এখন এইখানে মেরে ফেলে দিয়ে যান। আমার বাঁচতে ইচ্ছা একটুও নেই।"

কৃষ্ণাজী শুধু এইটুকু বললে, "আচ্ছা কমলা, আমায় একটু ভাবতে সময় দাও।" যেতে যেতে কথাটা মনে তোলাপাড়া করতে লাগল। একবার মনে করলে বিজয়গড়ে নিয়ে যাই, কিন্তু তাতেই বা ফল কি? বলবন্তরাও ত আর একটা সামান্য বেনের মেয়ের জন্য তাঁর মহামান্য কুটুম্ব রাজাবাহাদুরের সঙ্গে ঝগড়া করবেন না। কিন্তু টাকা সংগ্রহ করতে একবার কেল্লায় যেতেই হবে। কমলাকে রেখে যায় কোথা? অপরূপ সুন্দরী, গা ময় গহনা, তাকে ত আর রাস্তার ধারে গাছ তলায় বসিয়ে রেখে যেতে পারে না। হঠাৎ মনে হ'ল বিঠোবা মন্দির বেশী দূর নয়, পুরোহিত ঠাকুর তাকে ছেলেবেলা থেকে ভালবাসেন, তাঁর আশ্রয়ে রেখে গেলে হয়। গেল মন্দিরে। পুরোহিত কিন্তু তাকে দেখে খুশী হলেন না। কৃষ্ণাজীকে তিনি সচ্চরিত্র ব'লে জানতেন। কমলাকে সঙ্গে নিয়ে আসায় আশ্চর্য্য হলেন, একটু বিরক্ত হলেন।

বললেন, "ইনি কে, বাবা? এঁকে ঘোড়ার উপর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন, আমার মন্দিরেই বা আনলে কেন?"

কৃষ্ণাজী সোজা পুরোহিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "ঠাকুর, একটুক্ষণের মত একে আশ্রয় দিন। আমি একবার বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।"

রাম শাস্ত্রীর মত, এই পুরোহিত ঠাকুরও কৃষ্ণরাওয়ের আধুনিক শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। ভাবলেন, "ছোকরার মতিচ্ছন্ন ধরেছে। মনে করছে খুব সাহেবীয়ানা করছি।" মুখে বললেন, "তুমি আগে বল ইনি কে? তোমার সঙ্গেই বা এঁর কিসের সম্বন্ধ।"

যুবক ব্রাহ্মণকে একান্তে নিয়ে গিয়ে সব কথা খুলে বললে। তাতেও ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হলেন না, বললেন, "বেশ, আমি একে খানিকক্ষণ রাখছি, কিন্তু তোমার মতলব কি বলত। একে কোথায় নিয়ে যাবে? একে নিয়ে করবে কি? আচ্ছা, তুমি এখন কেল্লায় যাও, আমি বেশ ক'রে কথাটা ভেবে দেখতে চাই।"

সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণরাও ফিরল। তখন মন্দিরে আরতি হচ্ছে। তাকে দেখেই কমলা দৌড়ে কাছে এল, ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলে,

"কি ঠিক হ'ল রাও সাহেব? আমি আপনাদের বাড়ী যাব ত?"

"না কমলা, সে হ'ল না। তুমি এইখানেই থাক ঠাকুর মহাশয়ের কাছে।"

কমলা বললে, "তা আমি থাকতে পারব, আপনি যদি মাঝে মাঝে আসেন। ঠাকুর আমায় কত যত্ন করলেন। আমার বয়সী দুটী মেয়ে আছে, যমুনা আর গঙ্গা, তাদের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছে। ঐ দেখুন না, গঙ্গা যমুনা যাচ্ছে।"

কৃষ্ণরাও চেয়ে দেখলে দুটী অপূর্ব্ব রূপসী মেয়ে ঠাকুরঘরের থেকে বেরিয়ে আসছে। তাদের চোখে সুরমা, কপালে চন্দন,

ঠোঁটে অলক্ত রাগ, পরনে লাল বেনারসী, পায়ে ঘুঙ্ঘুর। ঠাকুর মহাশয় কমলাকে কেন এত যত্ন করেছিলেন সে বুঝলে। বেচারা কমলা! রাজার সেবাদাসী হতে যাচ্ছিল, তাকে ধ'রে এনে শেষে দেবদাসী ক'রে দিয়ে যাবে! রাজার সেবাদাসী কখন কখনও রাণী হয়েছে এ রকম শোনা যায়, কিন্তু দেবদাসী কোনদিন দেবী হয় না। না, কমলাকে নিয়ে কৃষ্ণরাও পালাবে। এখনই যাবে। নইলে পুরোহিত নানারকমের বাধা আপত্তি তুলবেন।

প্রকাশ্যে বললে, "কমলা, আমি ভেবে দেখলাম। এখানে সুবিধা হবে না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে, আমার কাছেই থাকবে। চল, যাওয়া যাক।"

মেয়েটী খুসী হয়ে বললে, "তাহলে ত কথাই নেই, চলুন। আমি ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম ক'রে আসি, গঙ্গা যমুনাকে ব'লে আসি।"

কৃষ্ণাজী ব্যস্ত হয়ে জবাব দিলে, "না, সে সব দরকার নেই। আর একদিন এলেই হবে। এস, আমার ঘোড়া তৈয়ের আছে।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে দুজনে ঘোড়ায় চ'ড়ে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল।

* * * *

ঘোড়া চলেছে ত চলেছেই। কমলা কৃষ্ণাজীর সামনে ব'সে তার বুকে হেলান দিয়ে দিব্য আরামে নিদ্রা দিচ্ছে। কৃষ্ণাজীর চোখে ঘুম নেই, মনেও শান্তি নেই। সে ভাবছে,

"বেশ সেকেলে গল্পের মত হ'ল। বাপদাদারা ত এই রকম ক'রেই স্ত্রীরত্ন লাভ করতেন। প্রবল দস্যুর হাত হতে সুন্দরীর উদ্ধার, গভীর রাত্রে অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন, কণ্ঠলগ্না সুন্দরীর একান্ত

নির্ভরের ভাব। সবই আছে। নেই কেবল সুন্দরীর অঙ্গস্পর্শে নায়কের রোমাঞ্চ, সুন্দরীর অঙ্গসৌরভে নায়কের বিহ্বল বিকল ভাব।"

হেসে উঠল আপন মনে। একটু চেঁচিয়েই বললে, "এ কি আমার সোনার কণ্ঠহার না পায়ের বেড়ী?"

কমলা একবার আধ ঘুমঘোরে জিজ্ঞাসা করলে, "আমায় কিছু বলছিলেন, রাও সাহেব?" ক'রেই আরও কাছে ঘেসে বসল।

ঘোড়া সেই চলেছে পশ্চিম মুখে সমুদ্রের দিকে। নায়ক আবার নিজের সঙ্গে বাক্যালাপ জুড়ে দিলে।

"কেন হে কৃষ্ণরাও, তুমি না দুবছর থেকে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করছ বিয়ে ক'রবে না ব'লে? তুমি না দিবারাত্র স্বপ্ন দেখেছ বিলেত গিয়ে যুদ্ধবিদ্যা শিখবে, সেনানী হবে? কত জটলাই না করেছ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ভবিষ্যৎ নিয়ে! আর আজ একটা ষোল বছরের অপরিচিতা মেয়েকে বুকে ক'রে দুপুর রাত্রে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়াচ্ছ! কেন বল দেখি?" নিজেই খুব জোর দিয়ে নিজের প্রশ্নের জবাব দিলে।

"এই ত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। এই ত তার কর্ত্তব্য সাধন। এই ত তার জীবনের romance। আচ্ছা, romance মানে প্রেম না কর্ত্তব্য সাধন?"

আবার কমলা আধঘুমন্ত অবস্থায় জিজ্ঞাসা করলে, "আমায় কিছু বলছেন?" সে দিব্য আরামে ব'সে আছে। ঘোড়ায় চ'ড়ে চলেছে, আর একজন মানুষের বুকটাকে তাকিয়ে করেছে, এ সব যেন তার খেয়ালই নেই।

কৃষ্ণাজী একটু হাসলে। বললে, "হ্যাঁ, তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, কমলা, বোম্বাই শহরে যাবে? জাহাজে ভয় করবে না ত?"

কমলার সেই একভাব। "আপনি যেখানে ভাল বোঝেন সেইখানে নিয়ে চলুন।" বলেই আবার ঘুম। কৃষ্ণাজী যদি ঘোড়াটাকে খুব জোরে ছোটাতে পারত ত মনটা একটু শান্ত হত। কিন্তু একটা ঘুমন্ত মেয়েকে নিয়ে ত আর তা হয় না। সে বার বার নিজেকে বলছে, "এ যেন আমায় বেঁধে মারা।" তাই নাকি, বন্ধু? ঠিক বুঝেছ?

ভোর রাত্রে তুজনে দাভোল বন্দরে পৌছল। বোম্বাইয়ের জাহাজ এইখান দিয়ে যায়। গ্রামের বাইরে কৃষ্ণাজী একটা ছই দেওয়া গরুর গাড়ী ধরলে আর কমলাকে তাইতে বসালে। নিজেও নামল। ঘোড়ার মুখ ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে চলল। আশ্চর্য্য ঘোড়া! তুজনকে পিঠে ক'রে সারারাত চলেছে, তবু মেজাজ একটুও বিগড়ায় নেই। যেতে যেতে মনিবের কাঁধে মুখ রেখে আদর করছে। কমলা গরুর গাড়ীতে ব'সে বোম্বাই সম্বন্ধে কত কথা জিজ্ঞাসা করছে। সে কখনও বড় শহর দেখে নেই। কত লোকের বাস, কি রকম ঘর বাড়ী, লোকে পায়ে হেঁটে যাওয়া আসা করে কি গাড়ী চড়ে, এই রকম কত কি সে জানতে যায়। কৃষ্ণরাও হেসে হেসে সব কথার উত্তর দিচ্ছে। বেশ ভাল লাগছে।

দাভোল তাদের গ্রাম থেকে খুব বেশী দূর নয়। তার আত্মীয়-স্বজনও তুই এক ঘর সেখানে আছেন। তাঁরা নিতান্ত সেকেলে লোক। তাঁদের সঙ্গে এ অবস্থায় দেখা না হ'লেই ভাল। অথচ ঘোড়াটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তার দূর সম্পর্কের এক

পিসেমহাশয় মাধবরাও মোহিতে কাছেই থাকেন। তাঁর হাতে ঘোড়া দিলেই তিনি বিজয়গড়ে পৌঁছে দেবেন। কিন্তু কৈফিয়ৎ অনেক দিতে হবে। কাজ নেই, তার চেয়ে ঘোড়া বেচে ফেলা যাক্। ঘরের ঘোড়া, নিজের সওয়ারীর ঘোড়া, এত সাধের জানোয়ার, শেষে ঠিকে গাড়ী টানবে? কৃষ্ণাজীর চোখে জল এল। কিন্তু একবার জোরে মাথাটা ঝাড়া দিয়ে বিড়বিড় ক'রে আপন মনে বললে, "তা কি হবে? এই ত আরম্ভ, ভবিষ্যতে আরও কত সাধের জিনিস জলে ফেলে দিতে হবে। শুভস্য শীঘ্রং।" কমলার মুখের দিকে চেয়ে দেখে, সে ফ্যালফ্যাল ক'রে তার মুখের পানে তাকিয়ে রয়েছে।

কৃষ্ণরাও বোম্বাইয়ে অনেক বছর কাটিয়েছে। গুজরাতী বেশ বলতে পারে। সকাল হ'লে দাভোলের বাজারে খবর নিয়ে জানলে যে শেঠ মগনলাল সেখানকার বড় মহাজন। তাঁর কাছে কমলাকে নিয়ে উপস্থিত হ'ল। শেঠ তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় কৃষ্ণাজী বললে,

"আমার নাম করসনদাস মূলজী। বাড়ী সুরত। নূতন বিবাহ করেছি। মার মানৎ ছিল, তাই বিবাহের পর দুজনে কোলহাপুরে অষ্টভূজা মন্দিরে পূজা দিতে গেছলাম। বাড়ী ফিরছি।"

মগনভাই তাদের নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণাজী জানালে যে তাদের সকালের জাহাজেই বোম্বাই ফিরতে হবে, তবে একটা বিষয়ে শেঠ যদি তাকে সাহায্য করেন ত বড় উপকার হয়।

"আমার ঘোড়াটা যদি আপনার আস্তাবলে রেখে দেন ত অনেক হাঙ্গাম বাঁচে। আমি পরে সুরত নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করব।

বেশ ভাল ঘোড়া, খুব ঠাণ্ডা, চলেও বেশ, যতদিন আপনার আস্তাবলে থাকে আপনি চড়বেন।”

কৃষ্ণরাওকে আর বিশেষ ক'রে কমলাকে শেঠজীর বড় ভাল লেগেছিল। তিনি বললেন, “করসন ভাই, আমি বয়স্থ লোক, বড় ঘোড়ায় চড়তে পারব না। কিন্তু গাড়ীতে জুড়ব। গাড়ীতে চলে তোমার ঘোড়া? তাহলে কিনেও নিতে পারি। দেশের লোক তোমরা, তোমাদিকে সাহায্য করা ত আমার কর্ত্তব্য।”

“হ্যাঁ শেঠজী, গাড়ীতে বেশ ভাল চলে। কোলহাপুরে ৭৫৲ টাকায় আমি সেদিন কিনেছি। সেখানে টম্‌টম্ টানত।”

পঁচাত্তর টাকায় ঘোড়া বিক্রী হ'ল। কোন রকমে চোখের জল লুকিয়ে কৃষ্ণাজী আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল। মগনভাই কমলাকে বললেন, “বাই, নিমন্ত্রণ রইল, আবার যদি তোমরা এদিকে আস ত আমার কাছে এক হপ্তা থাকতে হবে। ততদিনে আমার মেয়ে দেশ থেকে আসবে। সে তোমার বয়সী।”

দুজনে শেঠকে প্রণাম ক'রে রাস্তায় বের হ'ল। কৃষ্ণাজী কমলাকে গাড়ীতে তুলে দেওয়ার সময় দেখলে যে তার মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে। দুতিনবার জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে,

“আপনি ও কথা কেন বললেন? আপনার নাম বুঝি করসনদাস? আপনার সঙ্গে বুঝি আমার বিয়ে হয়েছে?”

কৃষ্ণাজী হেসে বললে, “কেন, আমাকে কি রাজার চেয়ে দেখতে খারাপ? রাগ করিস্ না। আমাদের বিয়ে এ রকম হয় রে হয়। তুই আমায় পছন্দ করিস্ ত বোম্বাই গিয়ে পুরুতঠাকুরকে ডাকলেই হবে।”

কমলা মাথা হেঁট ক'রে ছলছল চোখে বললে, "কাল সন্ধ্যা থেকে ত আপনার কোলে ব'সে রয়েছি। আবার দূর ক'রে না দিলে আমি কোথায় যাব ?"

কৃষ্ণাজী কমলার মাথায় হাত রেখে বললে, "তোকে কোথাও যেতে হবে না, কমলা। তোর ভার আমি নিলাম। আমার বাড়ী তোকে নিয়ে যেতে পারতাম ত তুই বিঙ্গগড়ের কমলাবাই পওয়ার হতিস্। তা ত হ'ল না, এখন আমিই হব করসনদাস শেঠ আর তুই হবি আমার শেঠানী। কেমন, ঠিক হয়েছে ত ?"

রোদ উঠে গেছে। ষ্টিমারযাত্রীদের শোরগোল চারিদিকে। এরা দুজনে বাজারে সামান্য কিছু খরিদপত্র ক'রে বন্দরে গেল। একটু পরে জাহাজ এলে উঠে বসল। জাহাজ ধীরে ধীরে খাড়ীটুকু পেরিয়ে খোলা সমুদ্রে পড়ল। আকাশ সুন্দর পরিষ্কার। হাওয়া নেই। তবুও বড় বড় ঢেউগুলো ঝপাস্ ঝপাস্ ক'রে জাহাজের গায়ে প'ড়ে, ভেঙ্গে, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, আর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ তালে তালে নাচছে। দোল, দোল, দে দোল দোল। চারিদিক মড় মড় ক'রে উঠছে। কমলার এই প্রথম সমুদ্র প্রবাস। শরীর অসুস্থ হওয়ার কথা। কিন্তু নূতনের নেশায় তার বুকের ভেতরটাও দোল, দোল, করছে। চোখ বুজে আছে, কিন্তু ভয়ে নয়, আরামে। কৃষ্ণরাও পাসে ব'সে আছে তার হাতের উপর হাত রেখে, তাকে ভরসা দেবার জন্য। তার নিজের মনের ভেতরটায় কি রকম অস্বস্তি হচ্ছে, বুঝতে পারছে যে অতীতের সঙ্গে একটা কাটান ছেঁড়ান হয়ে যাচ্ছে। ভয়ও হচ্ছে, ভালও লাগছে। একটু পরে কমলাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কমলাবাই, ভয় করছে না ?"

কমলা হেসে উত্তর দিলে, "না, রাও সাহেব, বড় ভাল লাগছে। সমুদ্র কি সুন্দর! কাছটায় কত বড় বড় ঢেউ, আর দূরে মোটে জল নড়ছে না। যেন একখানা নীল কাঁচ প'ড়ে আছে। কত দূর চলে গেছে, যেন পৃথিবীর শেষ। ডানদিকের পাহাড়, গাছপালা, গাঁগুলো সব ছবির মত দেখাচ্ছে। আমার একটুও ভয় করছে না। তবে সে হয় ত আপনার কাছে রয়েছি ব'লে।"

মাঝে মাঝে পাহাড়প্রমাণ এক এক প্রকাণ্ড কেল্লা। সেগুলো দেখে কমলা আঁতকে উঠছিল। বললে, "কি কুৎসিত জিনিস এই কেল্লাগুলো! এর ভেতর নিশ্চয় বড় বড় কালো কালো তোপ আছে? কাকে তোপ মারে?"

শিবাজীর সুবর্ণদুর্গ আর কানহোজী আংগ্রের হীরাকোট-এর খুব কাছ দিয়ে জাহাজ গেল। এই দুই কেল্লা ছেলেবেলা থেকে কৃষ্ণাজীর কত সাধের, কত স্বপনের জিনিস। এখন সব ছেড়ে চলেছে, আর কেল্লা তার কাছে কি? সুবর্ণদুর্গের কথা কমলাকে বলতে বলতে কৃষ্ণাজীর মুখ লাল হয়ে উঠল, চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটতে লাগল। কমলা সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "রাও সাহেব, তুমি রাগ করছ কেন আমার উপর?"

কৃষ্ণাজী বিষণ্ণমুখে বললে, "তোর উপর কেন রাগ করব, কমলা? কি জন্য আমার মন খারাপ হচ্ছে তোকে একদিন বোঝাব। আজ বুঝবি না। মরাঠাদের নিয়ে ভাগ্যদেবতা কি নিষ্ঠুর খেলাটাই না খেলেছে!" ব'লে আনমনা হয়ে একটু ব'সে রইল।

খানিক পরে খান্দেরীর বাতিঘর দেখা গেল। দেখে কমলার কি আহ্লাদ! চেঁচিয়ে উঠল, "ওখানে অমন আলো দিয়েছে কেন, রাও সাহেব? ও কেল্লাতেও কি তোমার কেউ থাকে?"

কৃষ্ণরাও চুপি চুপি উত্তর দিলে, "আস্তে, আস্তে। রাও সাহেব কে রে? করসন শেঠ বলবি, ঠিক হ'ল না? শেঠের আত্মীয় কি কেল্লায় থাকে?"

কমলাকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখেছিল, পাছে তার গা ঘোরে। কিন্তু একটু পরে যখন উত্তরের অন্ধকার আকাশে কোলাবার বাতিঘর, বোম্বাই সহরের আলো দেখা গেল, তখন তাকে বসিয়ে রাখা দুষ্কর হ'ল। সে লাফিয়ে উঠে জাহাজের রেলিং-এর উপর ঝুঁকে আলো দেখতে লাগল। কৃষ্ণাজীর মাথা তখন অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। সে ভাবছে, "রায়গড়, সিন্ধুদুর্গ, সুবর্ণদুর্গ সব, সব চ'লে গেছে। গেলই বা কৃষ্ণরাও পওয়ার? ইংরেজের বোম্বাইয়ের জয় জয়কার হোক্, কি বল করসনদাস শেঠ?"

উঠে কমলার কাছে গেল। তার উৎসাহের মাঝে নিজের দুঃখ আপশোশ ভাসিয়ে দিলে। অন্ধকারে বোম্বাইয়ের দ্রষ্টব্য জিনিস কমলাকে সব দেখাতে লাগল।

সন্ধ্যা সাতটার সময় জাহাজ ধাক্কায় (Pier-এ) লাগল। দুজনে এক ভাড়া ফেটিনে চেপে "সরদার গৃহ" হোটেলে পৌছল। সেখানে মিসেস্ করসনদাস মূলজীর জন্য এক ঘর নেওয়া হ'ল। খাওয়া দাওয়ার পর কমলাকে সেখানে রেখে কৃষ্ণাজী নিজের হোষ্টেলে চ'লে গেল। কমলার কান্নাকাটি শুনলে না। বললে, "আজকের মত একা থাক্। আমি ভোর বেলাই আসব।"

হোষ্টেলে পৌছল গিয়ে দশটার সময়। কৃষ্ণরাওকে ছেলেরা সবাই বড় ভালবাসত। তাকে দেখে হৈ হৈ রোল উঠল।

খানিকক্ষণ গল্পগুজব ক'রে সে ছুটী নিলে, "অনেক পথ এসেছি। দম বেরিয়ে গেছে। আজ শুতে দে, ভাই।" ব'লে তার ঘরে চ'লে গেল। তার পরম বন্ধু শেষাচারী আর সে এক ঘরে থাকত। ঘরের দোরে খিল দিয়ে বন্ধু জিজ্ঞাসা ক'রলে, "এইবার সব গল্পটা বল্। এত শীগগীর দেশ থেকে পালিয়ে এলি কেন? কদিন আমাদের এখানে থাকবি? পরীক্ষার ফল কিছু জানতে পারলি?"

কৃষ্ণরাও বললে, "এক নিঃশ্বাসে কতগুলো কথা জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললি? আসল খবরটা তোকে আগে দিই। ভাই, আমি বিয়ে ক'রে এলাম।"

বন্ধু আশ্চর্য্য হয়ে গেল, "কবে রে? এই ত সেদিন বাড়ী গেলি, আগে ত কিছু বলিস্ নেই।"

কৃষ্ণরাও বললে, "বাড়ীতে নয় ভাই, পথে। যুদ্ধে স্ত্রীরত্ন লাভ করেছি। বিবাহ গান্ধর্ব্ব রীতিতে হয়েছে।"

শেষাচারী গম্ভীর হয়ে গেল। ভাবলে, ছেলে মানুষ একটা ফ্যাসাদে পড়েছে। একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "কিছু বাঁদরামি ক'রে এলি নাকি? সব কথা আমায় খুলে বল্ দেখি।"

কৃষ্ণের মুখে সমস্ত ব্যাপারটা শুনে তার পিঠে হাত দিয়ে শেষাচারী বল্লে, "সব ভাসিয়ে দিলি, ভাই? আমাদের কথা একটুও ভাবলি না? এখন সারা জীবন সেই দুটী কালো আঁখির ধ্যানে কাটিয়ে দিবি!"

কৃষ্ণ একটু কাষ্ঠ হাসি হাসলে, "তাহলে ত একটা কাজ হত, শেষাচারী। কিন্তু কই, সে আপন-হারা সকল-ভোলা ভাব আমার কই? বেচারা কমলা ও দুদিনের মধ্যেই নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে, আমার হাতে তার সমস্ত জীবন তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। আমি ত কিছুই দিতে পারি নেই।"

বন্ধু একটু হেসে বললে, "আর কি দিবি? ঘর, বাড়ী, বৃদ্ধ বাপ, ত ছেড়ে দিয়ে এসেছিস্। নিজের এত দিনের কত সাধে জলাঞ্জলি দিতে বসেছিস্। তুই কি বলতে চাস্ আমি বুঝি না, যে বেণের দোকান করা তোর কি রকম লাগবে?"

কৃষ্ণাজী একটু হতাশভাবে বললে, "না ভাই, কিছুই ছেড়ে দিতে পারি নেই। মনের মাঝে সবই আছে, যেমন ছিল তেমনই আছে। তুই আমায় পরামর্শ দে কি করব। পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্ম আর্ত্তের ত্রাণ। সেই আমার স্বধর্ম্ম। কমলাকে রাজার ঘরে যেতে দেওয়াই কি আমার কর্ত্তব্য ছিল? এই কি তোর মত? তোর কাছেই ত কতবার শুনেছি যে অত্যাচারের প্রতিরোধ আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য, তার কাছে ক্ষুদ্র স্বার্থ অতি নগণ্য। বল্ শেষাচারী, তুই শেখাস্ নেই এই সব? আজ আবার অন্য কথা কেন?"

শেষাচারী হেসে উত্তর দিলে, "ভাই, তুই নিজের মন বুঝে দেখ্। এমন কিছু করিস্ না, যাতে দুদিন বাদে নিজেই পস্তাবি। কমলা ছেলেমানুষ, বোঝেই বা কি? সে তোকে যেদিন পরামর্শ দিতে পারবে, সেদিন আমার কিছু বলবার থাকবে না। আজ আমি শুধু এইটুকু বলব যে যদি তুই কমলাকে পেয়ে, তাকে ভালবেসে, জগৎ ভুলতে পারিস্ ত তাকে কাছে রাখ্। নইলে শুধু তার উপর দয়া ক'রে তাকে নিয়ে ঘর করার কোন অর্থ নেই।"

কৃষ্ণ চুপ ক'রে রইল, শেষাচারী আবার বললে, "সত্যি, কমলাকে ভাসিয়ে দেওয়ার ত কোন কথা নেই। আমি লেখরাজকে বলছি। সে তাদের আর্য্য সমাজের কন্যাশালায় কমলার থাকার লেখাপড়া শেখার বন্দোবস্ত ক'রে দেবে।"

কৃষ্ণাজী তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "না, তুমি কাউকে কিছু ব'ল না। আমি ভেবে দেখি। চল, ঘুমান যাক্, একটা বেজে গেছে।"

শেষাচারী ঘুমিয়ে পড়ল। কৃষ্ণাজীর ঘুম হ'ল না। সে বন্ধু ওঠবার আগেই ভোরবেলা হোটেলে চলে গেল। গিয়ে দেখে কমলা চেয়ারে ব'সে আছে। সে বললে, "আমি অনেকক্ষণ থেকে তৈয়ের হয়ে বসে আছি। বেড়াতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন, মনে আছে?"

কৃষ্ণরাও স্নানাদি সেরে এক পাতলা ধুতি, হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা কোট প'রে, পায়ে বার্ণিশ করা পাম্প জুতো, মাথায় একটু উঁচু মত ইরাণী টুপী দিয়ে বের হ'ল। কমলা ত হেসেই সারা। বললে, "রাও সাহেব, চেহারা একেবারে বদলে গেছে। কত ভাল দেখাচ্ছে। বড় ঘরের শেঠিয়ার ছেলের মত।"

করসনভাই গম্ভীর হয়ে গুজরাতীতে বললে, "চল কমলাবাই, একবার বেড়িয়ে আসা যাক।" বেড়িয়ে ফিরে এসে একটু ঠাণ্ডা হওয়ার পর কৃষ্ণরাও বললে, "কমলা, বস একটু দরকারী কথা আছে। আমার এক বন্ধু তোমার জন্য খুব ভাল বন্দোবস্ত করেছেন। আর্য্যসমাজের কন্যাশালায় থাকবে। তাঁরা তোমার খুব যত্ন ক'রে লেখাপড়া শেখাবেন।"

কমলা আর কিছু বলতে দিলে না। একেবারে কৃষ্ণাজীর গলা দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগল, "আমি কিছুতেই কোথাও যাব না। বলেছি ত আপনাকে, আপনি আমায় মেরে ফেলুন। আমার জন্য আপনার কোন কষ্ট করতে হবে না। ও সব সমাজটমাজে গিয়ে আমি খৃষ্টান হতে পারব না।"

কৃষ্ণরাও একটু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, কমলা, তাহলে আমাদের বিয়ে কি ক'রে হবে? পুরুত বামুন এসে ত আর মরাঠার সঙ্গে বেণের বিয়ে দেবে না।"

কমলা এক ঝটকা মেরে কৃষ্ণাজীর গলা ছেড়ে দিয়ে একবারে ঘরের কোণে গিয়ে দাঁড়াল। যেন একটু বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলে, "না হয় না হবে। আমি কি আপনাকে বলেছি, আপনি আমায় বিয়ে করুন? আমি ত বার বার বলছি মরা ছাড়া আমার গতি নেই। কিন্তু আমি খৃষ্টানও হব না, খৃষ্টানী ইস্কুলেও যাব না।" দুচোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

কৃষ্ণাজী কমলার কাছে গিয়ে তার চিবুক ধ'রে বললে, "আচ্ছা, কমলা, তুই রাগ করিস্ না। তোকে কোথাও যেতে হবে না। ঠিক হয়ে গেল, তুই আমার কাছে থাকবি চিরদিন।" কমলার চোখের জল মূহুর্ত্তের মধ্যে শুকিয়ে গেল। তার পর চার চোখ মিলল। আর কথা কওয়ার কোন দরকার রইল না।

বিকেলবেলা শেষাচারীকে গিয়ে তার বন্ধু সব কথা বললে। শেষাচারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে, "কৃষ্ণ, তোকে খরচ লিখতে হবে তা আগে কখনও মনে করি নেই। কাল যখন বললি আমি তখনই বুঝলাম কমলা তোকে গ্রাস করেছে। তুই বুঝিস নেই এতক্ষণ। এইবার বুঝতে পেরেছিস্ ত? আমি বড় ভাই আশীর্ব্বাদ করছি দুজনকেই। আজ তোকে যেমন ছাড়লাম, একদিন ফেরৎ পাব তেমনই তোদের দুজনকেই। কমলা আমার সুদ আর তুই আমার আসল।"

একটু পরে আবার বললে, "আচ্ছা, এখন কি করবি বল্ ত? কোথায় যাবি? এখানে ত দুদিনেই সব জানাজানি হয়ে যাবে।

করসনদাস মূলজী সাজার ফন্দী বোম্বাই শহরে চলবে না। এক কাজ কর। আমার এক আত্মীয়ের ধারওয়াড়ে চালানী কারবার আছে, তিনি একজন ভাল ইংরেজী জানা গোমস্তা খুঁজছেন। যাবি সেখানে? তাহলে আজই পাঠাতে পারি।" কৃষ্ণরাও তখনই রাজী হ'ল।

শেষাচারী হাসতে-হাসতে জিজ্ঞাসা করলে, "গোখলে, লেখরাজ এরা খোঁজ করলে কি বলব?"

"বলবি মরেছি। সত্যিই ত মরেছি। যে ধারওয়াড় যাচ্ছে সে ত করসনভাই।" সেই রাত্রেই কৃষ্ণাজী কমলাকে নিয়ে বোম্বাই ছেড়ে গেল।

* * * *

ধারওয়াড়ে যাঁর কাছে গেল, তাঁর নাম চিদম্বরম্, শেষাচারীর কি রকম মামা হন। তিনি করসনদাসের সঙ্গে কথা কয়ে খুব খুশী হলেন। বুদ্ধিমান, সুপুরুষ, বি-এ পাস করা গোমস্তা ৩০৲ টাকায় পেয়ে তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। নিতান্ত ব্যবসাদার মানুষ না হ'লে আর দশ টাকা বেশী মাইনে দিয়ে ফেলতেন। করসন বিবাহিত শুনে আড়তের এক অংশে তার থাকবার জায়গা ক'রে দিলেন। সে অংশটা আলাদা ঘেরা। দুটো বড় ঘর, একটা ছোট ঘর, একটু বারন্দা, ছোট উঠান, পেয়ে কমলা মহা আনন্দিত হ'ল। হপ্তাখানেক খেটেখুটে বেশ গোছ ক'রে নিলে। রান্নাবাড়া নিজেই করতে লাগল। সে অভ্যাস তার ছিল। রান্নাঘরটা ছোট হ'লেও তার মনের মত। কৃষ্ণরাওয়ের কাজ এমন কিছু বেশী নয়। গদীর ইংরেজী চিঠিপত্র পড়া লেখার ভার তার উপর ছিল। সকালে বিকেলে ঘণ্টা দুই তিন খাটলেই সে কাজ হয়ে যেত। বাকী সময়টা

সে কমলার কাছেই থাকত। নইলে বেচারার বড় একা একা লাগত। সে মাঝে মাঝে মনিব বাড়ী যেত, তবে চিদম্বর গৃহিণী মরাঠী গুজরাতী ভাল বলতে পারতেন না ব'লে আলাপ জমতে দেরী হচ্ছিল। কৃষ্ণরাও কমলাকে নিয়মিত লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করলে। মাষ্টার দেখলে যে ছাত্রী খুব বুদ্ধিমতী তাই তারও পড়াবার আগ্রহ দিন দিন বাড়তে লাগল। পড়াও খুব এগিয়ে যেতে লাগল।

চিদম্বর করসনদাসকে ভালবাসতেন। দুজনের প্রায়ই নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হ'ত। একদিন মনিব তার পরিচয় ভাল ক'রে জানতে চাইলেন।

করসন বললে, "শেঠজী, আমার আদিম নিবাস সুরত জেলায়, কিন্তু আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। বাপ মা ছেলেবেলাতেই মারা যান প্লেগে। আমি এক মরাঠা বাড়ীতে মানুষ হয়েছিলাম। সম্প্রতি বিয়ে করেছি। কমলাও অনাথা, বিয়ের আগে এক দূর আত্মীয়ার কাছে থাকত।"

এ পরিচয়ে চিদম্বরম্ খুশী হলেন, ভাবলেন, "ছোঁড়া তাহলে টিকে থাকবে। চালচুলো নেই, পালাবে না।" প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি বি এ পাস ক'রে কি করছিলে?"

কৃষ্ণরাও বললে, "আজ্ঞে, ভাল ক'রে লেখাপড়া শেখবার বড় সাধ ছিল। কিন্তু আমার মুরুব্বী রাও সাহেব জোর ক'রে বিয়ে দিলেন, টাকা কড়িরও অভাব পড়ল, তাই চাকরীর চেষ্টা দেখতে হ'ল।"

চিদম্বর হেসে বললেন, "তা বেশ হয়েছে তুমি আমার কাছে এসেছ। এখানে কাজ কর্ম্ম বেশী নেই, লেখাপড়ার চর্চ্চা রেখো;

আমি তোমার অবস্থার উন্নতি ক'রে দেব। বৌ-টিও বড় লক্ষ্মী মেয়ে। বাড়ীর এঁরা তাকে খুব ভালবাসেন। তুমি শেষাচারীর সঙ্গে প'ড়তে, না? সে আজ চিঠি লিখেছে। তোমায় বড় স্নেহ করে। একটা কথা, তোমাকে কি সে রাও ব'লে ডাকে?"

কৃষ্ণাজীর একটু ভয় হ'ল পাছে বন্ধু কিছু বেফাঁস কথা লিখে থাকে, তাই বললে, "শেঠজী, আমি মরাঠা বাড়ীতে মানুষ হয়েছিলাম সেখানে লোকজন আমায় রাও সাহেব, কৃষ্ণরাও ইত্যাদি বলত। সেইজন্য বন্ধু মহলেও আমার ঐ সব নাম প্রচলিত ছিল। সত্য বলতে, আমার স্বজাতি গুজরাতীদের সঙ্গে মেলা মেশার সুযোগ বড় একটা হয় নেই।"

চিদম্বরম্ হেসে বললেন, "বাপু, তোমার যে রকম শরীর, যে পালোয়ানের মত ছাতি, তোমায় দেখলে বেণের ছেলে মনে হয় না। রাও সাহেব নাম ঠিক মানায়।"

কৃষ্ণরাও বললে, "আজ্ঞে, তা ত হতেই পারে। আমার রাও সাহেব আমায় ছেলেবেলা থেকে কুস্তী করাতেন, ঘোড়ায় চড়াতেন তাঁর ছেলেদের সঙ্গে। বন্দুকও একটু আধটু ধরতে পারি। এমন কি খাওয়া দাওয়াও ওঁদেরই মত কতকটা হয়ে গেছল। এখন বিয়ের পর যথাবিধি নিরামিষ খাওয়া অভ্যাস করেছি।"

"তুমি তাহলে গোঁড়া হিন্দু নও। নব্য যুবক, বর্ণাশ্রমের পরোয়া করনা?" চিদম্বরম্ নিজে গোঁড়া মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বর্ণাশ্রমের কথা শুনে কৃষ্ণাজী চমকে উঠল, তাড়াতাড়ি বললে, "আজ্ঞে না, তা মোটেই নয়, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে আমার পুরো আস্থা আছে। তবে স্বজাতির সঙ্গে কখনও থাকি নেই, এখন ঠিক হয়ে যাবে।

চিদম্বরম্ খুশী হয়ে বললেন, "সেই ত চাই। ছেলেবেলায় অল্পবিস্তর অনাচার অনেকেই করে। বিয়ে থা ক'রে সংসারে ঢুকলেই সব ঠিক হয়ে যায়। গৃহস্থাশ্রমেই ত ধর্ম্মের যথার্থ প্রতিষ্ঠা। বৌমা তোমায় ঠিক ক'রে নেবেন।"

কৃষ্ণরাওয়ের এসব কথা ভাল লাগছিল না। কখন মুখ দিয়ে কি বেরিয়ে যায়। একটু সুযোগ পেতেই নমস্কার ক'রে স'রে পড়ল। বাড়ী গিয়েই কমলাকে সাবধান ক'রে দিলে, "আজ শেঠ সব জিজ্ঞেস পড়া করছিলেন। তুই হুশিয়ার থাকিস্। তোঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে কি বলবি ঠিক আছে ত?"

"হ্যাঁ, তা আমি ঠিক বলতে পারব। তবে আমি আর কার সঙ্গে গল্প করছি? কারও কথাই বুঝি না। রাও সাহেব, এখানে আমাদের গুজরাতী কেউ নেই? বড় দেখতে ইচ্ছা করে নিজের দেশের লোক।"

"কই কাউকে ত দেখি নেই। বোধ হয় পদস্থ লোকের মধ্যে কেউ নেই। কমলা, তুই ত ইংরেজী পড়ছিস্। ভাল ক'রে মরাঠী শেখ্, অনেক পড়বার জিনিস পাবি।"

"তা বেশ ত! আমি খুব রাজী। মরাঠী ত আমি কতকটা বলতে পারি। প'ড়তে শেখা শক্ত হবে না। আমার বড় ইচ্ছা "কেশরী", "কাল", এই সব পুণার কাগজ পড়ি।"

কৃষ্ণাজী বললে, "আমি ছ'মাসে শিখিয়ে দেব। তোর ভাবনা নেই। সে আমার ভার।"

এই রকমে এদের দিন কাটতে লাগল।

প্রথম বছরখানেক করসন কমলাকে আদরের ছোট বোনটীর মত দেখত, যদিও হয়ত সেটা সহজ হ'ত না। বাড়ীতে দুজনের দুই আলাদা ঘর ছিল। একদিন চিদম্বর গৃহিণী বেড়াতে এসে, সব ঘর দেখতে দেখতে এই নিয়ে কমলাকে বড় ঠাটা করলেন, "কমলাবাই, এ রকম সৃষ্টিছাড়া কারখানা ত কখনও দেখি নেই। তোর কি এখনও ছেলের মা হওয়ার বয়স হয় নেই?"

সন্ধ্যাবেলা কমলা মুখখানি সিন্দুর বর্ণ ক'রে করসনকে গল্প করলে। শুনে করসন দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, একটু অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিলে, "তোর সঙ্গে যে আমার বিয়ে হয় নেই রে, কমলা।" কমলার মুখ থেকে তখনও রক্তের ঝলকা নামে নেই, সে বললে, "আবার বিয়ে কাকে বলে, রাও সাহেব? সেদিন যে গল্প বলছিলে, সেই ঋষির মেয়ে শকুন্তলার, তার বিয়েতে কি পুরুত ডাকা হয়েছিল?"

প্রথম থেকেই বোধ হয় এরা দুজনায় দুজনকে মনের শূন্য সিংহাসনে বসিয়েছিল। মনকে আঁখিঠারা আর কতদিন চলবে? ধারওয়াড় যাওয়ার এক বছর পর দুই খাট এক কুঠুরীতে এল। অন্য কুঠুরীটায় পড়বার টেবিল পাতা হ'ল। বাহিরের কেউ জানলে না যে এদের মনে, এদের সংসারে, এদের নিত্য কর্ম্মে কি এক বিরাট বিপ্লব ঘটেছে। নিজেরাও হয় ত পুরোপুরি বুঝলে না। কিন্তু দেখলে যে বারমাসই মধুঋতু হয়ে গেছে, রৌদ্র জ্যোৎস্না হয়ে গেছে, জগতের যত বদরঙ্গ সব গোলাপী হয়ে গেছে। করসনের গদীর কাজ, কমলার গৃহকর্ম্ম, দুজনের একত্র বিদ্যাচর্চ্চা সবই যেন নূতন সার্থকতা অর্জ্জন করেছে। শেষাচারী মাঝে মাঝে চিঠি লেখে, কৃষ্ণাজীও তার উত্তর দেয়। কিন্তু তাদের বড় সাধের নূতন খবর কৃষ্ণাজী

তাকে কিছুতেই জানাতে পারলে না। শেষাচারী তার অন্তরঙ্গ বন্ধু বটে, কিন্তু এ যে তার চেয়েও বেশী অন্তরঙ্গ কথা। আর সত্য বলতে গেলে স্বীকার করতে হয় যে জগৎকে এ খবর জানাবার কোনও দরকার ছিল না, কেননা জগতের চোখে তাদের মিলন কাহিনী পুরানো কথা হয়ে আসছিল।

শেষাচারী কাউকে বলে নেই কৃষ্ণরাও কোথায়। গোখলে ও লেখরাজ বার বার জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু তার বাঁধা জবাব ছিল।

"কৃষ্ণাজী বিয়ে ক'রে দূর দেশে চ'লে গেছে। আমার কাছে বিদায় নিতে এসেছিল, কিন্তু কোথায় যাচ্ছে কি করবে এ সম্বন্ধে একটা কথাও ব'লে যায় নেই। কি কঠিন হৃদয় তার, এতদিনের বন্ধুত্ব এই রকম ক'রে কিছু না কয়ে কিছু না ব'লে শেষ ক'রে দিলে। একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লেখে নেই।"

লেখরাজ বিশ্বাস করত, কিন্তু গোখলে চিতপাবন ব্রাহ্মণ, তার পক্ষে কিছু বিশ্বাস করা সহজ ছিল না। সে শেষাচারীকে কেবলই শাসাত,

"এত জায়গা ঘুরে বেড়াই তার পাত্তা আর পাব না? আমি তোকে ব'লে দিচ্ছি ছ মাসের মধ্যে তার সব খবর তোকে এনে দেব। না হয় তাকেই ধ'রে এনে হাজির করব। তাকে ছাড়া হবে না, শেষাচারী। করলেই বা বিয়ে।"

একদিন গোখলে শেষাচারীর ঘরে এসেছে। দেখলে কেউ নেই। মনে করলে, বেড়াতে গেছে এখনই আসবে। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে শেষাচারীর ডেস্কের কাছে বসল। সামনেই পড়ে আছে একখানা ডাকের চিঠি। খোলা হয় নেই। ঠিকানার লেখাটা

চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। অন্যমনস্কভাবে চিঠিখানা ঘোরাতে ঘোরাতে নজর পড়ল ডাকঘরের ছাপের উপর—Dharwar 5 Jan. 15, ধারওয়াড় ৫ই জানুয়ারী ১৯১৫। সেই মুহূর্ত্তে লেখাটাও চিনলে। "কি ভয়ানক মিথ্যাবাদী শেষাচারীটা। কৃষ্ণরাওয়ের পাত্তা জানেনা! একখানা চিঠিও লেখে নেই। কিছু বলা হবে না তাকে। আমি নিজেই সন্ধান করব।"

ব'লেই বেরিয়ে পড়ল। চিঠিটা পড়বার লোভ হচ্ছিল, কিন্তু শেষাচারী রাগলে কি ভয়ানক ব্যাপার তা গোখলে ভাল ক'রেই জানত। সেই রাত্রেই বোম্বাই ছাড়ল। তার পর দিন ধারওয়াড়ে পৌঁছে খোঁজ করতে লাগল। ছোট সহর। খানিক ঘুরেই খবর পেলে কয়েকমাস আগে চিদম্বরম্ শেঠের গদীতে একজন নূতন কারকুন বোম্বাই থেকে এসেছে। বিকেলে সেখানে গিয়ে হাজির, জিজ্ঞেস করলে, "এখানে কি কৃষ্ণরাও ব'লে একজন মরাঠা যুবক কাজ করেন?"

গোমস্তারা ত ভাগিয়েই দিচ্ছিল, এমন সময় শেঠ নিজে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কাকে খুজছেন? কৃষ্ণরাও? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে কাজ করেন বই কি। আপনার নামটী কি বললেন?"

"আজ্ঞে, আমি তার বন্ধু মোরেশ্বর গোখলে। বোম্বাই থেকে আসছি।"

"তাহলে তুমি ত আমার ভাগনে শেষাচারীকেও চেন?"

"আপনি তার মামা? আমি জানতাম না, ক্ষমা করবেন।" ব'লে হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিলে।

চিদম্বর হাঁক দিলেন, “করসনভাই, করসনভাই, কে এসেছেন দেখ।”

কৃষ্ণাজী ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়েই দেখে গোখলে। বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু গোখলে দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলে। কৃষ্ণাজীর বুক দুড় দুড় করছিল। সে মনিবের অনুমতি নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে বাইরে চ'লে এল। ততক্ষণে সে সামলে নিয়েছে। ভাবলে,

“লজ্জা কিসের? শেঘাচারী ব'লে দিয়েছে ত হয়েছে কি? করেছি কি আমি যে বন্ধুকে মুখ দেখাতে পারব না?” প্রকাশ্যে বললে, “চল্, গোখলে, আমার বাসায়। কবে এলি, কোথায় আছিস্?”

পথে যেতে যেতে গোখলে বললে, “আজই এসেছি, তোর কাছে। কৃষ্ণাজী, তুই নাকি বিয়ে করেছিস্? না ব'লে বিয়ে করলি, হঠাৎ পালিয়ে এলি, একখানা চিঠি পর্যন্ত লিখলি না, মনে বড় দাগা লেগেছিল। যাক্, অনেক কষ্টে তোকে বের করেছি। কিন্তু এ অরণ্যবাস কেন রে?”

সামনের দরজায় টোকা মারতেই কমলা ভেতর থেকে গুজরাতীতে উত্তর দিলে, “এই এলাম ব'লে করসনভাই।” গোখলে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, “এ কার বাড়ী রে?” কৃষ্ণাজী ইসারা ক'রে তাকে কথা কইতে বারণ করলে। দরজা খুলেই কমলা পিছিয়ে মাথায় কাপড় টেনে দিলে। কৃষ্ণাজী বললে, “পালাস্ না কমলা, এঁর নাম তুই জানিস্, ইনি আমার বহুদিনের বন্ধু মোরেশ্বর গোখলে।”

কমলা নমস্কার ক'রে একটু হেসে মরাঠীতে বললে, "আপনি এসেছেন বেঁচেছি। এই বিদেশে এতদিন একলা থাকতে কি ভাল লাগে? আপনি বসুন। আমি আপনাদের চা তৈরী ক'রে নিয়ে আসি।"

গোখলে ম্লান হাসি হেসে বললে, "কৃষ্ণাজী, বৃথা আমার আসা, তোকে আমরা কেন হারালাম বুঝতেই পারছি। কে জানত যে স্বর্গ থেকে মেনকা নেমে এসে আমাদের বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করবে?" সে স্বামীস্ত্রীর চোখে বিজুলী খেলা দেখতে পেয়েছিল।

চা খেতে খেতে গোখলে বললে, "কমলাবেন, তোমার এ নন্দনবনে বন্ধু বান্ধবের স্থান নেই। আমি কালই চলে যাব। কিন্তু তোমার দেশ ত তোমায় ছাড়বেন না। একা কৃষ্ণাজীর কাছে যেটুকু পেয়ে খুশী হতেম, এখন যে তার দ্বিগুণ চাই।"

কমলা উত্তর দিলে, "মোরোপন্ত, আমি ত ও সব কঠিন কথা বুঝতে পারিনা এখনও। আপনি আপনার বন্ধুকে বলুন।"

একটু পরে কমলা জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার আজ রাত্রে খাওয়ার কি হবে? আমি রাঁধব ত?"

গোখলে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "না না কমলাবেন, তুমি কেন কষ্ট করবে? বাজার থেকে কিছু ফল মূল মিষ্টি আনিয়ে দিও।"

"মোরোপন্ত, আমি মূর্খ, সব কথা বুঝিনা। কিন্তু আপনি এইটুকু আজও দেশমাতাকে দিতে পারছেন না? আমি যে আপনার বহিন্, বন্ধুর স্ত্রী, আপনার দেশেরই মেয়ে, আমার হাতে ভাত খেতে সঙ্কোচ করছেন? ভারতমাতা এটুকু না পেলে খুশী হবেন কি? আপনার বন্ধুকেই বা নিয়ে যেতে এসেছেন কোন সাহসে?"

গোখলে লজ্জিত হয়ে বললে, "না কমলা, তুমি ভাত রাঁধ, আমি খাব। তোমারই হাতে আমার দীক্ষা হোক। কৃষ্ণাজী, ধন্য তোর শিক্ষা! আমি আজ আর কোনও কথা কইব না। আবার কিছুদিন পরে আসব।"

পরের দিন যাবার সময় গোখলে জিজ্ঞাসা করলে, "কমলাবেন, যদি কোন দিন তোমার করসনজীকে দেশের জন্য চাইতে আসি, দেবে ত?"

কমলা নির্ভীক স্বরে উত্তর দিলে, "দেব, যদি দুজনকেই নিয়ে যান।" কৃষ্ণাজী নির্ব্বাক! আজ দুবছর সে মাষ্টারী করছে, কিন্তু ছাত্রী যে এতটা এগিয়েছে তা তার ধারণা ছিল না। তার কমলের মাঝে যে লুকানো বজ্র আছে তা সে জানত না। গোখলে চলে যাওয়ার পর, সে চেয়ে দেখলে যে কমলার চোখ যেন জ্বলছে।

"করসনভাই, তোমার বন্ধু চায় কি? তোমার কাছেই ত শুনেছি যে ঐ মোরোপন্তের জাতের লোকেরা মরাঠাদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে একদিন তোমাদের বিশাল রাজ্য ছারখারে দিয়েছিল। ওদের জাতের দেমাক এখনও গেছে কি? না গিয়ে থাকে ত ও তোমার মত লোকের কাছে কি চাইতে আসে? তোমার পায়ের কড়ে আঙ্গুলেরও যোগ্য ত ও নয়।"

কৃষ্ণরাও স্ত্রীকে ঠাণ্ডা করার জন্য উত্তর দিলে, "গোখলেরা কি চায় তা তোকে আমি একদিন বোঝাব। আরও কিছুদিন পড়াশুনা করতে হবে আগে। তুই ঠিক উত্তর দিয়েছিস্ ওকে, আমরা যা করব দুজনে। তোকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না, যেতে পারবও না। এখন আয়, একটা গান কর্, শুনি।"

* * *

এর কয়েকমাস আগে ইউরোপখণ্ডে মহাযুদ্ধ বেধে গেছে। দেশ বিদেশের যোদ্ধা হাজারে হাজারে মরছে। আরও মরতে চলেছে কাতারে কাতারে। কৃষ্ণরাওয়ের চোদ্দপুরুষের সেপায়ের রক্ত মাথার ভেতর চ'ড়ে গিয়ে তাকে যেন পাগলের মত ক'রে তুলেছে। ক্রমে, গদীতে নিত্যকর্ম্ম করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। কমলা সব জানে, কিন্তু তবুও বুঝতে পারে না যে ইংরেজে জার্ম্মানে যুদ্ধ বেধেছে তাতে তার স্বামী কেন এত বিচলিত। একদিন কৃষ্ণরাও বিমর্ষ হয়ে শুয়ে প'ড়ে আছে। কমলা কাছে গিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করলে,

"হ্যাঁ রাও সাহেব, তুমি কেন এত মন খারাপ করছ? এ লড়াইয়ে যেই জিতুক্ হারুক্ তোমার কি এসে যাবে? আমাদের দেশেরই বা কি এসে যাবে?"

স্বামী উত্তর দিলে, "কমলা, তোকে কি ক'রে বোঝাব? আমায় যেন দিবারাত্র কে হাতছানি দিয়ে ডাকছে আর বলছে, 'এত বড় মরণ বাঁচনের খেলা চলেছে, আজ তুই বসে থাকবি, পওয়ার? তোর প্রমার রাজপুতের রক্ত এতেও গরম হবে না?' মাথায় যেন আগুন জ্বলছে, কমলা, স্থির থাকতে পারছি না।"

কমলা বললে, "গেলে যদি সুখী হও, রাও সাহেব, তুমি যাও। আমি রাজপুত মরাঠার মেয়ে নই বটে, কিন্তু আমিও মরণকে ডরাই না।"

"না, কমলা, না। আমি যেতে পারব না তোকে একলা ফেলে। বৃথা আমার পূর্ব্বজরা আমায় ডাকাডাকি করছেন। আমি আর কৃষ্ণরাও পওয়ার নেই।"

এর দুচারদিন পরে শেষাচারীর এক চিঠি এল। সে গোখলে সম্বন্ধে কৃষ্ণাজীকে সাবধান ক'রে দিয়েছে। লিখেছে, "এরা একটা কিছু অসমসাহসিক কাজে মেতেছে, তোর কাছে গোখলে আবার যাবে।" আর এক কথা চিঠিতে ছিল। বৃদ্ধ বলবন্তরাও পুনরায় তাঁর পলটনে নাম দিয়েছেন, শীঘ্র ফ্রান্স যাচ্ছেন। শেষাচারীর সঙ্গে তাঁর হঠাৎ বোম্বাইয়ে দেখা হয়েছিল। নিরুদ্দেশ ছেলের জন্য তিনি অনেক চোখের জল ফেললেন আর বললেন, "এত বড় কাণ্ড হচ্ছে, আমি না গেলে বিজয়গড়ের কলঙ্ক হবে।"

পত্র প'ড়ে কৃষ্ণরাও একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। বিজয়গড়ের ইজ্জতের জন্য তার বৃদ্ধ বাপ যুদ্ধে চলেছেন, আর সে, সে যুবতী স্ত্রীর চিত্তবিনোদন করছে। কয়েকদিন ছুটী নিয়ে বাড়ী ব'সে রইল। খাওয়াদাওয়া ঘুম সব গুলিয়ে গেল। কমলা কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাচ্ছিল না। একদিন কৃষ্ণরাও তার সামনে ফেলে দিলে শেষাচারীর চিঠি। কমলা সবটা দুতিনবার পড়লে।

কৃষ্ণরাও জিজ্ঞাসা করলেন, "পড়লি? কি বলিস্, কমলা?"

কমলা দাঁড়িয়ে উঠে দৃঢ়স্বরে বললে, "আমি তোমায় মানুষ খুন করতে যেতে কখনও বলব না। তবে তুমি যেতে চাও ত আমার জন্য ভেবো না। আমি নিজেকে দেখব, যত্ন করব, তোমার পথ চেয়ে ব'সে থাকব। বিজয়গড় ত দেখি নেই, সেখানকার বৌ হওয়ারও আমি আশা রাখি না, তার ইজ্জতের কথা আমি কি বুঝব, বল।"

কৃষ্ণরাও জোরে মাথা নেড়ে বললে, "না, আমি যাব না। কিন্তু দূরে পালাতে হবে, কমলা, যেখানে বাবার কি বিজয়গড়ের কোন

খবর শুনতে না পাই।” কমলা কাছে ব’সে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, কিছু বললে না।

কৃষ্ণরাও মন স্থির করেছে কোথাও চলে যাবে। পরদিন চিদম্বর শেঠকে জানালে যে ধারওয়াড়ের জল হাওয়া তার মোটেই সহ্য হচ্ছে না, গেল কদিন বিছানায় প’ড়ে প’ড়েই কাটিয়েছে, কিছু খেতে পারে না, রাত্রে ঘুম হয় না। শেঠজী ভাল মানুষ, একটুও বিরক্ত হলেন না। বললেন, “হ্যাঁ চেহারা বড় খারাপ হয়ে গেছে।” তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, “কি করবে? কিছুদিন ছুটী নিয়ে একবার দেশে ঘুরে আসবে?” দেশে ঘুরে আসবার কথা শুনে কৃষ্ণাজীর সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। আস্তে আস্তে বললে, “আমার বড় সঙ্কোচ হচ্ছে বলতে, কিন্তু যদি অন্যত্র একটা কাজ জোগাড় হয় ত বড় উপকার হয়।”

চিদম্বর উত্তর দিলেন, “শরীর ভাল থাকছে না করবে কি? আমি তোমায় আর এক জায়গায় পাঠাতে পারি অনেক দূরে। মাদ্রাজেও আমার এক গদী আছে, যাবে সেখানে? মাইনে এখানকার মতই পাবে। কাজও একই রকমের। একটা শুধু গলদ আছে। আমার সেখানকার মেনেজার বড় বদমেজাজী, খামখেয়ালী লোক। তার সঙ্গে একটু চেষ্টা ক’রে বনিয়ে চলতে হবে। পারবে?”

কৃষ্ণাজী বললে, “আপনার অসীম দয়া। আমি মেনেজার সাহেবকে প্রাণপণ চেষ্টা ক’রে খুশী করব। যত শীঘ্র সম্ভব আমায় বিদায় ক’রে দিন। আমার স্ত্রী বড় ভয় পেয়ে গেছেন।”

দিন চার পাঁচ পরে মাদ্রাজ যাওয়া ঠিক হ’ল। তার আগে

একদিন গোখলে এসে হাজির। তাকে দেখে কমলা অত্যন্ত বিরক্ত হল। ভাবলে, "এ আপদ আবার এ সময় কেন?"

গোখলে কৃষ্ণাজীকে বলতে লাগল, "তোর বাবা ও জ্ঞাতিরা অনেকেই ফরাসী দেশে চলে গেছেন ল'ড়তে। কি উল্‌টো বুদ্ধি দেখ্? ইংরেজ জিতলে আমাদের লাভ কি হবে?"

কমলা সেখানে বসেছিল, রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "মোরোপন্ত, ইংরেজ হারলেই বা আমাদের কি অমূল্য নিধি লাভ হবে?"

গোখলে ধীরভাবে বললে, "সেই কথাই বলতে এসেছি, কমলা-বেন। তাতে আমাদের লাভ আছে। কৃষ্ণরাও জানে যে আমরা আজ কয়েক বছর ধ'রে কিসের ধ্যানে ডুবে আছি। আমাদের সমস্ত জল্পনা কল্পনা বাস্তবে পরিণত করবার দিন এসেছে। জার্ম্মানী ইংরেজ সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ করবার জন্য নানা জায়গায় বিপ্লবের পত্তন করতে চেষ্টা করছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, আয়র্লণ্ড, ভারতবর্ষ সর্ব্বত্র তাদের চর ঘুরছে টাকা নিয়ে। শুনতে পাই এদেশেও কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র এসেছে। তারা সৈন্য পাঠাবেও বলেছে। সকল রত্নের সেরা যে রত্ন তাই আমাদের হাতের কাছে এসেছে, কমলাবাই। নিতে হাত বাড়াব না? তোমার স্বামীকে নিতে এসেছি। তাকে আমার সঙ্গে যেতে দাও।"

কৃষ্ণরাও একটী কথাও কইলে না। কমলা উত্তর দিলে, "মোরোপন্ত, মনে রাখবেন, সকল রাজাই ত আর রামচন্দ্র নয় যে রাবণকে মেরে তার ভাইকে সিংহাসনে বসিয়ে আযোধ্যায় ফিরে যাবে। মনিব বদল ক'রে আজ আমাদের কি কিছু লাভ আছে? সেদিন রাও সাহেব আমার কাছে গল্প করছিলেন রঘুনাথ রাও পেশোয়ার কথা। ভাইপোকে খুন ক'রেও যখন রাজ্য পেলে না,

ইংরেজকে ডাকলে তাকে গদীতে বসাবার জন্য। তারপর পঞ্চাশ বছর গেল না, পেশোয়ার গদী খাক হয়ে গেল। আপনারই জাতের লোক ছিল এই রঘুনাথ রাও। আবার সেই ভুল করবেন না, মোরোপন্ত। আমি আমার স্বামীকে বলেছি যে মানুষ মারার কথা পর্য্যন্ত আমি সইতে পারি না। তবে তিনি আপনার সঙ্গে যেতে চান যেতে পারেন। আমি বাধা দেব না। আমার জন্য কোনও চিন্তা নেই, রাও সাহেব। বেণের মেয়ে, কোথাও নুন-তেলের দোকান ক'রে দিন গুজরান করব।"

কৃষ্ণাজী ক্ষীণ স্বরে বললে, "গোখলে, দুজনকেই নিয়ে চল্ না।"

গোখলে একটু ভেবে উত্তর দিলে, "সে ত বড় সুখের বিষয় হত। কিন্তু এখন যে কাজ সামনে রয়েছে, তাতে স্ত্রীলোক কি করবে? শুধু শুধু কমলাবেনকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?"

কমলা রেগে উঠল, "স্ত্রীলোক কি করবে, স্ত্রীলোক কি করবে, এখনও ঐ কথা? ও বুদ্ধি নিয়ে বেশী দূর এগোতে পারবেন না, মোরোপন্ত। কেবল কসাইগিরি ক'রে দেশ উদ্ধার হবে না।"

কৃষ্ণরাও দুজনের কথা কাটাকাটি বন্ধ করার জন্য বললে, "কয়েক সপ্তাহ সময় দে, গোখলে। আমি কমলার সঙ্গে সমস্ত বিষয়টা আলোচনা করি। তুই আর একবার আসিস্।"

গোখলে একটু নিশ্চিন্ত হ'ল, "সেই ভাল, ভাই। তুই কমলা-বেনকে সব বুঝিয়ে বলিস্। মিছে তর্ক ক'রে লাভ কি? আমি আজই বোম্বাই ফিরে যাই। সেখানে অনেক কাজ।"

গোখলে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র কৃষ্ণরাও স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললে, "চল্, কমলা, কালই মাদ্রাজ বেরিয়ে পড়া যাক্। আমি দূরে পালাতে চাই।"

কমলা কৃষ্ণাজীর হাত হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে উত্তর দিলে, "তা যাব, করসনভাই। কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি তুমি শুধু আমার উপর দয়া ক'রে নিজের কর্ত্তব্য স্থির ক'রনা। আমি স্ত্রীলোক, জাতে বৈশ্য, আমার রক্তপাতে জন্মগত বিতৃষ্ণা। কিন্তু আমি তোমার উপর কোনও দাবী করতে চাই না, স্নেহের দাবীও নয়। তুমি আমায় যা দিয়েছ, তার শোধ আমি এ জীবনে দিতে পারব না। আমি জানি, বুঝি, যে তুমি বীর, বীরের রক্তে তোমার জন্ম। যে কাজ ক'রেই তুমি তোমার জীবন সার্থক করতে চাও, অবশ্য করবে। কিন্তু তোমার বন্ধুদের মধ্যে আমি এক মোরো-পন্তকেই দেখেছি। তাঁকে দেখে আমার স্বার্থত্যাগী বীরচূড়ামণি ব'লে মনে হয় না। পুণার ব্রাহ্মণ, তোমায় সামনে ঠেলে দিয়ে পেছনে লুকিয়ে থাকবে। আমার উপর রাগ কর না, রাও সাহেব। আমার সব কথাই ত তোমার নিজের কথার প্রতিধ্বনি। সবদিক ভেবে মতি স্থির কর।"

কৃষ্ণাজী বললে, "কমলা, তুই গোখলেকে বোধহয় বুঝতে পারিস্ নেই। তাই তার উপর অবিচার করছিস্। কিন্তু তাতে এসে যায় না, কেন না আমি এখান থেকে পালাব স্থির করেছি। পালাব বলছি এই জন্য যে আমার কর্ত্তব্য স্থির করার ইচ্ছাও নেই, শক্তিও নেই। আমি তোকে ফেলে কোথাও যেতে পারব না।"

কমলা স্বামীর মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে হেঁট হয়ে পায়ের ধূলো নিলে। তারপর মাদ্রাজ যাত্রার বাঁধা ছাঁদা আরম্ভ হ'ল।

পরদিন ষ্টেশনে বিদায় নেবার সময় কৃষ্ণরাও চিদম্বরকে এই অনুরোধ করলে, "শেঠজী, আমার একটা কথা রাখবেন কি? আমি কোথায় যাচ্ছি এ কথা প্রকাশ করবেন না। গোখলে হয় ত

এসে খোঁজ করবে তাকেও কিছু বলবেন না। শেষাচারীকে আমি এই জানাব যে নিরুদ্দেশ যাত্রা করছি, সে যেন চিঠিপত্র এই ঠিকানায় লেখে।"

চিদম্বরম্ হেসে বললেন, "কেন হে টাকা ধারটার করেছ না কি? আমাদের ব্যবসাদার মহলে এ রকম নিরুদ্দেশ যাত্রা ঢের হয়। তা বেশ, আমি কাউকেই তোমার ঠিকানা দেব না। মাদ্রাজের মেনেজারের কথা মনে আছে ত? তাকে একটু বুদ্ধি ক'রে চালিয়ে নিও।"

স্বামী স্ত্রী শেঠকে নমস্কার ক'রে গাড়ীতে উঠল। ট্রেণ ছেড়ে দিলে। দুজনেই চিন্তাকুল। এক গাড়ী লোক, রেলের ঘড়ঘড়ানি, কথাবার্ত্তা কওয়ার সুবিধা নেই।

কৃষ্ণাজী ভাবছে, "এর আগে কোনদিন কোনও পওয়ার কি রণে ভঙ্গ দিয়েছে?"

কমলা ভাবছে, "কি ক'রে আমি এত বড় স্বার্থবলির যোগ্য হতে পারব?" অত লোকের মাঝেও স্বামীর মুখ থেকে চোথ ফেরাতে পারছে না, "না জানি কত কষ্টই পাচ্ছেন!"

* * * *

মাদ্রাজ পৌঁছে কৃষ্ণরাও দেখলে যে এখানে মহা ভাষা সঙ্কট। সে হিন্দী মরাঠী, এমন কি কানাড়ী ব'লেও কুলী মজুর গাড়োয়ানকে কিছু বোঝাতে পারে না। বরং ইংরেজী দুচার কথা অনেকেই জানে। ইংরেজী ও ইশারার সাহায্যে কোন গতিকে জিনিস পত্র বেঁধে সেঁধে নিয়ে দুজনে নূতন মনিবের দোকানে গিয়ে নামল। প্রথম দর্শনেই কৃষ্ণরাও বুঝলে যে মনিব বদমেজাজী লোক বটে।

মুখের ভাব রুক্ষ, কথাবার্ত্তা মোটেই মোলায়েম নয়। আলাপ হবার সঙ্গে সঙ্গে অনর্গল নানা রকম বকবকানি সুরু ক'রে দিলে।

"দেখ, আমি কাজের লোক চাই। তুমি সুপারিশ নিয়ে এসেছ ব'লেই রাখব এমন নয়। তুমি যত্ন ক'রে কাজ করবে তাহলেই আমি বুঝব যে মাসে তিরিশ টাকা জলে ফেলে দিচ্ছি না। কোন্ মুলুকের লোক তোমরা? গুজরাতী? তা দেশ ছেড়ে এত দূরে এসেছ কেন? কিছু অকর্ম্ম ক'রে পালিয়ে আস নেই ত? আবার বিয়েও করেছ দেখছি। আজ কালকার ছেলেদের রোজগারের সঙ্গে খোঁজ নেই বিয়েটা করা চাই। যাক্, যখন বৌ এনেছ একটা বন্দোবস্ত ত ক'রে দিতে হবে। একটা ঘর দেব, আর বারান্দার খানিকটা চাটাই দিয়ে ঘেরে দেব, তাইতে চালিয়ে নেবে। আলাদা রান্নাঘর ক'রে দেওয়ার সুবিধা নেই।"

একে কৃষ্ণাজীর মেজাজ খারাপ হয়ে রয়েছে, তার উপর নেমেই এই অভ্যর্থনা, সে একটা কড়া রকমের জবাব দিতে যাচ্ছিল। কমলা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বললে, "আপনি আমাদের যা বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন তাই যথেষ্ট। আমাদের কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস আছে। আপনি পিতৃতুল্য লোক, দয়া ক'রে স্থান দিচ্ছেন তা আমরা ভুলব না।"

শেঠজী শান্ত হলেন বটে, কিন্তু একটু টিপ্পনী কাটতে ছাড়লেন না, "এই যে বৌমাটীও ইংরেজী বলেন দেখি। বেশ, বেশ, বড় সুখের বিষয়।"

কমলা স্বামীকে এক রকম টানাটানি ক'রেই তাদের ঘরের দিকে নিয়ে গেল। ঘর দেখে কমলার চোখে জল এল। এ ঘরে সে কৃষ্ণরাওকে কি ক'রে রাখবে! যাহোক্, এখনই একটা গোলমাল

বাধিয়ে কাজ নেই, কোন রকমে এরই ভেতর গোছগাছ ক'রে নিতে হবে।

গোছ ক'রে নিলে বটে কিন্তু বড় কষ্ট হতে লাগল। ধারওয়াড়ের ঘরগুলির জন্য কমলার বড় মন কেমন করত। দুদিন না যেতে যেতেই কৃষ্ণরাও বুলি ধরলে, "একমাস দেখব। যদি ঘর দোর ভাল না দেয় ত চলে যাব। তোর এত কষ্ট আমি চোখে দেখতে পারি না।"

এখানে গদীর কাজও তেমনই বিশ্রী। চিদম্বরমের চিঠি পত্র লেখা সহজ ব্যাপার ছিল। এঁর একটা সামান্য চিঠি লিখে নিতে আধ ঘণ্টা সময় লাগে। মিনিটে মিনিটে মত বদলাচ্ছে। একবার কাট, আবার লেখ, আবার কাট, এই করতেই অর্দ্ধেক সময় যায়। কাজেই দপ্তরে অনেকক্ষণ থাকতে হয়। কমলা বেচারা একা একা সেই আধ অন্ধকার ঘরে ব'সে থাকে সমস্ত দিন। এই সব পাঁচ রকমে কৃষ্ণরাওয়ের মেজাজ অত্যন্ত খিঁচড়ে রয়েছে।

দিন পনের বাদ এক ঘটনা ঘটল, যাতে ক'রে তার চাকরী সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আর ভাবতে হ'ল না, থাকব কি চ'লে যাব। একদিন সাতটার সময় ছুটী পেয়ে কৃষ্ণরাও একটু মাথা ঠাণ্ডা করতে সমুদ্র কিনারে বেড়াতে গেছে। সঙ্গে একজন চেট্টি সওদাগর। চেট্টি মহাশয় বড় সদাশয় লোক। কাছেই তাঁর বাড়ী। আগেও দুই একদিন দুজনে এক সঙ্গে বেড়াতে গেছলেন। নানা রকম গল্প করতে করতে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় এক সৈনিক পুরুষ একটু মত্ত অবস্থায় টলতে টলতে চেট্টি মহাশয়কে এক ধাক্কা মারলে। চেট্টি বয়স্থ লোক, ধাক্কা সামলাতে পারলেন না। করসনজী এক মূহুর্ত্তে তার গুজরাতী খোলস ফেলে দিয়ে এক লাফে

সৈনিকের ঘাড়ে পড়ল। তার দুই কাঁধ বজ্রমুষ্টিতে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার বুড়ো মানুষকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে লজ্জা করে না? কাপুরুষ! যদি যুদ্ধের এত সাধ ত এখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?" সৈনিক "ড্যাম" ব'লে মারলে এক ঘুষো। কৃষ্ণরাওয়ের ঘুষো সহ্য করার ও ফিরিয়া দেওয়ার ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। সুতরাং একটা সংঘর্ষ অনিবার্য্য। বেশ চলেছে, এমন সময় দুচারজন লোক মাঝে পড়ে ছাড়িয়ে দিলে। চেট্টি মহাশয় কৃষ্ণরাওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ী নিয়ে গেলেন।

পরদিন সকালবেলা চেট্টি কৃষ্ণরাওয়ের মনিবের সঙ্গে দেখা ক'রে তার অনেক সুখ্যাতি ক'রে গেলেন। তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ব'লে গেলেন, "করসনভাই, তোমার যখন যা দরকার হবে আমাকে জানাতে লজ্জা ক'র না! আমাকে বন্ধু ব'লে মনে ক'র।"

মনিবের এসব কথা ভাল লাগছিল না। তার ছোট মন, সে মনে করছিল চেট্টি আমার গোমস্তাটীকে ভাঙ্গিয়ে নিচ্ছে। সে বড় লোক, ইচ্ছা ক'রলে না পারে এমন নয়। চেট্টি চ'লে যাওয়ার পর একটু মেজাজ ক'রে বললেন, "করসন, তুমি যার তার সঙ্গে এত মেশামেশি কর কেন?

করসনের ধৈর্য্য প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। সে বললে, "আপনি কি তিরিশ টাকার মত কাজ আমার কাছে পাচ্ছেন না?"

মনিব খুব গলা উঁচু ক'রে বললেন, "না, কাজ বিশেষ পাচ্ছি না। তা ছাড়া তুমি জাননা কি ক'রে মনিবের সঙ্গে কথা কইতে হয়। সামান্য কারণে কাল তুমি গুণ্ডার মত রাস্তায় ঝগড়া ঝাঁটি ক'রে এলে। এতে দোকানের নাম খারাপ হয় না? সাহেবের গায়ে পর্য্যন্ত হাত তুলতে তুমি দ্বিধা কর নেই! তোমার মত

দাঙ্গাবাজ লোক আমরা রাখি না। তুমি অন্যত্র গিয়ে দরওয়ানের কাজ নাও। এখানে তোমার অন্ন উঠেছে।”

কৃষ্ণাজীর মনে একটু আহ্লাদই হ'ল। সে নমস্কার ক'রে জানালে যে যত শীঘ্র সম্ভব ঘর খালী ক'রে দেবে, কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময় চায়। কমলাকে গিয়ে সব কথা জানিয়ে চেট্টি মহাশয়ের কাছে গেল। তিনি ব্যাপার শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

“আমার জন্য তোমার এই অবস্থা হ'ল করসনভাই! আমি বড় লজ্জিত হয়েছি। বুড়ো বয়সে তোমায় ভাল করতে পারলাম না, মন্দ করলাম? এখন কি করবে?”

“আপনার বাড়ীর কাছেই একটা বাসা খালী আছে সেইটে নিচ্ছি। আজই আমার স্ত্রীকে নিয়ে সেখানে আসছি। পরে দেখা করব। আপনি কিন্তু এ কথা নিয়ে মন খারাপ করবেন না। এ আমার শাপে বর হ'ল। আমি সাহস ক'রে চাকরী ছাড়তে পারছিলাম না, নইলে ওখানে সব রকমেই বড় কষ্ট হচ্ছিল।”

সন্ধ্যা বেলা স্বামী স্ত্রী দুজনেই চেট্টি মহাশয়ের বাড়ী গেল। তাঁর গৃহিণী তাদের খুব যত্ন আদর ক'রে খাওয়ালেন আর বললেন “কমলাবাই, এ বাড়ী তোমার নিজের বাড়ী বলে মনে করবে। যখন ইচ্ছা আসবে যাবে। আমার কেউ নেই; আমাকে একটু আদর যত্ন করবে।” চেট্টিদের মাত্র এক ছেলে, সে রেঙ্গুনে থাকে। এ বছর বৌ সেখানে নিয়ে গেছে। বুড়ো বুড়ী নিতান্তই একা।

বাড়ী ফিরে কৃষ্ণরাও একটু হেসে কমলাকে বললে, “আজ ত খুব খাওয়া দাওয়া হ'ল। এখন কাল থেকে কি করা যায় বল্ দেখি। কিছু না হয় ত চেট্টিদের ওখানে উঠে যাওয়া যাক। তুই ত খুব খাতির জমিয়েছিস্ সেখানে।”

কমলা একটুও হাসলে না, খুব ঝাঁঝাল স্বরে জবাব দিলে, “মারামারি করবার আগে এ সব কথা মনে হয় নাই ত! কথায় বলে মারহাট্টা। গায়ে জোর থাকলেই সেটা দেখান চাই।”

কৃষ্ণরাও রাগ করলে না, যদিও এ রকম কথা কমলার মুখে আজ প্রথম শুনলে। ধীরে ধীরে বললে, “কমলা, যদি চেট্টি না হয়ে তুই গোরার ধাক্কা খেয়ে প’ড়ে যেতিস্। তাহলেও কি সেটা আমার হজম করা উচিত হত?”

আর বেশী কথা কিছু হ’ল না। তবে শুতে যাওয়া পর্য্যন্ত কমলা মুখ ভার ক’রে রইল। সে বুঝতে পারছিল যে তার স্বামী ঠিক পরের খেদমৎ করার মত মানুষ নয়।

সকালে উঠে সে স্বামীকে বললে, “দেখ, আমি সারারাত অনেক ভেবেছি। তোমার যা মেজাজ, তুমি পরের চাকরী করতে পারবে না। একটা ছোট দোকান কর না, তাহলে আর অন্য লোকের মন জুগিয়ে চলতে হবে না।”

“আমি দোকান করব? কিসের দোকান? আমি ত ও সবের কিছুই জানি না।”

“সাধারণ চাল দালের, নুন তেলের দোকান ক’রে আরম্ভ করা যাক্। তুমি কিছু না জান, আমি ত জানি। ছেলেবেলায় আমার বাবার দোকানে সবই ত দেখেছি।”

“তুই দোকানে বসবি কমলা? সে আমি কেমন ক’রে রাজী হব?”

“কেন হবে না? তুমি কয়সন শেঠ, একথা বার বার ভুলে যাও কি ক’রে? কাল ত ভুলে গেছলে, তাই এতটা কাণ্ড বাধল।”

"কমলা, রাগ করিস্ না। তুই ত জানিস্ আমায় কত জিনিস ভুলতে হচ্ছে, কত নূতন জিনিস শিখতে হচ্ছে। এক আধটা চুক হবেই। যে এক মনিবকে খুশী করতে পারলে না, সে দোকান ক'রে পাঁচ শ খদ্দেরের মন জোগাতে পারবে কি? একবার চেট্টি মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আসি।"

"তা যাও, তিনি কখনই বারণ করবেন না।"

তাই হ'ল। বারণ করা দূরে থাক, চেট্টি কমলার খুব প্রশংসা ক'রে বললেন, "এই ত চাই। বিপদে উপস্থিত বুদ্ধি না হ'লে বাড়ীর গৃহিণী কা'কে বলেছে! উত্তম পরামর্শ। এইখানেই কাছাকাছি একটা ঘর দেখে নাও সস্তা রকমের। পয়সা কড়ি প্রথমটা যা দরকার আমি দেব।"

কৃষ্ণাজী বললে, "শেঠজী, আপনার অশেষ দয়া। টাকার দরকার হবে না। আমার কিছু পুঁজী আছে। তবে প্রয়োজন মত উপদেশ দিয়ে সাহায্য করবেন।"

শুভদিনে দোকান আরম্ভ হ'ল। দোকানের দুই ভাগ। যে দিকটায় মুদীখানা, সেইখানে কমলা নিজে সকাল বিকেল বসে। তবে ভাষা বিভ্রাটের জন্য একজন চাকরও রেখেছে। অন্য আধখানায় খুচরা জিনিসের দোকান, কাগজ, কলম, কালীও আছে আবার সাবান, চিরুণী, সুগন্ধ ইত্যাদিও আছে। সেখানে করসনজী বসে। চেট্টি মহাশয় তার কাছে ব'সে মাঝে মাঝে গল্প স্বল্প ক'রে যান। তাঁর পরিচিত দুচার ঘর বাঁধা খদ্দেরও ক'রে দিয়েছেন। অল্প দিনের মধ্যে বেশ আয় হ'তে লাগল। দোকানের বহরও বাড়তে লাগল। হিসাবপত্র কমলা নিজে রাখে। জিনিসপত্র কি চাই না চাই সেই ঠিক করে। ওসব ব্যাপারে স্বামীর বিষয়বুদ্ধির

উপর সে নির্ভর করে না। তবে তিনি চোদ্দপুরুষের জায়গীরদার, বনেদী আদব কায়দা, যে দেখত সেই মোহিত হয়ে যেত। আবার আসত। এটার উপর বুদ্ধিমতী স্ত্রী অনেক নির্ভর করত।

এই রকমে এক বছর কেটে গেল। একদিন কমলা তার স্বামীকে বললে, "রাও সাহেব, আসছে মাস থেকে আমি আর দোকানে বসব না। দরকার নেই। জানি, তুমি এতে খুব খুশী হবে। তুমি চাকরটাকে নিয়ে দুদিক দেখতে পারবে ত? হিসেব-পত্র আগের মত আমিই রাখব।"

হিসেব থাকে গুজরাতীতে, কিন্তু কাজকর্ম্ম চলে তামিল ভাষায়। দুজনেই বেশ তামিল বলতে পারে এখন। ব্যবসায়ের যে এত উন্নতি হ'ল, সেটা কতক চেট্টি মহাশয়ের সাহায্যে, কতক দোকানদার দম্পতীর নিজগুণে। একটা সাধারণ মুদীর দোকানে কমলার মত শিক্ষিতা সুন্দরী খদ্দেরদের পরিচর্য্যা করছে, এ ত আর প্রায় দেখা যায় না। ক্রমশঃ দাঁড়াল এই যে, সে পাড়ার ভদ্রলোকেরা চাকর না পাঠিয়ে নিজেরাই সওদা করতে আসতে লাগলেন। কখনও বা বাড়ীর মেয়েদের পাঠাতেন। কৃষ্ণরাওয়ের ঘরটায় ত হরদম তিন চারজন ভদ্রলোক বসে আছেন, গল্পগুজব করছেন। আস্তে আস্তে দোকানের জন্য আরও ঘর ভাড়া নেওয়া হ'ল। মালও নানা রকমের এল। কাগজ কলমের সঙ্গে কৃষ্ণরাও খবরের কাগজ, মাসিক পত্রিকাও রাখতে আরম্ভ করলে। পেছনের কুঠুরীটা হ'ল আপিস ঘর। কমলা সেইখানে বসত। সন্ধ্যাবেলায় বন্ধুবান্ধবের জমায়েৎ সেইখানে হত। নানা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক উঠত। তর্কের বিষয়েরও অভাব নেই। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। সমস্ত জগৎ শ্রান্ত, অবসন্ন। বড় বড় লম্বা লম্বা কথা চারিদিকে সকলেই বলছে। এইবার

পৃথিবীতে চিরশান্তি আসছে। জাতে জাতে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, বিরোধ বন্ধ হয়ে যাবে। প্রবল আর দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করবে না। একটা বিশ্বজোড়া মৈত্রী পূর্ণিমার চাঁদের মত চারিদিক স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত ক'রে দেবে। আর ভারত, ভারতের দুঃখের নিশা অবসান হয়েছে, তার আর কোন দুঃখই থাকবে না। বৃটানিয়া দেবী স্বহস্তে ভারতমাতার কপালে রাজটীকা পরিয়ে দেবেন। কমলার আজ বড় আনন্দের দিন। তার মনের ভাব, যেন তারই জয় হয়েছে। স্বামীকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে সবাইকে বলত, "এদিন আসবে আমি চিরদিনই জানতাম, চিরদিনই ব'লে এসেছি, কেউ শোনে নেই।"

কৃষ্ণাজী একদিন চুপি চুপি স্ত্রীকে বললে, "কমলা, দেখিস্ তোর ফুলের সাজির ভেতর থেকে কেউটে সাপ না বেরিয়ে পড়ে ফোঁস ক'রে।" কমলাবাই মুখ ভার ক'রে রইল।

সে এখন পাঁচজনের একজন হয়েছে। নিজে ভেবে নিজের মতামত ঠিক করতে পারে। আর বাড়ীর কোণে ব'সে থাকতে পায় না, থাকেও না, হয় ত থাকতে চায়ও না। কত সভা সমিতিতে যেতে হয়। দুপাঁচটা বারোয়ারী ব্যাপারে পাণ্ডাগিরিও করতে হয়। মিসেস্ করসনদাসকে সবাই টানাটানি করে। এদের এই রকমে দিন যাচ্ছে। কমলার মন থেকে শেষাচারী গোখলের বিভীষিকা চ'লে গেছে।

* * *

এমন সময় একদিন হঠাৎ শেষাচারী এসে উপস্থিত হ'ল। সে এখন বোম্বাইয়ে ওকালতী করে। একবার দেশে বেড়াতে এসেছে। কৃষ্ণাজী তাকে দেখে আনন্দে জড়িয়ে ধরলে।

শেষাচারী জিজ্ঞাসা করলে, "কমলাবাই কোথায়? ডাক্, একবার দেখা ক'রে যাই।"

"স্ত্রীমহামণ্ডলের সভায় গেছেন বুঝি।" বলবার সময় কৃষ্ণরাওয়ের মুখটা একটু বিকৃত হয়েছিল বোধ হয়, কেননা বন্ধু বললে, "কই, তোর ত খুব উৎসাহ দেখছি না।"

"উৎসাহের খুব বেশী কারণ নেই। তা ছাড়া আমার উৎসাহে নিরুৎসাহে তাঁর কিছু এসে যায় না।"

শেষাচারী আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে বুঝলে যে কমলাবাই এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে, পাঁচ জনের মাঝে গিয়ে আনন্দ পায়, আর প্রণয়ীর কণ্ঠাশ্লিষ্টও নয়, মুখাপেক্ষীও নয়। এই ভেবে বললে, "কৃষ্ণরাও, তোকে আমি নিতে এসেছি। গোখলে জেলে গেছে। কোথায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে এই কাণ্ড বাধিয়েছে। ছোকরার আজও সভার মাঝে চীৎকার করার মোহ গেল না।"

কৃষ্ণরাও বললে, "শেষাচারী, আমি ত গোখলেকে একবার বলেই ছিলাম যে আমি একলা যাব না, যদি যাই কমলাকে নিয়ে যাব।"

"আমার আপত্তি নেই ভাই। কিন্তু কমলাবেন কি যেতে চাইবেন? তাঁকেও ত কতকটা গোখলের রোগে ধরেছে দেখছি। আমাদের কি কাজ তা ত জিজ্ঞাসা করলি না কৃষ্ণাজী?"

"তোর সঙ্গে কি আমার সেই সম্বন্ধ, শেষাচারী? জিজ্ঞাসা করার দরকার আমার কিছুই নেই। তবে যাওয়া না যাওয়া সবই নির্ভর করছে কমলার উপর। তাকে ফেলে আমি কিছুতেই যাব না।"

"সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তোর করসনদাস মূলজী কোম্পানীর যথেষ্ট আয়। কমলার অর্থকষ্ট কিছুই হবে না। সে একটা নিজের কাজ ঠিক ক'রে নিয়েছে আর তোর মুখাপেক্ষী নেই। তোর তবে কিসের বন্ধন ?"

কৃষ্ণাজী বুকে হাত দিয়ে বললে, "ভাই, বন্ধন এইখানে। সে বন্ধন ছেঁড়া বড় কঠিন কাজ। কমলা নিজেও পারবে কি না সন্দেহ।"

ঠিক এই সময় কমলা ফিরে এল। শেষাচারীকে অপ্রসন্নমুখে একটা নমস্কার ক'রে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে, "আমি কি পারব না করসনভাই ?"

"শেষাচারীকে বলছিলাম যে তোমার আর আমার মাঝে যে পবিত্র বন্ধন তা কেউ ছিঁড়তে পারবে না। তুমিও নয়, কমলা।"

কমলা শেষাচারীকে একটু রূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "এ কথা উঠল কেন ? আপনি কি আপনার বন্ধুকে আবার নিতে এসেছেন ? এখনও, এই শান্তির মহোৎসবের দিনেও, আপনাদের চিন্তার ধারা বদলায় নেই ?" খুব সহজ গলায় কৃষ্ণাজীকে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি যেতে চান, রাও সাহেব ?"

"না আমি দোকান ফেলে কোথায় যাব ?"

শেষাচারী উঠল। বিদায় নেবার সময় কৃষ্ণরাওকে ব'লে গেল, "ধন্য তোর ভালবাসা, বন্ধু। কিন্তু আমার কাজ আমি কি ক'রে ছাড়ব ? আবার আসব তোকে ডাক দিতে।"

সস্ত্রীক করসনদাস শেঠের জীবন পূর্ব্ববৎ চলল।

* * *

আরও কিছুদিন কেটে গেল। কমলার বাহিরের কাজ কর্ম্ম এখন অনেক বেড়ে গেছে। কোনও রকমে দোকানের হিসেবটা রাখে। তা নইলে ব্যবসায়ের সব বোঝা করসনদাসের মাথায়। তার বেশীর ভাগ সময় দোকানেই কাটে। কেনা বেচার কাজ খুব রপ্ত হয়েছে। তবে সত্যি দোকানদার সে হতে পারে নেই। সে দিকে সিদ্ধিলাভের জন্য অহোরাত্র যে নফা নোকসানের ধ্যান দরকার সেটা সে কিছুতেই করতে পারছে না। তার চোখে দোকান মানে কমলার দোকান।

করসন দুপুরবেলা বাড়ী আসে। নেয়ে খেয়ে দুদণ্ড খবরের কাগজ প'ড়ে আবার তিনটে বাজতে না বাজতে দোকানে চলে যায়। সন্ধ্যাবেলা দোকানে বন্ধুবান্ধব আসে, তাদের সঙ্গে পাঁচ রকম কথাবার্ত্তা হয়। বৈঠক সেই পুরানো আপিস ঘরেই। তফাৎ শুধু এই যে অধিকাংশ দিন কমলা উপস্থিত থাকে না। কখনও বা এসেই আবার "এই যে আপনারা এসেছেন। বসুন। আমি একটু ঘুরে আসছি" ব'লে বেরিয়ে যায়। কখনও বা মোটেই আসেনা। আটটা রাত্রে শ্রান্ত হয়ে করসন বাড়ী ফেরে। শরীরের শ্রান্তির চেয়ে মনের শ্রান্তি অনেক বেশী। খাওয়া দাওয়ার পর একটু পড়াশুনো করে। এক আধ দিন আগের মত স্বামী স্ত্রীতে একসঙ্গে কোন ভাল বই পড়ে। তবে সেটা ক্রমশঃ কমে আসছে। একত্র দুজনে ব'সে কথাবার্ত্তা কওয়া তাও বড় একটা হয়ে ওঠে না। জীবনের এই সন্ধিস্থলে তাদের দুই একটী ছেলে পিলে থাকলে বড় ভাল হত। দুজনের মধ্যে বন্ধনটা আলগা হতে পেত না।

কৃষ্ণাজীর রভসে প্রেমালাপের সাধ আজও মেটে নেই। সে এখনও চেষ্টার ক্রুটী করে না আলাপ জমাবার, তবে কমলার

কাছে বড় একটা আমল পায় না। কমলা এই নিয়ে কখন কখন একটু ঠাট্টা বিদ্রূপও করতে যায়, কিন্তু স্বামীর বিমর্ষ গম্ভীর মুখ দেখে ভয়ে বেশী কিছু বলতে পারে না।

একদিন এক তারের খবর এল শেষাচারীর কাছ থেকে, "বলবন্তরাও সাহেবের কঠিন অসুখ একবার ছেলেকে দেখতে চান।" কমলা তারটা হাতে ক'রে দোকানে স্বামীর কাছে গেল, বললে, "করসনভাই, তুমি আজই চ'লে যাও।"

কৃষ্ণাজী কমলার মুখের দিকে একটু হাঁ ক'রে চেয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বললে, "একলা যাব? তুই একবার যাবি না?"

কমলা ওজর দেখাতে আরম্ভ করলে, "আমি কি ক'রে যাই বল, দোকানপাট দেখতে হবে ত? তা ছাড়া অনেকগুলো বাইরের কাজ হাতে রয়েছে। তোমার ফিরতে বড় জোর সাতদিন। বড় রাও সাহেব ঝাঁ ক'রে সেরে উঠবেন। তুমি ভেবো না।"

কৃষ্ণাজীর মনে পড়ল, তার আগের বছর দুজনে দশ দিনের জন্য উটী পাহাড়ে বেড়াতে গেছল, চেট্টি মহাশয়ের হাতে দোকানের সব ভার দিয়ে। বুঝলে কমলা যেতে চায় না। একটু চুপ ক'রে থেকে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উত্তর দিলে, "আচ্ছা কমলা, তাই হোক্, একলাই যাই। তুই সাবধানে থাকিস্।"

সেই দিনই চ'লে গেল। রেলগাড়ীতে দীর্ঘপথ যে তার কি ক'রে কাটল, তা বর্ণনা করা কঠিন। "বাবাকে দেখতে পাব কি না! কমলা কেমন ক'রে একলা থাকবে?" এসব মামুলী ভাবনা ত আছেই। তার উপর একটা কথা বার বার ঘুরে ফিরে নানারকমে মনের ভেতর আসছে, "আমার জীবনে আবার একটা ভীষণ পরিবর্ত্তন

আসছে। কি কপালে আছে কে জানে? এত কষ্টে গড়া সংসার বুঝি ভেঙ্গে যায়।"

খানিক পরে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, "কমলার এখন আমাকে না হ'লেও চলে।"

চলে বই কি কৃষ্ণরাও, এতদিন বুঝতে পার নেই এই আশ্চর্য্য।

কোলহাপুরে ট্রেণ পৌঁছলে এক ঘোড়া সংগ্রহ ক'রে বেরিয়ে পড়ল। জিনিসপত্র এক গাড়োয়ানের জিম্মা ক'রে দিলে পরে আসবে। সেই পুরানো রাস্তা। চারিদিকে পাহাড়ের পর পাহাড়। রাস্তা এঁকে বেঁকে উঠেছে, নেমেছে, ঘুরেছে, ফিরেছে, যেন কোথাও তার শেষ নেই। দূরে সেই পরিচিত পন্‌হালা কেল্লা। যেন মরাঠা জীবনের, মরাঠা সাম্রাজ্যের মূর্ত্তিমান প্রতীক। কঠিন, কর্কশ, কৃষ্ণবর্ণ, রস কসের চিহ্নমাত্র নেই। কৃষ্ণরাও, এই ত তোমার স্বাভাবিক আবেষ্টন। এ ছেড়ে কোথায় গিয়ে পড়েছ, ফিরে এস, ফিরে এস। ঘোড়া চলেছে, কিন্তু সওয়ার যেন স্বপ্নাবিষ্ট! সূর্য্য অস্ত যায় যায়। হঠাৎ সামনে দেখলে এক কেল্লা। এ কি? এরই মধ্যে পঁচিশ কোশ পথ এসে পড়েছি? এই ত আমার বিজয়গড়। গোধূলি রাগে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। কেল্লার সিংহদরজায় সাহেব-বেশী ভদ্রলোক পৌঁছবামাত্র লোকজন দৌড়ে এল। অল্পক্ষণের মধ্যেই "ছোট রাও সাহেব", "ছোট রাও সাহেব", রব উঠল। কৃষ্ণরাও লাফিয়ে নেমে "রাও সাহেব" কথাটা বলবামাত্র এক বয়স্থ ব্রাহ্মণ তাকে হাতে ধ'রে ভেতরে নিয়ে গেল। বৃদ্ধ বলবন্তরাও চারপাইয়ে

প'ড়ে আছেন। একজন স্ত্রীলোক তাঁর পদসেবা করছে, দেখে চিনলে জানকীবাই ; যে তাকে মানুষ করেছিল। কৃষ্ণাজী দুজনেরই পায়ের ধুলো নিয়ে ভুঁইয়ে ব'সে পড়ল। ঝরঝর ক'রে তার দুচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। বলবন্তরাওয়ের মুখেও এতক্ষণ কথা সরে নেই। এখন ধীরে ধীরে টলতে টলতে চারপাই থেকে উঠে এসে ছেলেকে তুলে বুকে চেপে ধরলেন।

"আর আমার দুঃখ নেই, বাপ। এইবার আমি মরতে পারব। জানকীবাই, তলোয়ার।"

জানকী প্রকাণ্ড এক সেকেলে তলোয়ার দেওয়াল থেকে পেড়ে আনলে। বলবন্ত নিজের হাতে ছেলের কোমরে সেই তলোয়ার বেঁধে দিয়ে হুঙ্কার ক'রে বললেন, "হর, হর, মহাদেও।" বিংশ শতাব্দীর পুত্র, বি এ পাস করা, ইংরেজী কাপড় পরা, করসনদাস কোম্পানীর মালিক আর সব ভুলে গেল। দুই হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বাপের সঙ্গে ব'লে উঠল, "হর, হর, মহাদেও।" ব্রাহ্মণ রামশাস্ত্রী দোরের কাছে সজল চোখে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনিও প্রতিধ্বনি তুললেন, "হর, হর মহাদেও।" বলবন্তরাও হেসে বললেন, "এইবার আমার ছুটী।" ব'লে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। একদণ্ড পরে জানকীর কান্নার রোল উঠল। কৃষ্ণরাও বাইরে রোয়াকে এসে বসল। তার প্রায় হোঁস নেই। রামশাস্ত্রীর পেছনে চাকররা সারবন্দি হ'য়ে এসে একে একে নিঃশব্দে নমস্কার ক'রে গেল।

ভোরবেলায় কৃষ্ণরাও মশান থেকে ফিরে এল। আনমনা হয়ে ধীরে ধীরে কেল্লার উপর, নীচে, ঘরে ঘরে, ঘুরে বেড়াতে লাগল। বাল্যগুরু রামরাও সঙ্গে সঙ্গে। দুজনেই নির্ব্বাক। খানিক পরে

জানকীবাই এসে ছেলেকে ভেতরে নিয়ে গেল, একরকম জোর জবরদস্তি করেই খাওয়ালে দাওয়ালে। একটু সুস্থির হ'লে খুব শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় ছিলি বাবা এতদিন ?" কোন রকম অনুযোগ করলে না।

"ধাইমা, আমি মাদ্রাজে থাকি। সেখানে মস্ত কারবার ফেঁদেছি।"

"আবার সেখানে যেতে হবে বাবা ? শাস্ত্রী মহাশয় বলছিলেন, আর তোর কেল্লা ছেড়ে থাকা হবে না।"

"যেতে হবে বই কি, ধাইমা। সেখানে কি ক'রে চলবে ? এখানকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েই যাব।"

"আমার কি ব্যবস্থা করবি বাবা ? আমায় নিয়ে যাবি না ?"

"তুমিই ত এখানের ঘরদোর সব দেখবে, নইলে যে সব যাবে। বুড়ো মানুষ সে বিদেশে থাকতে পারবে কেন ?"

রামশাস্ত্রীও অনেক বোঝালেন। কিন্তু কৃষ্ণরাও হেসে বললে, "শাস্ত্রী মহাশয়, আপনি জায়গীরটুকু দেখবেন। ধাইমা ঘরকন্না দেখবেন। বিজয়গড় সম্বন্ধে আমার কোন ভাবনা নেই। কিন্তু মাদ্রাজের কারবার নিজে না দেখলে সব পায়মাল হয়ে যাবে।"

দুদিন বাদ শেষাচারী টেলিগ্রাম পেয়ে এসে উপস্থিত হ'ল। তার কাছে কৃষ্ণাজী আগের কথা সব শুনলে। কমলা উদ্ধারের সেই মহারাজ বিজয়গড়ে তার সন্ধান দুবার করেছিলেন। বলবন্ত-রাওকে ব'লে পাঠিয়েছিলেন যে কৃষ্ণাজীর আর পড়াশুনো ক'রে কি হবে, তাঁর ষ্টেটে ভাল চাকরী দেবেন। রামশাস্ত্রী অনেক খোঁজ করলেন, কিন্তু ছেলের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না, বলবন্ত-

রাও ভয়ানক চ'টে গেলেন। কমলার কথা কিন্তু কিছু শোনেন নেই। যুদ্ধে যাওয়ার আগে শেষাচারীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ায়, ছেলের কথা অনেক জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু শেষাচারী কোন খবরই দেয় নেই। তখন তাঁর রাগ অনেকটা প'ড়ে এসেছে। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বৃদ্ধ ধীরে ধীরে শয্যা নিয়েছিলেন। শেষাচারীকে হাইকোর্টের ঠিকানায় মাঝে মাঝে পত্র লিখতেন, "কৃষ্ণাজীর কিছু খবর পেলে জানিও।" শেষ যখন রোগ বড় কঠিন হয়ে উঠল, রামশাস্ত্রী খবর দিয়েছিলেন। সেই খবর পেয়ে শেষাচারী মাদ্রাজে টেলিগ্রাম করেন।

কথাবার্ত্তার পর বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে, "কৃষ্ণাজী, এখন করবি কি?"

কৃষ্ণাজী বললে, "মাদ্রাজ ফিরে যাব।" শেষাচারী একটু বিরক্ত হয়ে বললে, "যাওয়ার দরকার আছে কি?"

কৃষ্ণাজী একখানা টেলিগ্রাম তার সামনে ফেলে দিলে। তাতে লেখা ছিল, "মনে জোর কর। কবে ফিরে আসছ?" বললে, "এই দেখ। আর, টেলিগ্রাম না এলেও কি আমি থাকতে পারতাম, শেষাচারী?"

"আশ্চর্য্য তোর মোহ, বন্ধু! আমাদেরও যে তোকে দরকার। একদিন আশা দিয়েছিলি আমাকে। সব ভুলে গেলি?"

"সে কৃষ্ণরাও ম'রে গেছে মনে কর, শেষাচারী, আজ আছে শুধু কমলার করসনদাস।"

"বিজয়গড়ের কৃষ্ণরাও পওয়ার আছে, না সেও গেছে? এই কেল্লার মাঝে ব'সে আমার কথার জবাব দে।"

"সেও সেদিন বাপের চিতায় ছাই হয়ে গেলেই ভাল হত!

এখন হয়ত তিলে তিলে তার অন্তরটা ছাই হয়ে যাবে। ভবিতব্য কে খণ্ডাতে পারে ?”

“কৃষ্ণাজী, ভবিতব্য খণ্ডাব বলেই আমরা কোমর বেঁধেছি। এই সহ্যাদ্রির উপর একটা কেল্লাও আমাদের তাবে থাকলে মস্ত লাভ।”

“কেল্লা আর কি হবে, বন্ধু ? দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধী এসে সব উলটে দিয়েছে। তার কথা মত প'ড়ে প'ড়ে মার খেতে আমি মরাঠার ছেলে কোনদিনই পারব না। আবার মাদ্রাজে সকলের মুখেই ত শুনেছি যে আর দুনিয়ায় যুদ্ধ বিগ্রহ হবে না। স্বাধীন ভারতের গোড়াপত্তন সরকার নিজেই ক'রে দিচ্ছেন। তবে আর আমায় টানাটানি কেন করিস্, শেষাচারী ? ফিরে যেতে দে আমার সেই একঘেঁয়ে জীবনের মাঝে।”

“বেশ, তাই এখন যা। বিজয়গড়ের বন্দোবস্ত কি রকম হবে ? দরকার হয় ত, আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যেতে পারি, যতদিন না আমার ডাক পড়ে। যখন ডাক পড়বে, তখন শেষাচারীর শেষ বিদায়ের চিঠি পাবি।”

“রামশাস্ত্রী ত রইলেন। আগের মত তিনি জায়গীর দেখা শুনো করবেন। জানকীবাইয়ের উপর ঘরদোরের ভার দিয়েছি। লোকজন যেমন ছিল থাকবে।”

“সেই ভাল। তুই মাদ্রাজ যা। দরকার হ'লে আমায় ডেকে পাঠাস্। সম্ভব হলেই আসব।”

শেষাচারী ফিরে গেল। তার চার পাঁচ দিন পরে কৃষ্ণরাও মাদ্রাজ রওয়ানা হ'ল। যাবার সময় রামরাও হাত ধ'রে বললেন, “বেশী দিন ভুলে থেকোনা বাবা। আমরা পথ চেয়ে থাকব।”

কৃষ্ণাজী প্রণাম ক'রে ঘোড়ায় চড়ল, আর বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে গেল

কমলা মাদ্রাজ ষ্টেশনে এসে স্বামীকে বাড়ী নিয়ে গেল। প্রায় এক মাস সে দিবারাত্র স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই রইল। তার একমাত্র কাজ হ'ল কথায় বার্ত্তায়, গানে, হাসিতে, কৃষ্ণাজীর মনস্তুষ্টি সাধন।

স্বামী ভাবলে, "এই ত আমার সেই কমলা। কি ছাই সব ভাবছিলাম আমি?"

কিন্তু, হায়, স্বপনকে কি বেঁধে রাখা যায়? ক্রমশঃ স্বপন ভাঙ্গল। ধীরে ধীরে আবার সেই বাস্তব জীবন এসে সামনে দাঁড়াল। তার দোকানপাট আর কমলার সভাসমিতি। সভা-সমিতি বেশ জমল, কিন্তু দোকানদারী এবার কৃষ্ণাজীর মাথার উপর একমণ বোঝার মত মনে হতে লাগল। তার প্রাণের মাঝখান দিয়ে সহ্যাদ্রির যে খোলা হাওয়া কদিন বয়ে গেছে, সেই হাওয়ার জন্য সে যেন হাঁপাতে লাগল।

একদিন হঠাৎ স্ত্রীকে বললে, "কমলা, আমি ত আর পেরে উঠছি না।"

"কি পেরে উঠছ না? শেষাচারীর জন্য মন কেমন করছে?"

"না, কমলা, তা নয়। শেষাচারীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ত ঘুচিয়েছি। কিন্তু আমার এখানে একটুও ভাল লাগছে না। চল, বিজড়গড়ে যাওয়া যাক্। দুজনে শান্তিতে জীবন কাটাব।"

"বিজয়গড়ে, সেই পাড়াগেঁয়ে? সেখানে দিন কাটবে কি ক'রে? হাঁপিয়ে মরে যাব যে। এ সব দোকান কারবার কে দেখবে? আমার কাজকর্ম্মগুলোরই বা কি হবে?"

"কাজকর্ম্ম সেখানে ঢের আছে। যথার্থ কাজের জায়গাই ত সেখানে। নিজেদের গ্রাম আছে, কাছাকাছি অন্য কত গ্রাম আছে। দুজনে মিলে, গরীব চাষীদের লেখাপড়া শেখাব, ঔষধপত্র দেব, চাষবাসের উন্নতি করব।"

কমলা নাক সিঁটকে বললে, "সে আমি কিছুতেই পারব না। পাড়াগেঁয়ে লোকেদের মত অকৃতজ্ঞ কেউ নেই। ওদের যতই দেবে, ততই চাইবে। একবার স্বীকার করবে না যে আমরা ওদের জন্য কত স্বার্থত্যাগ করেছি।"

"ওরা ওরা কাদের বলছিস্, কমলা? তুইও পাড়াগেঁয়ে, আমিও তাই। দুবছর শহরে আছি ব'লে কি আমরা একটা আলাদা জাত হয়েছি?"

"তোমার ইচ্ছা হয় তুমি যাও না। আমার কার্য্যক্ষেত্র এইখানে।"

করণেনের ধৈর্য্যের পুঁজি ফুরিয়ে এসেছিল, মেজাজও ভাল ছিল না, কর্কশ স্বরে বললে, "কায্যটা কি? সাজগোজ ক'রে বিজলীর পাখার নীচে ব'সে চা খাওয়া, নইলে লম্বা লম্বা বচন ঝাড়া।"

কমলা উত্তর দিলে, "দোকান ক'রে লোকের গাঁটকাটার চেয়ে সে অনেক ভাল।"

কৃষ্ণাজী অনেক কথাই বলতে পারত, কিন্তু এ কথা কাটাকাটি তার অসহ্য বোধ হচ্ছিল। উঠে বেরিয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা দোকান বন্ধ ক'রে সে তার বৃদ্ধ বন্ধু চেট্টি মহাশয়ের কাছে গেল। দু চার কথা হওয়ার পরই তাঁকে বললে,

"শেঠজী, আমার পিতাঠাকুরের কাল হয়েছে, শুনেছেন ত? আমার আর এখানে থাকা কিছুতেই চলছে না। দেশের কাছাকাছি কোথাও থাকতে হবে। দোকানটার কিছু ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন কি?"

চেট্টি হেসে বললেন, "সে আর বড় কথা কি? তোমার ও দোকানে ত সোনা ফলছে। যে নেবে তারই লাভ। আমিই নিতে পারি যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে।"

"কিন্তু আপনার কাছে আমি দাম নেব কি ক'রে? ব্যাপারী হলেও এটুকু কৃতজ্ঞতা কি আমার নেই?"

"আমিই বা তোমার দোকান বিনা মূল্যে কেন নেব? তবে তোমার সঙ্গে আমার দরকষাকষি অশোভন হবে। আমিই একটা দাম ঠিক ক'রে দেব।"

"যে আজ্ঞে।" ব'লে কৃষ্ণরাও বাড়ী এল। খাওয়া দাওয়ার পর স্ত্রীকে শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে, "কমলা, লোকের গাঁটকাটা ছেড়ে দিলাম। দোকান বিক্রী ক'রে দিয়েছি।"

কমলা স্বামীর মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল, কথা কইল না। যেন ঠিক বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে। কৃষ্ণরাও আবার বললে, "দোকান করা আমার নিজেরও বড় বিশ্রী লাগে। ভালই হ'ল। কিন্তু আমি আর তাহলে এখানে কি করব, দেশে যাই। যা দু দশ বিঘে জমী আছে সেটা না দেখলে শুনলে খেতে পাওয়া দুষ্কর হবে। তোর সেখানে নিতান্তই না যেতে ইচ্ছা হয় এখানেই থাক্। আমি খরচের জন্য হাজার দশেক টাকা চেট্টি মহাশয়ের কাছে অমানৎ রেখে যাব।"

কমলা দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কৃষ্ণরাও আর একটী কথাও কইলে না। গালে হাত দিয়ে ব'সে রইল। মিনিট পাঁচেক পর কমলা উঠে তার সামনে দাঁড়াল, যেন কি বলবে। কিন্তু বলতে পারলে না। ভুঁইয়ে লুটিয়ে পড়ল দু হাতে স্বামীর পা ধ'রে। তবুও কৃষ্ণরাও নির্ব্বাক্। সেই রকমই গালে হাত দিয়ে ব'সে আছে। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। কমলা একবার মুখ তুলে দেখে, যেন আরও ভয় পেলে। স্বামীর পায়ের উপর মুখ রেখে কেঁদে উঠল।

"একদিনও ত আমার উপর রাগ কর নেই। আজই প্রথম। আজই কি শেষ, রাও সাহেব? যেদিন পথের ধার থেকে আমায় তুলে নিয়েছিলে, সেদিন বলেছিলাম, আমায় মেরে ফেলে দিয়ে তুমি যাও। আজ আবার বলছি, পায়ে ধ'রে বলছি, আমায় এইখানে মেরে রেখে তুমি যাও। আমার আর কেউ নেই, কিছু নেই। তোমার হাতে এতদিন আদর পেয়েছি, তোমারই হাতে আজ মরণ চাচ্ছি। পথের ধূলোয় আবার আমায় ফেলে দিয়ে যেও না।"

ভাঙ্গা গলায়, থেমে থেমে, এই কথা বলতে বলতে কমলা হাঁপিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কৃষ্ণরাওয়ের দুচোখ তখন জলে ভেসে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি নেমে ব'সে কমলার মাথা কোলে তুলে নিলে, আর কত অর্থহীন সোহাগের কথাই তার কানে কানে কইতে লাগল। কমলা চোখ বুজে অনেকক্ষণ ধ'রে সেই সব আদরের ডাক শুনলে। শুনে আবার তার ভরসা প্রাণে ফিরে এল, দুহাতে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে,

"কবে বিজয়গড় যাবে বল। আমি আর একদণ্ডও এখানে থাকতে চাই না। আমায় একলা ফেলে আর কখনও কোথাও তোমায় যেতে দেব না।"

"না, আর কোনদিন যেতে চাইব না, কমলা।"

পবিত্র চোখের জলে এই শপথ পাকা হয়ে গেল। এত বছর মাদ্রাজে থেকে দুজনেরই অনেক বন্ধুবান্ধব হয়েছিল। কারও সঙ্গে দেখা ক'রে বিদায় নিলে না। চুপি চুপি স্বামী স্ত্রীতে পালিয়ে গেল। চেট্টি মহাশয় ছাড়া কেউ জানলে না।

* * * *

বিজয়গড়ে তার ক'রে খবর দেওয়া হয়েছিল। কোলহাপুর ষ্টেশনে একজন তলোয়ার বাঁধা সেপাই হাজির ছিল। সে লম্বা সেলাম ক'রে রাও সাহেব ও বাইসাহেবের সম্বর্দ্ধনা করলে। কৃষ্ণরাওয়ের আজ বেশভূষা সরদার জনোচিত। চুড়ীদার পায়জামা, মলমলের চাপকান, তার আস্তিন গিলে করা, মাথায় ত্রিকোণ মরাঠা পাগড়ী, হাতে সোনা বাঁধান ছড়ি। কমলাও সাজ বদলেছে। সেকেলে ভারী নীলাম্বরী সাড়ী আর জরীর কাঁচুলী পরা, তার উপর দামী বেনারসী শেলা (চাদর) জড়ান। কপালে উজ্জ্বল লাল টিপ। মরাঠা সরদারনীদের মত মাথায় কাপড়। কে বলবে, এরা শেঠ করসনদাস আর তার শেঠানী? ষ্টেশনে সবাই সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিচ্ছিল। সেপাই দুজনকে মোটারে বসিয়ে দিয়ে মালপত্রের সন্ধানে গেল। কলির পুষ্পকরথ বায়ুবেগে ছুটল।

আজ স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই মন আনন্দে ভরপূর। যৌবনের অদম্য উৎসাহ নিয়ে দুজনে নূতন সংসার পাততে চলেছে। পথে

কত কল্পনা জল্পনা হচ্ছিল। মনে একটুও দ্বিধা সঙ্কোচ নেই, মাদ্রাজের সভ্য সংস্কৃত জীবন ছেড়ে এসেছে ব'লে একটুও আপশোশ নেই। দেখতে দেখতে দীর্ঘপথ কেটে গেল। কেল্লার সিংহদরজায় তোরণ ও মঙ্গলঘট, নহবৎখানায় নহবৎ, ভেতরবাড়ী পর্য্যন্ত আলপনা, বৃদ্ধ কারভারী সাহেব কিছুরই ত্রুটী করেন নেই। জানকীবাই বরণ ক'রে বৌকে ঘরে তুললেন।

এ পর্য্যন্ত ত সব ঠিক। এখন পাঠককে বোঝাতে হবে যে এরা দুজনে কেন নিজেদের এই মধ্যযুগের আবেষ্টনের মাঝে খাপ খাওয়াতে পারলে না, আবার পথে বেরিয়ে পড়ল। কৃষ্ণরাওয়ের কথা প্রথমেই বলেছি যে তার ইস্কুল ও কলেজ জীবনের শিক্ষা দীক্ষা সবই অন্য রকমের। একদিকে নিজের বিলেত গিয়ে জঙ্গী অফিসার হওয়ার স্বপ্ন, অন্যদিকে তাকে অতি আধুনিক রাষ্ট্রনীতির মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে দলভুক্ত করার চেষ্টা শেষাচারী প্রমুখ বন্ধুদের। শেষাচারীর রাষ্ট্রনীতি হয়ত কৃষ্ণরাও কোন দিন পুরোপুরি নেয় নেই। কিন্তু সমাজনীতি সম্বন্ধে দুজনের কোন মতভেদই ছিল না। এই সব নানা টানের মধ্যে পড়ে কৃষ্ণরাওয়ের মনে এতটুকু জায়গা ছিল না, যেখানে আভিজাত্যের গর্ব্ব, বিজয়গড়ের কিল্লেদারের দায়ীত্ব এক মূহুর্ত্তও দাঁড়াতে পারে। তবু শরীরে প্রমার রাজপুত ও পওয়ার মরাঠার রক্ত, চেষ্টা করলে হয়ত কোন রকমে চালিয়ে নিতে পারত। কিন্তু কমলা, তার ত প্রথম গলদ সামান্য পাড়াগেঁয়ে বেনের ঘরে জন্ম ও ষোল বছর সেই বেনের ঘরের শিক্ষা। তারপর এই কবছরের অতি আধুনিক শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের সামাজিক জীবন। পাড়াগাঁয়ের যা কিছু জানত তা একরকম ভুলে গেছে। গরীব বাপের বাড়ীর যেটুকু মনে আছে

তাও সে মনে রাখতে চায় না। তবু সেও বিজয়গড়ে এসেছে চেষ্টা ক'রে থাকবে ব'লে। যদি এদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকত, যে স্বার্থত্যাগ ক'রে দরিদ্র চাষীর সেবা করবে, তাহলে হয়ত বিজয়-গড়কে নূতন ক'রে একটা আশ্রমের মত গ'ড়ে নিতে পারত। কিন্তু তা ত আর সত্যি এদের মনে ছিল না। কমলা এসেছে স্বামীর মন রাখার জন্য। কৃষ্ণাজী এসেছে স্ত্রীকে অহোরাত্র কাছে পাওয়ার জন্য। অবস্থা ঠিক এই রকম।

দুদিন না যেতে যেতেই জানকীবাই এসে কৃষ্ণাজীকে বললে, "বাবা, এ বৌ কোথা থেকে নিয়ে এলি? এ ত গুজরাতীর মেয়ে, ভাল ক'রে আমাদের কথাই কইতে পারে না।"

কৃষ্ণাজী একটু থতমত খেয়ে গেল, বললে, "ধাইমা, ও গুজরাতে মানুষ হয়েছিল, ছেলে বেলায় গুজরাতী ইস্কুলে পড়তে যেত কি না, তাই কথাবার্ত্তা একটু এড়ো মতন।"

"না বাবা, শুধু কথাবার্ত্তা নয়, ধরণ ধারণও যেন কেমন কেমন।"

"ও দুদিনে ঠিক হয়ে যাবে, ধাইমা, তুমি সব শিখিয়ে পড়িয়ে নিও।"

কৃষ্ণাজী স্ত্রীকে সাবধান ক'রে দিলে। সে কিন্তু একটু বিরক্ত হ'ল। ভাবলে, যে সারাজীবন লুকোচুরী করা বড় জ্বালা। স্বামীর কাছেই কমল এই নিতান্ত একেলে শিক্ষা পেয়েছে যে সোজা কথা বলবে, তা কারও ভাল লাগুক আর না লাগুক। মনে স্থির করলে, "একটু দূরে দূরে থাকব।"

এতে কিন্তু হিতে বিপরীত হ'ল। জানকীবাই ত আর সত্যি ঝি নয়। মা মরার পর সেই কৃষ্ণরাওকে বুকে ক'রে মানুষ করেছিল। তার পর বরাবর বলবন্তরাওয়ের সংসারে গিন্নীপনা ক'রে

এসেছে। সে কমলার অবজ্ঞা সহ্য করবে কেন? যখন কমলা পড়াশুনো সেলাই নিয়ে বেশী সময় কাটাতে লাগল তখন জানকী আরও চ'টে গেল।

হপ্তাখানেক পর একদিন কৃষ্ণরাও কমলাকে বললে, "চল্, গ্রামে বেড়িয়ে আসা যাক্। কিরকম ভাবে এখানে কাজ আরম্ভ করা ভাল, তা দুজনে দেখলে বুঝতে পারব।"

কমলা ঔষধের বাক্স নিয়ে স্বামীর সঙ্গে গ্রামে গেল। গাঁয়ের লোক জায়গীরদার সাহেবকে খুব আদর অভ্যর্থনা করলে, কিন্তু কমলা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখালে না। এমন কি তার দেওয়া ঔষধও কেউ বড় একটা নেবার জন্য গা করলে না। ফিরে আসবামাত্র জানকীবাই কাছে এসে স্বামীর সাক্ষাতেই কমলাকে খুব রূঢ় ভাবে ব'লে "উঠল, বৌমা, তুমি না মরাঠার মেয়ে, বলবন্তরাও পওয়ারের পুত্রবধূ, কোন সাহসে তুমি খৃষ্টানীর মত গাঁয়ে গাঁয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াও! শ্বশুরবাড়ীর মান ইজ্জতের দিকে তোমার কি একটুও ভ্রূক্ষেপ নেই?"

হঠাৎ এই আক্রমণে কৃষ্ণরাও একটু থতমত খেয়ে গেল, বেশী কিছু বলতে পারলে না। আমতা আমতা ক'রে এইটুকু মাত্র জানালে যে দোষ তারই, কমলার নয়। জানকীবাই চ'লে গেল, কিছু বললে না। দিন দুই পরে কমলা দেখলে যে তার খাবার ঠাঁই বারান্দায় আলাদা করা হয়েছে। ধাইমা খুব যত্ন ক'রে পরিবেশন করে, কিন্তু একসঙ্গে আর খেতে বসে না। কমলা কথাটা কৃষ্ণরাওকে জানালে। একটু টিপ্পনীও কাটতে ছাড়লে না,

"খুব আদর ক'রে যে কেল্লায় বৌ নিয়ে এসেছিলে রাও সাহেব!"

কৃষ্ণাজী বললে, "মনে আছে, কমলা, একদিন আর্য্যসমাজের ইস্কুলে যাওয়ার নামে কি রকম ফোঁস ক'রে উঠেছিলি? খৃষ্টান হয়ে যাবি এই ভয় তোর বড় হয়েছিল সেদিন। হিঁদুয়ানি কি তা দেখছিস্ ত'? বর্ণাশ্রমের যথার্থ বাহার পাড়াগাঁয়ে না এলে দেখতে পাওয়া যায় না। এখন কি করব্‌ বল্।" কমলা কিছু জবাব দিলেনা।

মাদ্রাজ ছাড়বার আগে দুজনে ঠিক করেছিল যে বিজয়গড়ে গিয়ে কমলা ঘোড়ায় চড়তে শিখবে, তারপর দুজনে ঘোড়ায় চড়ে একসঙ্গে সহ্যাদ্রির চূড়ায় চূড়ায়, খোরীতে খোরীতে, বনে বনে, ঘুরে বেড়াবে। জানকীবাইয়ের ভয়ে সেটা আজও হয়ে ওঠে নেই। দুই একবার কৃষ্ণাজী কথাটা উত্থাপন করাতে কমলা বলেছিল, "কাজ নেই ধাইমাকে আরও বেশী চটিয়ে।"

একদিন এঁদের দূর কুটুম্ব দুটি মহিলা গড়ে বেড়াতে এলেন। এসে অনেকক্ষণ জানকীবাইয়ের সঙ্গে গল্পস্বল্প করলেন, যাবার সময় কৃষ্ণরাওকে, "কেমন আছ, কতদিন থাকবে ইত্যাদি" ব'লে সম্ভাষণ ক'রে গেলেন কিন্তু বৌয়ের কোন খোঁজ করলেন না। কৃষ্ণরাও অত্যন্ত বিরক্ত হ'ল কিন্তু করণীয় কি ঠিক করতে পারলে না। কমলার সঙ্গে এ সব বিষয় আলোচনা করা মানে তাকে আরও বেশী কষ্ট দেওয়া। তবু এ অবজ্ঞা অপমানের মাঝে তাকে আর কতদিন রাখবে? তার মন ভোলাবার জন্য কৃষ্ণাজী তার সঙ্গে লেখাপড়া ক'রে অনেকটা সময় কাটায়। কিন্তু তাও যেন ভয়ে ভয়ে। মন যখন বড় উদাস হয়, ঘোড়ায় চ'ড়ে বন্দুক হাতে বেরিয়ে যায় শিকারের অছিলা ক'রে। কিন্তু কমলাকে একলা ফেলে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। এ রকম নিজের বাড়ীতে

চোরের মত থাকা কাঁহাতক পোষায়? হায়রান হয়ে শেষ এক টেলিগ্রাম ক'রে ডেকে পাঠালে বন্ধু শেষাচারীকে।

পরদিন শেষাচারী এসে উপস্থিত হলেন। দুই বন্ধুতে সমস্ত অবস্থাটা আলোচনা করলেন। তার পর কমলার ডাক পড়ল। সে শেষাচারীকে দেখে মহা আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কিন্তু তার খুব আহ্লাদ হ'ল।

"এই যে, আপনি কখন এলেন? কি ক'রে জানলেন যে আমরা এখানে আছি?"

শেষাচারী হাসতে হাসতে বললে, "কমলাবাই, এমন শত্রুপুরীতে পড়েছ যে শেষাচারীকেও আজ বন্ধু মনে হচ্ছে।"

"বাঃ আপনার এ কেমন কথা? আমি আপনাকে কবে বন্ধু ছাড়া অন্য কিছু মনে করেছি?"

"না কমলাবেন, আমি সত্যই তোমার বন্ধু ছিলাম না চিরদিন। কিন্তু ভয় নেই আর। আমি কৃষ্ণাজীকে নিতে আসি নেই।"

খানিকক্ষণ নানা বাজে গল্প করার পর শেষাচারী জিজ্ঞাসা করলে, "দেখ কমলাবাই, তোমার কি ইচ্ছা এখানে থাকা? থাকতে পারবে কি আর বেশী দিন? কৃষ্ণাজী বড় চিন্তিত হয়ে আমায় ডেকে পাঠিয়েছে।"

"না, আমি বোধ হয় আর বেশী দিন টিকতে পারব না এখানে। থেকে কি হবে? যা আমরা ভেবেছিলাম তা ত হ'ল না। আমি সরদারের ঘরের বৌ হওয়ার উপযুক্ত নই বোধ হয়।"

কৃষ্ণাজী বললে, "কিন্তু, শেষাচারী, যাব কোথায়? মাদ্রাজের পাট ত একেবারে তুলে দিয়ে এসেছি।"

"দেখ্ কৃষ্ণাজী, দেশের অবস্থা বড় সঙ্গীন হয়েছে। পঞ্জাবে ভীষণ গোলমাল হয়ে গেছে। অনেক লোক মরেছে গুলিতে। গান্ধী ক্রমশঃ সমস্ত জিনিসটা গুছিয়ে নিয়ে আসছেন নিজের হাতে। তাঁর হাতে পড়লে সত্যাগ্রহ, অর্থাৎ প'ড়ে প'ড়ে মার খাওয়া।"

কমলা বললে, "আপনারা যে জিনিস বুঝবেন না তাকেই ঠাট্টা। গান্ধীজীর লেখা আমিও সমস্তই পড়ি। তিনি কি লোককে কাপুরুষ হতে বলছেন। স্বদেশের জন্য, স্বধর্ম্মের জন্য দাঁড়িয়ে মার খেতে পারা যে মস্ত বীরত্ব।"

শেষাচারী হো হো ক'রে হেসে উঠল, "দাঁড়িয়ে মার খেতে শেখার জন্য বিজয়গড় খুব ভাল জায়গা। তোমরা তুজনেই ত সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছ।"

কমলা বললে, "সে কি আমি জানিনা? তবু রাও সাহেব এখানে থাকেন ত আমিও সব সহ্য ক'রে থাকব।"

শেষাচারী উত্তর দিলে, "কিন্তু সব চেয়ে বেশী যাকে আঁতে লাগছে, সে যে আর মার বরদাস্ত করতে পারছে না, কমলাবেন।"

কৃষ্ণরাও তাড়াতাড়ি বললে, "আমার কথা ভেবোনা তোমরা। আমি একটা ব্যবস্থা ক'রে নেব।"

"ব্যবস্থা আর কি করবি ছাই? চক্ষু বুজে অত্যাচার সহ্য করবি তুজনে তুজনার মুখ চেয়ে। তার প্রশ্রয় আমি দিতে পারি না। সে আমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কলকাতা যাবি, কৃষ্ণাজী?"

"কি করব সেখানে? তোর কাজে ত আমি ইস্তফা দিয়েছি।"

"আমার কাজ তোকে করতে হবে না। সে ভাবনা তোর নেই। আপাততঃ গান্ধী আমাদের কাজ খতম ক'রে দিয়েছে। দেখাই যাক না, তার দৌড় কত দূর। না, তোকে সেজন্য বলছি না।

তুই কলকতায় গিয়ে দেখ্ না একবার, সেখানে নানা রকম লোক আছে, নানা রকম কাজ আছে। কমলাবাই হয় ত সুখে থাকবে। গোখলে জেল থেকে বেরিয়েছে। তার এক বন্ধু মস্ত ব্যাপারী কলকাতায়, তাকে সে চিঠি দেবে। কাকে সুপারিশ দিতে হবে, কৃষ্ণরাও পওয়ার, না শেঠ করসন্দাস মূলজী ?”

“কৃষ্ণরাওয়ে কাজ নেই, ঢের পওয়ার সরদারি হয়েছে। করসন শেঠই ভাল। কি বলিস্, কমলা ?”

কমলা খুব আগ্রহ ক’রে বললে, “আমার সরদারনী হওয়ার সাধ মিটেছে। আমি আবার করসনভাইয়ের শেঠানী হতে চাই, যত শীগগীর সম্ভব।”

তার পর শেষাচারী একটু বাধ বাধ ভাবে কমলাকে জিজ্ঞাসা করলে, “আর একটা কথা বলবার ছিল কমলাবেন। আর্য্যসমাজী হওয়ার কোন বাধা আছে কি ? আমার বড় সাধ তোমাদের বোম্বাইয়ে বিয়ে দিয়ে কলকাতা পাঠাই।”

কমলা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে, “শেষাচারী, করসনভাইয়ের ইচ্ছা হয় ত তাই হোক্। আমার আপত্তি একটুও নেই। তবে আমার আগ্রহও বিশেষ নেই।”

কৃষ্ণরাও বললে, “তুই রাজী হ’ কমলা। এই ক’মাস তোর দুর্দ্দশা দেখে আমার প্রাণ ঝালাপালা হয়ে গেছে। সনাতন হিন্দুভাব ত দেখলি ? আমার মনে হয় বিয়ে হ’লে তোকে আমি সব অপমান থেকে ভবিষ্যতে বাঁচাতে পারব।”

“বেশ করসনভাই, তাই তুমি ব্যবস্থা কর।”

* * * *

কয়েক মাস কেটে গেছে। বোম্বাইয়ে আর্য্যসমাজ মন্দিরে অগ্নিসাক্ষী ক'রে কমলাবাইকে পত্নী ব'লে বরণ ক'রে, করসনদাস কলকাতায় এসেছে। গোখলের বন্ধু ফড়কে তাদের অনেক যত্ন আত্তি ক'রে কিছুদিন নিজের ঘরে রেখেছিলেন। এখন আলাদা বাড়ী হয়েছে। করসনের একটী ছোট্ট দোকানও হয়েছে বড়বাজারে। কলকাতায় গুজরাতী ব্যাপারী অনেক থাকে, কমলার সঙ্গে তাদের বাড়ীর মেয়েদের খুব ভাব হয়েছে। করসন শেঠেরও খুব খাতির, বিদ্বান বুদ্ধিমান সজ্জন ব'লে। তবে সে চিরদিনই একটু গম্ভীর প্রকৃতি, কারও সঙ্গে বেশী দহরম্ বহরম্ নেই। কলকাতায় প্রথা নেই তাই কমলা দোকানে বসে না। স্বামীই সে কাজ করে। এখনও দোকান ছোট, চাকর রাখে নেই। পাসের দোকানের লোকটাকে কিছু দেয়, সে সকাল সন্ধ্যা ঘর ঝাড়েঝোড়ে।

বিজয়গড়ে স্বামী স্ত্রীতে বড় কাছাকাছি এসেছিল। মাদ্রাজের ঝগড়ার পর তাদের এই মিলন সুখ, ধারওয়াড়ের সেই প্রথম প্রেমের দিনগুলিকেও ছাড়িয়ে গেছল। স্বপনের মত সময়টা কেটে যাচ্ছিল। জানকীবাইয়ের শত্রুতাকেও কৃষ্ণরাও তেমন গ্রাহ্য করত না।

মনে করত, "দূর হোকগে, এখানে না পোষায় যেখানে হয় গিয়ে থাকব। কমলাকে এমন ক'রে প্রাণের কাছে পেয়েছি, আর আমি কিসের পরোয়া করি ?"

তাই ত সে শেষাচারীকে ডেকেছিল পরামর্শ করবার জন্য। জানকীবাইকে কাশী পাঠিয়ে দিয়ে জোর ক'রে, দরকার হয়, চোখ রাঙ্গিয়ে নিজেদের স্থান ক'রে নেবে? না বিজয়গড় যেমনকার তেমনই রেখে নিজেরা স'রে পড়বে? পরামর্শ ক'রে কি ঠিক

হ'ল তা পাঠক জানেন। রামশাস্ত্রী কমলা সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ করেছিলেন কি না কে জানে। তবে করলেও তাঁর ব্যবহারে কিছু বোঝা যেত না।

চ'লে আসবার সময় কৃষ্ণাজীকে বলেছিলেন, "দিন কয়েক দেশ বিদেশ ঘুরে এস, বাবা। কিন্তু বেশী দিন বাইরে থেকো না। বিজয়গড়ের লক্ষ্মী বিজয়গড়ে না থাকলে কি মানায়?" জানকী বেশী কিছু বলে নেই কতকটা নীরবেই বিদায় দিয়েছিল।

কলকাতায় এসে স্বামী স্ত্রীর অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। কৃষ্ণরাওকে আবার সেই সামান্য দোকানদারের মত উদয়াস্ত খাটতে হত। কমলার সঙ্গে প্রায় সারাদিন দেখা হত না। গেল কয়েক বছর কৃষ্ণরাওকে শারীরিক কষ্ট ভোগ করতে হয় নেই। তাই কষ্ট ভোগ করার অভ্যাসও চ'লে গেছে। কলকাতায় এসে গলির ভেতর ছোট্ট বাড়ীতে থাকতে তার মোটে ভাল লাগত না। কিন্তু এসবে কিছু এসে যেত না যদি কমলাকে কাছে কাছে রাখতে পারত। সেইখানেই গলদ। কমলা গুজরাতী মহলে এমনই মিশে গেছে যে তার পাত্তা পাওয়াই কঠিন। সে সারাজীবন নিজের জাতের সঙ্গে মিশতে পায় নেই। কলকাতায় এসে সেইটে পেলে। তার আনন্দ উৎসাহ দেখে কে? আর তার জাত কি যে সে জাত? কলকাতায় গুজরাতী সমাজে তখন একটা বেশ সাড়া প'ড়ে গেছে। তাদেরই গান্ধী ভারতের সর্ব্বজনবরেণ্য নেতা হয়েছেন। তাদেরই অমদাবাদ ভারতের রাষ্ট্রনীতিক কেন্দ্র হয়েছে। সারা ভারত সেই দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। চিত্তরঞ্জনের মত লোককেও নাগপুরে গিয়ে গান্ধীজীর পায়ে লুটিয়ে পড়তে হয়েছে। কাজেই কমলার বন্ধুবান্ধবের মহলে সদাই এই কথা যে ভারতের

ভবিষ্যৎ গুজরাতের উপর নির্ভর করছে। ঘরে ঘরে বাপুজীর ছবি। যারা বাহুবলের গর্ব্ব করে, তাদের প্রতি কি অসীম অবজ্ঞা এদের! কমলার এই আবহাওয়া বড় ভাল লাগত। স্বামীর কাছে কথাবার্ত্তাতেও এই ভাব লুকোতে পারত না। একদিন কৃষ্ণরাও হাসতে হাসতে বলেছিলেন,

"কমলা, এত ক'রে ইতিহাস পড়ালাম তোকে। এরই মধ্যে ইতিহাসের শিক্ষা ভুলে গেলি। আবার যদি অষ্টাদশ শতাব্দী ভারতে আসে ত' বুঝতে পারবি বাহুবলের মর্য্যাদা। তোরাও বুঝবি আর এই বাঙ্গালী বাবুরাও বুঝবে।"

এই কথাতে স্বামী স্ত্রীর প্রায় ঝগড়া হয়ে গেছল। আর একদিন কৃষ্ণরাও বললে স্ত্রীকে, "কমলা, তোর সঙ্গে আমার মতভেদ হোক তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তুই অন্য লোকের সঙ্গে জুটে সভা করতে কি মিছিল করতে বাইরে যাস্ না। আমার বড় খারাপ লাগে।"

কমলা তাতে উত্তর দিলে, "দেশের কাজ এত বড় কাজ যে লক্ষ লক্ষ লোক স্বার্থ বলি না দিলে, সিদ্ধিলাভ হতে পারে না। আর ঘরে ব'সে স্বার্থত্যাগই বা কি রকমের হবে? সবাই মার খাবে, জেলে যাবে, আর তোমার স্ত্রী পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় আমার স্ত্রী-বাড়ীতে ব'সে থাকবে। কারণ তার গায়ে কেউ হাত দিলে আমি অহিংসাপন্থীদের পর্য্যন্ত মেরে গুঁড়ো ক'রে দেব। শত্রু মিত্র বিচার করব না। বুঝলে কমলাবাই?"

কমলা ঘাড় নাড়লে, কথা কইলে না।

কৃষ্ণরাওয়ের আগের চেয়ে একটু যেন proprietary (মালিকী) ভাব হয়েছে। বিয়ে হওয়ার ফল, বোধ হয়। কেননা স্বামী

বলতে ত মালিক বোঝায়। তবে কৃষ্ণরাওয়ের প্রকৃতি ত ছোট নয়। কোন কথা নিয়ে দিবারাত্র খিটির খিটির করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। আর তার মনে কেমন একটা বিশ্বাস ছিল যে কমলা তার কথা অগ্রাহ্য করবেনা।

একদিন ফড়কে করসনের দোকানে ব'সে নানা গল্প করছে। কথায় কথায় বললে যে আগের দিন হাজরা পার্কে এক সভায় সে গেছল, কমলাবাইও সে সভায় গেছলেন তুজন গুজরাতী মহিলার সঙ্গে। ফড়কে অত কি জানে ভেতরের কথা?

সভার কথা শোনবামাত্র করসনজী কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠিক বলছ? ঠিক চিনতে পেরেছিলে?"

ফড়কে তার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলে, "নিশ্চিত চিনতে পেরেছিলাম। এই মহিলারা যাঁর সঙ্গে সভায় এলেন, দেশমিত্র ইন্দ্রজিৎ, তাঁকেও আমি খুব ভাল ক'রে চিনি। ইন্দ্রজিতের বক্তৃতা শুনে কমলাবাইয়ের কি উৎসাহ! আনন্দে অধীর হয়ে বার বার, বন্দে মাতরং, হিন্দুস্থানকী জয়, বলতে লাগলেন, আর তাঁর সঙ্গে সমস্ত সভা হুঙ্কার দিয়ে উঠতে লাগল। তার পর এল পুলিশ। সব চারিদিকে উধাও হয়ে গেল। কেবল গেলনা কমলাবাই আর ইন্দ্রজিৎভাই, দারোগা তাদের জোর ক'রে বের ক'রে দিয়ে পার্কে তালা মেরে দিলে।"

করসনজীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু কোন কথা বললে না। ফড়কে একটু পরে চ'লে গেলে সেও দোকান বন্ধ ক'রে বাড়ী গেল।

সন্ধ্যাবেলা কমলাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, "কমলাবাই, তুমি হাজরা পার্কে সভায় গেছলে? আমার কথা শোনা তুমি দরকার বোধ কর নেই?"

কমলা একটু হেসে উত্তর দিলে, "গেছলাম বই কি? কিন্তু আমি সত্যি জানতাম না, রাও সাহেব, যে কিছু পুলিশের হাঙ্গামা হবে। তোমার কি এত ঘোর আপত্তি আমার সভায় যাওয়াতে? মাদ্রাজে ত কত সভায় যেতাম। আমি ত এতে কোন দোষ দেখি না।"

"ইন্দ্রজিৎ কে?"

"ইন্দ্রজিৎভাইকে চেন না? আমাদের একজন নেতা। সমস্ত গুজরাতী মণ্ডলী একবাক্যে তাঁকে নাম দিয়েছে দেশমিত্র। বাঙ্গালীরা পর্য্যন্ত তাঁকে কত ভাল বাসে। কি আশ্চর্য্য বক্তা। একদিন চল না, রাও সাহেব, তাঁর বক্তৃতা শুনতে।"

"আমি বক্তৃতা বুঝি না। মুর্খ গোঁয়ার মরাঠা আমি। দেখ কমলা, আমরা আসছে হপ্তায় এখান থেকে চলে যাচ্ছি।"

"কোন কাজ পড়েছে বুঝি? কবে আসবে?"

"আর আসা হবে না এখানে। দুজনে এক সঙ্গে বিজয়গড়ে থাকব। এ শহরের হাওয়াতে আমার দম আটকে যাচ্ছে।"

"সেই জেলখানায় আমায় আবার পুরবে? কেন?"

"কমলা, সেই জেলখানাই মোটের উপর আমার ভাল মনে হচ্ছে।"

কমলা একটু হেসে বললে, "আচ্ছা সেই ভাল, রাও সাহেব। যেখানে ভাল লাগবে, সেইখানেই থাকবে।"

পরদিন সকাল বেলা করসনদাস নিজের দোকানে ব'সে আছে। দোকান বড় রাস্তার উপর। হঠাৎ "বন্দে মাতরং"এর রোল উঠল। তার পর লাঠির ঠকাঠক্ আওয়াজ। ব্যাপারখানা কি দেখবার জন্য করসন বাইরে গেল। দেখলে চারিদিকে লোক ছুটে পালাচ্ছে।

কয়েকজন মেয়েপুরুষ একটা নিশান ঘেরে দাঁড়িয়ে রয়েছে: পাহারাওয়ালারা তাঁদের উপর গিয়ে প'ড়ে নিশান ছিনিয়ে নিলে। কাছেই একটা কাল রঙ্গের বড় মোটর দাঁড়িয়েছিল। সেই দিকে সার্জ্জেণ্টরা পাচসাত জন মেয়ে পুরুষকে ঠেলে নিয়ে এল। পুরুষদের মধ্যে একজনের মাথা বেয়ে রক্ত পড়ছে। তাকে ধ'রে আস্তে আস্তে গাড়ীতে তুলে দিলে একটী পরমা সুন্দরী মেয়ে। করসনদাস চিনলে, সে কমলা। তৎক্ষণাৎ ফিরে দোকানে চ'লে গেল।

বড় ঘৃণা হ'ল তার। কার উপর ঘৃণা? কমলার? না, নিজের উপর ধিক্কারে প্রাণ ভ'রে উঠল। সে কি বাঁদর, যে এই মেয়েটা তাকে ক'বছর শিকল বেঁধে নাচাচ্ছে।

খানিক পরে এক সার্জ্জেণ্ট এসে তাকে লালবাজারে নিয়ে গেল, সাহেবের আপিসে। "কমলাবাই করসনদাস শেঠকী আওরৎকো বোলাও।" করসনের বুকের ভেতর যেন কে হাতুড়ী মারতে লাগল। তার পর কমলা এল। বড় সাহেবের সামনেই, স্বামীকে যেন উপহাস ক'রে বললে, "চললাম, শেঠজী। দোকান-পাট রইল, ভাল ক'রে দেখো। আমার জন্য উকীল মোক্তার নিযুক্ত ক'রে পয়সা নষ্ট ক'র না। আমি ইচ্ছা ক'রেই আইন ভেঙ্গেছি। আবার ভাঙ্গব।"

আইন ত ভেঙ্গেছ, কমলাবাই, আরও কত জিনিস ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিলে তার খবর ত রাখ না!

লালবাজার থেকে ছুটী পেয়ে করসনদাস দোকানে ফিরে গেল। খানিকক্ষণ গালে হাত দিয়ে ব'সে রইল। দুই একজন দরদ দেখাতে কাছে এল, কিন্তু তার ফ্যাকাশে মুখ, জবার মত লাল চোখ দেখে কিছু বলতে সাহস পেলে না।

আজ আর কোন দোকান খুলল না। দেশমিত্রকে মেরেছে ব'লে হরতাল। সন্ধ্যা নাগাদ করসনদাস ফড়কের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

বললে, "রাও সাহেব, বাড়ী চললাম। দোকানপাট রইল। তুমি চালাও ত চালিও। নয় ত বেচে ফেলো, নয়ত মাল বিলিয়ে দিও।"

ফড়কে করসনের উসকো খুসকো চুল, লাল চোখ দেখে, পাগলের মত কথাবার্তা শুনে, ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে,

"করসনভাই, হয়েছে কি? এ সব কি বলছ?"

"কি আর হবে? আমার দেশের জন্য মন কেমন করছে। আপনাদের ভারত মাতার জন্য নয়, আমার সেই পাড়াগেঁয়ে বাড়ীর জন্য। চললাম ফড়কে রাও সাহেব, নমস্কার।" ব'লে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন কাগজ প'ড়ে ফড়কে ব্যাপারটা কতক কতক বুঝলে। বড় বাজারে ছুটল। গিয়ে দেখে করসনের দোকান বাসা দুই তালা বন্ধ। কি আর করে, গোখলেকে সন্ধ্যাবেলা তারে খবর দিলে,

"তোমার বন্ধু করসনদাসের স্ত্রীর দুবছর জেল হয়েছে। করসন কোথায় চ'লে গেছে জানি না।"

* * * *

করসনের পাত্তা আর কোথায় পাওয়া যাবে? সে এবার ঠিক মরেছে। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলা কৃষ্ণরাও পওয়ার এক টাট্টু ঘোড়ায় চ'ড়ে বিজয়গড়ের দেউড়ীতে এসে উপস্থিত হ'ল। অনেক ডাকাডাকি করাতে দরওয়ানরা ফটক খুলে দিলে। চেয়ে দেখে স্বয়ং

সাহেব। চারিদিকে সাড়া প'ড়ে গেল। বৃদ্ধ শাস্ত্রীমহাশয় ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন। জানকীবাই দৌড়তে দৌড়তে নেমে এল, কৃষ্ণাজীর দাড়ীতে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,

"একা এসেছিস, বাবা? বৌমা কোথায়?"

সে শুধু এক কথায় জবাব দিলে, "হ্যাঁ।"

কৃষ্ণাজী বিজয়গড়েই রয়েছে। কারও সঙ্গে দেখা করে না, কথাবার্ত্তাও কয় না। কেবল ঘোড়ায় চ'ড়ে ঘুরে বেড়ায় পাহাড়ে পাহাড়ে, আর নিজের ঘরে 'বই নিয়ে ব'সে থাকে। রামশাস্ত্রী কিছুই বুঝতে পারছিলেন না; কিন্তু কোনও কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। তাঁর আশা যে সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। জানকীবাইকে তিনিই উদ্যোগ ক'রে কাশী পাঠিয়ে দিয়েছেন, কারণ এটা তিনি আন্দাজ করেছিলেন যে জানকীকে দেখলেই কৃষ্ণাজী ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়ে।

লোকজন বলাবলি করে,

"রাও সাহেবের যে রকম গতিক, উনিও কোন দিন কাশীবাস করতে চ'লে না যান।"

তার কিন্তু কোন সম্ভাবনা নেই। কৃষ্ণরাওয়ের তীর্থস্থান নিকটেই। রোজ সকাল একবার সে সেই জায়গায় যায়, যেখানে কমলাকে প্রথম রাজার গাড়ীতে দেখেছিল। খানিকক্ষণ ঘোড়া আর সওয়ার নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর একছুটে ঘোড়া বাড়ী ফেরে। কৃষ্ণরাওয়ের কানে বাজে সেই স্বর, "ভাই সাহেব, আমাকে বাঁচাও।"

শাঁখ

ভারতবর্ষের নক্সার পশ্চিমদিকে সমুদ্রের লাগা শুয়ো পোকার মত যে লম্বা পাহাড়টা দেখা যায় তার নাম পশ্চিমঘাট, পুরানো নাম সহ্যগিরি। সেই পাহাড়ের কোলে সমুদ্রের ধারে যে ফালির মত জমী আছে, তাকে বলে কোকন। আর ঘাটমাথা থেকে পূর্ব্বদিকে চ'লে গেছে যে ডাঙ্গা জমী তাকে বলে দেশ। মহারাষ্ট্রের এই দুই ভাগ।

কোকনে রেল নেই। সেখানকার অধিকাংশ লোক যাওয়া আসা করে জলপথে। রেলে চড়বার সাধ হ'লে সহ্যাদ্রি ডিঙ্গিয়ে কোশ চল্লিশেক গিয়ে দক্ষিণ-মরাঠা রেলের কোনও ষ্টেশনে চড়তে হয়। নিতান্ত দায়ে না পড়লে আগে কেউ ওপথে যাওয়া আসা করত না। এখন হাওয়াগাড়ী হওয়ায় পথের কষ্ট খুব ক'মে গেছে, তাই অনেকে যায়। তবু জাহাজের যাত্রীর ভিড় একটুও কমে নাই। কোকনের প্রধান শহর রত্নাগিরি। সেখানে গরমও নেই, ঠাণ্ডাও নেই, যেন চিরবসন্ত। কোকিল পাপিয়াও ডাকে বার মাস। যারা নূতন আসে, তাদের সমুদ্র গর্জ্জনে ঘুম হয় না। আবার যারা পুরানো বাসিন্দা ঐ গর্জ্জন তাদের ঘুম পাড়ানি গান। পাহাড় আর সমুদ্রে মিলে কোকনে এমন একটা অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে যে তার জোড়া কোথাও পাওয়া দুষ্কর। পাহাড়গুলো ন্যাড়া, বন নেই, শস্যশ্যামল ক্ষেতও নেই, কেবল পাথর আর পাথর, তবু কি সুন্দর! ঐ পাহাড়ের ভেতর সমুদ্রের কত খাড়ী ঢুকে গেছে কোথাও পাঁচ কোশ, কোথাও দশ কোশ। যাঁরা বিলেত ভালবাসেন তাঁদের জন্য লিখছি যে সাহেবরা এই খাড়ীর দৃশ্য নরওয়ের ফিওর্ডের সঙ্গে তুলনা করেন। এটাও তাঁরা বলেন

যে রত্নাগিরির সাগরতীর অনেকাংশে তাঁদের দেশের কর্ণওয়াল জেলার সমুদ্রকূলের মত। সেই খাড়া পাহাড় আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঙ্গড়া, সেই পাহাড়ের গোড়ায় ঝকঝকে রূপোলী রঙ্গের বালি আর ঘোর নীল জল। প্রকৃতি এখানে সৌন্দর্য্য অকাতরে দিয়েছেন কিন্তু লোকের অন্নসংস্থান ক'রে দেন নাই। শস্য যা জন্মায় তা এত অল্প যে গরীব চাষীরা বছরে দুমাস ভাত রুটী খেতে পায় না। আর একটা আশ্চর্য্য এই যে এত মনোরম জায়গায় থেকেও এখানে মানুষের মনে কখনও একটা শিল্পকলার প্রেরণা আসে নাই। এই সব পাঁচ রকম কারণে ব্যবসা বাণিজ্য নেই বললেই হয়। তবে একটা জিনিস খুব আছে, সেটা হচ্ছে মানুষ। যেমন বুদ্ধিমান তেমনি কর্ম্মঠ। এত সুন্দর জায়গায় এই চিরবসন্তের মাঝে এমন জিনিস জন্মায় কি ক'রে কে জানে। এখানে ত শুধু খুব উৎকৃষ্ট নমুনার lotus-eaters (গোঁফখেজুরে) জন্মাবার কথা। তা না হয়ে এখান থেকে বের হ'ল কি না, পুণার পেশোয়ারা, একালের গোখলে টিলক, এই রকম কত নীরস কেজো লোক। আর অনামা সিপাহী মাল্লা এই কোকন যে কত রপ্তানি করেছে, আজও কত করছে, তার ইয়ত্তা নেই। জল এদের ঘর বাড়ী। কত শতাব্দী ধ'রে এদের জাহাজ আরবসমুদ্র আর ভারতমহাসমুদ্র চ'ষে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেক খাড়ীর মুখে একটা ক'রে প্রকাণ্ড পাথরের কেল্লা। তাদের কাজ ফুরিয়ে গেছে। একদিন কত ঝড়, কত তুফান তারা বুক পেতে আটকেছে। এখন কেবল আষাঢ়ের মৌসুমী ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

এই রকম একটা কেল্লার সঙ্গে মুখোমুখি ব'সে আমি সাত বছর কাটিয়েছিলাম। সমতল দেশের বাসিন্দা, চিরনিগৃহীত

গতের মানুষ আমি, আমার চোখে যা পড়ত সবই romance, কাব্যময়। পাঠককে সেই romanceএর ভাগ দেবার ইচ্ছায় একটা গল্প বলছি। গল্পের সত্যাসত্য সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করা বৃথা, কেন না আমি মেনে নিচ্ছি যে অমিশ্র সত্য বড়ই নীরস, আর যাতে রস নেই এমন জিনিস আমি অন্যকে দিতে যাব কেন?

ইব্রাহিম ছিল জাতে দালদী। এই দালদীরা আগেকার দিনে রাজাদের ফতেহ্‌মারীর মাল্লাগিরি করত। কিন্তু রাজারাও গেলেন, তাঁদের বহরও গেল, তখন থেকে এরা সমুদ্রে মাছ ধ'রে দিন গুজরান করে। কেউ কেউ বড় বড় ষ্টীমারে লস্কর হয়। মাইনের লোভে যায় বটে, কিন্তু নিজেদের নাও চালিয়ে এরা ঢের বেশী আনন্দ পায়। আমি খাড়ীতে পাখী শিকার করতে কি রবিবার যেতাম। সেই কাজের জন্য ইব্রাহিমের ছোট্ট জেলেডিঙ্গীখানা আমার বাঁধা বাহন ছিল। তার ছেলে ইউসুফ কখন কখন আমায় নিয়ে যেত। কিন্তু ইব্রাহিম বাড়ী থাকলে সেই আসত। বুড়ো মানুষ, কিন্তু কি অসাধারণ তার দম! ভোর পাঁচটা থেকে বেলা বারোটা পর্য্যন্ত ব'ঠে চালিয়েও শ্রান্ত হত না। মদ্দতের জন্য একটা ছোকরা সঙ্গে নিত, কিন্তু সে মোটের উপর ফাঁকী দিত, কাজটা পড়ত বুড়োর উপরেই। ফেরবার পথে তাকে একটু আরাম দেওয়ার মতলবে আমি খানিক ব'ঠে ধরতাম, বিশেষ যখন জোয়ার ঠেলে আসতে হত।

বুড়ো বুঝতে পারত। একটু হেসে বলত, "আচ্ছা, নাও সাহেব থোড়া বখত। পঁয়ষট্টি বছর উমর হয়ে গেছে। এক এক সময় থেকে যাই।"

পাখী পড়লেই ইব্রাহিম জলে লাফিয়ে প'ড়ে তুলবেই ছোকরাকে কিছুতে যেতে দিত না। শিকার তোলা যে তার হক্। নিজের জন্য সে যে পাখী ফরমাশ করত এক আধটা মেরে দিতাম। কিন্তু আগে হতে সাবধান ক'রে দিত, "একটু জান যেন থাকে, সাহেব। হালাল করতে হবে।"

ইব্রাহিম থাকত আমার পাহাড়ের পায়ের গোড়ায় এক দালদী গাঁয়ে। সেখানে সব জেলের বাস। সর্ব্বত্র মাছ্ধরার সরঞ্জাম মেরামৎ হচ্ছে, শুকোচ্ছে। গাঁয়ের সামনে বড় বড় এবড়ো খেবড়ো পাথরের পোস্তা বাঁধা। যখন বাড়ী থাকে, জেলেরা সেই পোস্তার উপর পা ঝুলিয়ে ব'সে গল্পগুজব করে। পোস্তার নীচে বালি। সেই বালির উপর তাদের নৌকাগুলো টেনে তোলা রয়েছে। গাঁয়ের মাঝখানে মসজিদ, তার লাগা এক মকৃতব। ইউসুফকে বাপ যত্ন ক'রে মকৃতবে পড়িয়েছিল, কেন না নিজের জীবনে নিরক্ষর থাকার দরুন তাকে. অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল।

বুড়োর সঙ্গে প্রতি রবিবার সারা সকালবেলা কাটিয়ে বড় ভাব হয়েছিল। কত সুখ দুঃখের কথা কইত। বাহির দরিয়ায় মাছ ধরবার জন্য তার একখানা মাত্র হোড়ী (নৌকা) ছিল। কিন্তু তার বাবার আমলে তাদের এ রকম আটদশখানা হোড়ী চলত। তা ছাড়া এক মাল বোঝাইয়ের বড় গলবৎ (ডিঙ্গা) ছিল। সেই ডিঙ্গায় চেপে সেও ছেলে বেলায় বাপের সঙ্গে দেশ বিদেশে কত বন্দর ক'রে এসেছে।

একদিন গল্প করতে করতে, "এক সফরে লঙ্কার কলম্বো বন্দরে গেছলাম, হুজুর। সেখানে—" ব'লেই থেমে গেল।

মোটের উপর তার মতে বড় ডিঙ্গায় সফরে মজা কম, কারণ গা খাটিয়ে অন্য লোকের মাল বয়ে বেড়িয়ে কি এত আনন্দ? মেছো হোড়ীতে বেরিয়ে গিয়ে বা'র দরিয়ায় দুদিন কাটান, হিকমৎ ক'রে বড় বড় মাছ ধরা, এতে ঢের বেশী মজা। একটা মুসী (shark) ধরতে পারলেই ত সব মজুরী পুষিয়ে যায়। আর যে সব লোক কলের জাহাজে লস্কর হয়ে যায়, সেগুলো ত আস্ত উল্লুক। তারা কোন মেহনৎ করে না। ইঞ্জিন জাহাজ ঠেলছে আর তারা রঙ্গ-চঙ্গে কাপড় প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ রকম ক'রে কি সারা জিন্দগী কাটান যায়?

এ সব ইব্রাহিমের কথা, আমার নয়। আমি বিলেত গিয়ে লেখাপড়া শিখে এসেছি। আমি বলতেই বাধ্য যে মোটার, ঘোড়ার চেয়ে ভাল, ষ্টীমার, ডিঙ্গার চেয়ে ভাল, কাপড়ের কল, তাঁত চরকার চেয়ে ভাল।

আমি অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তার এতটা অবস্থা পরিবর্ত্তন কি ক'রে হল। সে হাসত আর বলত, অবস্থা কি কারও চিরদিন এক থাকে? জহান-বিজয়ী সেকন্দরশাহার একবাল আজ কোথায়? ইরাণের বাদশাহ দারাশার লোক লস্কর আজ কোথায় গেছে? সুর ক'রে বলত,

"ইক্‌বালমন্দ বন্‌কে সিকন্দর কিধর গয়া?
দারাকে লোক ও লস্কর কিধর গয়ে?"

আমি যদি জিজ্ঞাসা করতাম, "আবার ত চাকা ঘুরে যেতে পারে? ইউসুফ ত মস্ত লোক হতে পারে," তাহলে সে গম্ভীরভাবে উত্তর দিত, "আল্লার কুদরতে সবই হতে পারে, সাহেব।"

এই রকমে বছর খানেক কেটে গেল। দালদী গাঁয়ের মক্তবের সঙ্গে আমার অল্পবিস্তর সম্বন্ধ ছিল। মাঝে মাঝে সেখানে যেতাম। একদিন সেখানকার মৌলবী সাহেব, আলিনওয়াজশাহ, আমায় কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন, "সাহেব, তুমি ইব্রাহিমের ডিঙ্গীতে শিকার খেলতে যাও, ও তোমায় ওর শাঁখের কথা কিছু বলে নেই?"

আমি বললাম, "না। কিসের শাঁখ?"

"তোমাদের হিন্দু রাজাদের শাঁখ, সাহেব। ঐ শাঁখের জন্যই ত বুড়ো দেওয়ানা হয়েছে। ওকেই জিজ্ঞাসা ক'র। আমি কিছু বলেছি শুনলে বড় রাগ করবে।"

রবিবারে ইব্রাহিম মাছ ধরতে বেরিয়ে গেছল, তাই ইউসুফ ডিঙ্গী নিয়ে এল। পথে যেতে যেতে তার কাছে খোঁজ করলাম তার বাপের শাঁখের কথা। সে বললে, "শুনি ত সাহেব। আমাকে কিছু বলে না। ঘরের ভেতর একটা পেতলবাঁধান সিন্দুক আছে, তাতে কিছু আছে বোধ হয়।"

আর এক হপ্তা ধৈর্য্য ধ'রে থাকতে হল। পরের রবিবারে সুবিধা পেলাম। ঠিকে ছোকরা কাউকে পাওয়া গেল না। ইব্রাহিম একাই ডিঙ্গী বের করলে। খানিকটা গিয়ে আমি বললাম, "ইব্রাহিম, তুই রাগ করিস্ না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। একদিন তুই কলম্বোর কথা বলতে বলতে থেমে গেলি কেন?"

"সাহেব, তোমার সওয়ালে আমি রাগ করতে পারি? সেই কলম্বো বন্দরে যাওয়ার সঙ্গে আমার সমস্ত জীবনটা এমন জড়িয়ে আছে যে সব কথা বলতে অনেক সময় লাগবে। তোমার শিকারও নষ্ট হবে।"

"আমি আজ শিকার করব না। ঐ গাছটার নীচে ডিঙ্গী লাগা।"

ডিঙ্গী যেখানে ভিড়ল সেখানটা লোকের বসতি থেকে অনেক দূর। একটা পাহাড় খাড়া উঠে গেছে, তারই গায়ে এক তাকের উপর এক আম গাছের তলায় দুজনে বসলাম। ব'সেই আমি বললাম, "ইব্রাহিম, তুই আমায় একটু ভালবাসিস্ ত? আমাকে তোর শাঁখের কথাও বলতে হবে।"

বুড়ো চমকে উঠল, "শাঁখের কথাও তোমার কানে গেছে? আচ্ছা, তাহলে সব গল্পটাই করি, শোন।"

* * * *

ইব্রাহিম এই গল্প বললে—সাহেব, তোমাকে বলেছি ত আমার বাবার এক মালের ডিঙ্গা ছিল। তিনি সব সময় নিজে ডিঙ্গা চালাতেন, চাকরদের উপর নির্ভর করতেন না। আমার বয়স দশ বছর হওয়ার পর থেকে আমাকেও সঙ্গে নিতেন। আমরা যখন বিদেশে যেতাম তখন মাছ ধরার কাজ, মা জ্ঞাতিদের সাহায্যে চালাতেন। আমার এক ভাই ছিল, ইমদাদ, কিন্তু সে তখন খুব ছোট।

বাবার ডিঙ্গার মাল্লারা জাতে ভাণ্ডারী হিন্দু ছিল। খোলা দরিয়ায় এই ভাণ্ডারীরা দালদীর ছেলের চেয়েও ভাল কাজ করে। ভয় ডর মোটে নেই। ঝড় তুফান উঠলে এরা যেন আরও বেশী মজা পায়। বাবা এদের বড় ভালবাসতেন। এমন কি, এদের খুশী করার জন্য দেওয়ালীর সময়, ডিঙ্গাটাকে পূজা ক'রে গলুইয়ের কাছে সিন্দুরের ফোঁটা লাগাতে, ফুলের মালা পর্য্যন্ত পরাতে দিতেন।

বাবা ইমানী মুসলমান ছিলেন, হজ ক'রে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি বলতেন যে দরিয়ার উপর জাহাজের তাণ্ডেল ও মাল্লারা, হিন্দু ও মুসলমান, সবাই ভাই, কেন না সবাই জান দিয়ে ডিঙ্গা বাঁচায়।

একবার, আমি যখন পনের বছরের, আমরা খুব লম্বা সফরে বেরিয়েছিলাম। উত্তরে করাচী বন্দর, পশ্চিমে মেকরান পর্য্যন্ত ঘুরে, মোপলাদের দেশ থেকে মাল নিয়ে, কলম্বো চ'লে গেলাম। সেখানে সব মাল নামিয়ে দিয়ে, নারকেল বোঝাই ক'রে, বাড়ী ফেরার উদ্যোগ করছি, এমন সময় একজন তামিল হিন্দু এক সিন্দুক মাথায় ক'রে এসে হাজির হল।

বাবাকে বললে, "আমায় বোম্বাই নিয়ে চল, তাণ্ডেল। যা ভাড়া চাও আমি দেব।"

বাবা উত্তর দিলেন, "আমরা কখনও মুসাফের নিয়ে যাই না, কেবল মাল বই। তোমায় কোথা থাকতে দেব?"

লোকটা অনেক অনুনয় বিনয় ক'রে বললে, "তাণ্ডেল, সিন্দুকটা ছেড়ে দিতে মন সরছে না। তাই সঙ্গে যেতে চাচ্ছি।"

বাবা ভয়ানক চ'টে গেলেন, বললেন, "কত খোজা, বোহরা, বেনে, পার্সী শেঠেদের লাখো লাখ টাকার মাল নিয়ে যাচ্ছি। তোর ঐ সিন্দুকটা আমি খোয়াব? খোয়া যদি যায় ত গুনেগারী দেব।"

লোকটা জোড় হাত করলে। আমার ওকে দেখে বড় মায়া হচ্ছিল। বাবাকে বললাম, "আসুক না বাবা। একধারে প'ড়ে থাকবে তক্তার উপর, ওর সিন্দুকটা নিয়ে।"

মাল্লারাও জোড় হাত ক'রে মিনতি করলে, "ইস্মাইল ভাউ, লোকটা বামুন। এমন ক'রে বলছে। আসতে দাও না, আমাদের মাঝে প'ড়ে থাকবে।"

শেষ তাণ্ডেলের মেহেরবানি হ'ল, বামুনকে তুলে নিলে। কলম্বো ছাড়ার পর তেসরা দিনে ভয়ানক তুফান উঠল। ডিঙ্গা কি রকম ভীষণ যে দুলতে লাগল! তক্তার উপর দিয়ে এই একবার ঢেউ চলে গেল। আমি গিয়ে এক রশি নিয়ে বামুনের পেটরাটাকে বেঁধে দিলাম মাস্তুলের সঙ্গে, আর তাকে বললাম, "তুমি তোমার পেটরা ছেড় না। জোর ক'রে ধরে থাক।"

ঝড় কয়েক ঘণ্টা রইল। আমরা এত ব্যস্ত ছিলাম যে আমি বামুনের কথা ভুলেই গেছলাম। সমুদ্র শান্ত হ'লে তার কাছে গেলাম। সে তার সিন্দুক জাপটে ধ'রে প'ড়ে রয়েছে, কিন্তু বেহোস, দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। একটু পরে হোস ফিরে এল। তখন ভয়ানক কাঁপতে লাগল।

আমাকে চিনতে পেরে বললে, "ইব্রাম সাহেব, তুমি বড় ভাল ছেলে। তোমার মেহেরবানিতে এই ডিঙ্গায় জায়গা পেয়েছি। যদি সেদিন কলম্বো না ছাড়তে পারতাম, ত আমার জান বাঁচান শক্ত হত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় একই দাঁড়াল। আজ ক'বছর আমার কি একটা ব্যারাম হয়েছে। কোন রকম মেহনৎ হ'লে, কি ভয় পেলে, ছাতির ভেতর একটা দরদ ওঠে, আর এই রকম সব দেহটা কাঁপতে থাকে। ঝড়ের সময় কেবল মনে হচ্ছিল আমার সিন্দুকটা বুঝি ঢেউয়ে নিয়ে গেল। তা ঠিক নিয়ে যেত, যদি না তুমি মনে ক'রে কাছি দিয়ে বেঁধে রাখতে। তোমায় একটা কথা বলব ব'লে ডাকলাম। আমার শরীরটা বড়ই খারাপ বোধ হচ্ছে। এ ধাক্কা হয় ত সামলাতে পারব না। যদি মরে যাই, ত এই সিন্দুক তোমার, তোমায় দিয়ে গেলাম। এতে যা মাল আছে তাও তোমার। নসীবে থাকে এর থেকে তুমি একদিন

বড় মানুষ হবে। কিন্তু সবুর দরকার। অধীর হ'লে চলবে না।"

এই কথা বলতে বলতে বুড়ো কাসতে লাগল। অন্ধকারে মনে হ'ল যেন খানিকটা রক্ত উঠল। মাল্লাদের ডাকলাম। তারা বামুনকে যত্ন ক'রে তুলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে। আমি সিন্দুকের কথা কাউকে কিছু বললাম না। বাকী রাতটা বুড়োর কাছে ব'সেই কাটাব মনে ক'রে তার সঙ্গে নীচে গেলাম। ভোর রাত্রে ঘুমে ঢুলছি, এমন সময় জোরে ডাক শুনলাম, "ইব্রাম সাহেব, এখানে আছ?" চেয়ে দেখি বামুনের চোখ দুটো যেন ভাটার মত ঘুরছে। তার পর মিনিট পাঁচেকে সব ঠাণ্ডা! আর কিছু বলতে পারলে না। ভয় পেয়ে বাবাকে গিয়ে সব বললাম। তিনি বললেন,

"মাল্লাদের বল্ ফেলে দিক্। আমি বামুনের লাশ নিয়ে কি করব? আর দেখ্, ওর সিন্দুক তোকে দিয়েছে বলছিস? তা বেশ, তুই যা খুসী করিস্। ওর ভেতর কাফেরদের কিছু বুত (পুতলা) আছে কি না কে জানে? আমি তাতে হাত দিয়ে জাহান্নম যেতে চাই না। তোর দিল চায় তুই খুলে দেখিস্। আমি কিছু তোর উপর জোর করব না।"

এতক্ষণে বেশ ফরসা হয়েছে। আমি উপরে গিয়ে সেই বুড়ো মাদ্রাজীর কবরের হুকুম দিলাম। জান ত, হুজুর, দরিয়ার উপর মাটি দেওয়া একই রকমের। মুসলমানেরও যা হিন্দুরও তাই। এক চটের থলীর ভেতর লাশটাকে পুরে, পায়ে এক খণ্ড পাথর বাঁধলাম। তার পর মাল্লারা আর আমি তাকে তুলে, এক, দুই, তিন, ব'লে তিনবার দোলা দিয়ে, ছুড়ে ফেলে দিলাম যত দূরে পারি, নীল ঢেউগুলোর মাঝে। মাল্লারা তাদের রামজীকে ডাকলে। আমিও

ব'লে উঠলাম, "আল্লা করিম।" হ'লই বা কাফের, বাবা ত বলত যে দরিয়ার উপর সব ভাই ভাই।

তার পর সিন্দুক খোলার পালা। বাবা ত ছোঁবে না বলেছে। মাল্লাদের বিশ্বাস করতে পারলাম না। একা একা চুপি চুপি সিন্দুকটা নীচে নিয়ে গিয়ে খুললাম। প্রথম দেখি ভেতরে কেবল খড়। খড়গুলা টেনে ফেলতে তার মাঝখান থেকে বের হ'ল একটা বড় রকম রেশমের পুঁটুলি। তাড়াতাড়ি পুঁটুলির বাঁধন খুললাম। ভেতরে তিন পরদা কাপড়ে ঢাকা এক প্রকাণ্ড শাঁখ আর সেই শাঁখে গোঁজা একটা কাগজ। কাগজের উপর কি সব লেখা। দেখে মনে হ'ল মরাঠী হরফ। আমি ত পড়তে জানি না। কিছুই বুঝলাম না যে ঐ শাঁখটাকে বুকে ক'রে বুড়ো বামুন কেন ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অনেক দিন ধৈর্য্য ধ'রে থাকতে হবে, যতদিন না বাড়ী পৌছে কাউকে দিয়ে কাগজটা পড়াই। কেন নিজে লেখাপড়া শিখি নেই!

এর পর জাহাজে যেন সময় কাটতে চায় না। একটা শাঁখে কি এমন থাকতে পারে? আমরা জেলে মানুষ, আমরা ত জানি যে শাঁখও যা, শামুক গুগলীও তাই। হিন্দুরা শাঁখ রাখে, পূজার সময় বাজায়, এই শুনেছি। ও জিনিসের আবার দাম কি? দরিয়ায় কত পাওয়া যায়। বুড়োটা ত ব'লে গেল নসীবে থাকে ওর থেকে আমি বড় মানুষ হব। এও কি সম্ভব? নিশ্চয় বুড়োটা পাগল ছিল, নয় ত মরবার আগে মগজ ফিরেছিল। ব'সে ব'সে দিবারাত্র এই সব ভাবতাম।

বাবা একদিন বললেন, "সেই হিন্দুটার সিন্দুক খুলেছিলি? কিছু দেখতে পেয়েছিস্? পুতলা হয় ত খবরদার-হাত দিস্ না।

ও গুলো সব ভূতের বাসা। ঐ জন্যই ত আমাদের মোল্লারা হিন্দুদের ভূতপরস্ত বলে। তোর চেহারাটা খারাপ দেখাচ্ছে কেন রে?"

মাল্লারা মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞাসা করত, "ইব্রাম ভাউ, সেই বামুনের পেটারা খুলেছিলে? সেটা যে রকম আগলে আগলে বেড়াত, ওতে নিশ্চয় অনেক হীরা জহরৎ আছে।"

শুনে আমার ভয় হ'ল। এ বিশ্বাস ত ভাল নয়। কোন দিন শাঁখের পুঁটুলিটা হীরা জহরৎ ভেবে সরিয়ে রাখবে। আমি তাদের নীচে নিয়ে গেলাম! সিন্দুক, তার ভেতরের পুঁটুলী, সব খুলে দেখালাম। শাঁখ দেখে তারা দুহাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। কাগজটা একজন হাতে ক'রে নিলে। কিন্তু তারা সবাই আমার মত বিদ্বান! কাগজের উপর অনেক লাল হলদে দাগ ছিল। তাই দেখিয়ে তারা বললে, "ইব্রাম ভাউ, কাগজে মন্ত্র লেখা আছে। মন্ত্রটা পড়লে শাঁখের ভেতর দেও আসবে।" ভাবলাম, বাবারও যা মত; এদেরও তাই দেখছি। সত্যি ভূতের কারখানা নাকি?

দিন কয়েক পরে ডিঙ্গা রত্নাগিরি বন্দরে লাগল। ব্যাপারীরা এসে নারকেলগুলো নিয়ে গেল। তারপর আমরা ডিঙ্গা বালির উপর তুলে দিয়ে নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ী গেলাম। সেদিনটা আর কিছু করলাম না। মার সঙ্গে গল্প ক'রে, ভাইয়ের সঙ্গে খেলা ক'রে কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন সকালে উঠে এক মন্দিরে গেলাম। কোন মন্দিরে জান, সাহেব? আমাদের পাড়ার ঠিক বাইরে, তোমার পাহাড়ের নীচে যে বড় মন্দিরটা আছে, সেইখানে। দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি ক'রতে পূজারীঠাকুর বেরিয়ে এল। তাকে বললাম,

"আমাদের ডিঙ্গায় একজন বামুন এক কাগজ ফেলে গেছে। বোধ হয় তার পূজার কিছু হবে। বাবা পাঠিয়ে দিলেন, আপনি একবার প'ড়ে দেখবেন কি?"

কাগজটা দিলাম। পূজারী খুব মনোযোগ ক'রে প'ড়ে দেখলে আমায় জিজ্ঞাসা করলে, "এ কাগজের সঙ্গে কি কিছু জিনিস ছিল?"

আমি বললাম, "না। বোধ হয় তার পকেট থেকে কাগজটা পড়ে গেছল।"

"সে ব্রাহ্মণ গেল কোথা?"

"তাকে ত চিনি না! আমরা তাকে কলম্বোতে নামিয়ে দিয়ে এসেছি। ও কাগজে মরাঠীতে কি লেখা আছে, ভটজী?"

"মরাঠী নয়, যা লেখা আছে সংস্কৃতে, আমাদের শাস্তরের জবানে। মোদ্দা কথাটা আমি বলছি, তুই ইস্মাইলকে বলিস্। কোনও শাঁখের কথা বলেছে। এই শাঁখ একশো বছর আগে লঙ্কার কাছে পাওয়া যায়। দক্ষিণাবর্ত্ত শাঁখ। তার মানে কি বুঝিয়ে দিই। সাধারণ শাঁখের আবর্ত্ত, মানে প্যাঁচগুলো, যে দিকে, এর তার উলটো দিকে। তার পর, কোনও আয়েব নেই, দেখতে যত দূর হতে পারে উমদা আর মস্ত বড়। কাগজে লেখা আছে যে লাখ ত্রলাখেও এরকম একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শাঁখ পাওয়া যায় না। এ শাঁখে ফুঁ দিতে হয় না, তুলে ধরলেই আপনা থেকে সুর বের হয়। এই সব বয়ান ক'রে শেষ লেখা আছে, যে এই শঙ্খ কেবল সসাগরা ভারতের রাজার উপযুক্ত রণভেরী। এর মানে হ'ল যে সারা হিন্দুস্তানের শাহানশাহ বাদশাহ যে, তার লায়েক জিনিস এই শাঁখ। জানিস্ ত আমাদের রাজারা লড়াইয়ের সময় শাঁখ

বাজিয়ে হুকুম দিবে? কাগজে খুব কড়া তাকীদ দেওয়া আছে যে এর মালিক যদি কখনও লোভে পড়ে কোন না-লায়েক রাজার হাতে এ জিনিস তুলে দেয়, তবে তার বংশ লোপ হবে। মালিক রাজাকে চোখে দেখলেই বুঝতে পারবে যে সে এ শাঁখের লায়েক কি না।"

শুনে বুঝলাম কেন মাদ্রাজী বলেছিল যে সবুর ক'রে থাকতে পারা চাই তবে এই শাঁখ থেকে ধনদৌলত আসবে। পূজারীকে আর কিছু বললাম না; একটাকা দিয়ে সেলাম ক'রে বাড়ী ফিরলাম। পনের বছরের ছোকরা এর কি ব্যবস্থা করতে পারে? একটা রাজাকেও যে কখন চোখে দেখে নেই, সে চেহারা দেখে লায়েক রাজা চিনবে কি ক'রে? চুপ চাপ রইলাম। বাবার সঙ্গে ডিঙ্গাতে আর যেতাম না। ঐ এক সফরেই যা বোঝা নিয়ে এসেছি, তার ঠেলা সামলাতে পারলে হয়। আখের ঠিক করলাম, কোথাকার কি কাফেরদের শাঁখ, তাই নিয়ে মন খারাপ করব না। হোড়ী নিয়ে মাছ ধরার কাজে লেগে গেলাম। কয়েক বছর এই রকম চলল। বাবা মাল বয়ে বেশ নফা করতে লাগলেন। আর এদিকে মাছ ধরার কাজ নিজে হাতে করার জন্য তারও আয় বেশ বেড়ে গেল। দিবারাত্র কাজে ব্যস্ত থাকতাম। জাল মেরামত, হোড়ীগুলোর তদারক, মাছ ধরা, তাকে নুন দিয়ে জরান, এই সবে এমন মেতে থাকতাম যে আর শাঁখের কথা ভাববার সময় হত না। সেটা সেই পুরানো পেতলবাঁধা সিন্দুকেই তোলা থাকত।

যখন আমার উমর পঁচিস, ইমদাদের উমর আঠার, তখন বাবা মারা গেলেন। একবার সফরে বেরিয়ে আর তিনি ফিরলেন না। ডিঙ্গা সমেত, মাল্লা সমেত, তাঁকে দরিয়া গ্রাস ক'রে নিলে। লোকসান

হ'ল অনেক। মানুষও গেল, পয়সাও গেল। যাহোক, দুভাই প্রাণপণে লেগে পড়লাম মাছের ধান্দায়। এই রকমে আরও দুবছর কেটে গেল। আমাদের দুভাইয়েরই সাদী হয়েছে। মার সুখ সোয়াস্তি হওয়ার কথা। কিন্তু সুখ দূরে থাক, ক্রমে সংসারের অশান্তি বেড়ে যেতে লাগল। বৌয়েদের পরস্পর বনিবনাও ছিল না। মার কথাও তারা শুনত না। আস্তে আস্তে ইমদাদও বেপরোয়া হয়ে উঠল। সে মকতবে ও ইস্কুলে পড়েছিল। উর্দ্দু ও মরাঠী দুই লিখতে পড়তে পারত। কথায় কথায় আমায় বলত যে সে জেলের ধান্দা ক'রে জীবন কাটাতে পারবে না।

প্রথম ঝোঁক হ'ল ষ্টীমারে লস্করের চাকরী নেবে। আমি অনেক ক'রে বোঝালাম যে পরের গোলামী করতে গিয়ে আখের পস্তাবি। তার পর ধরলে যে একখানা নূতন ডিঙ্গা কিনে বাবার মাল বওয়া ব্যবসা আবার সুরু করবে। আমি দুতিন বার বললাম যে ঘরে পয়সা নেই, কর্জ্জ ক'রে গলবৎ কেনা বেওকুফী হবে। সে চ'টে গিয়ে বললে, "দে, আমার হিস্‌সে আলাদা ক'রে দে।"

আমি নিজের রাগ চেপে খুব মিনতি ক'রে বললাম, "অম্মা বেঁচে থাকতে ও সব দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়়। বুড়ো বয়সে তাঁকে কেন কষ্ট দিবি?"

কিছুতেই কথা শুনলে না। লেখাপড়া শিখেছে কিনা, একেবারে উকীল বাড়ী গিয়ে নালিশ রুজু ক'রে দিলে। আদালৎ থেকে লোক এসে মালপত্রের ইয়াদী ক'রে নিয়ে গেল। ইমদাদ জবরদস্তী ক'রে সিন্দুক খোলালে। কাছারীর মুহুরীকে সে বললে যে ওতে সোনা চাঁদী লুকান আছে। যখন একটা শাঁখ বই আর কিছু পাওয়া গেল না, ভাই নাক সিঁটকে স'রে গেল, বললে,

টাকাকড়ি দাদা কোথাও পুঁতে রেখেছে। মোকদ্দমা চলল। ভাই যা খুশী করতে লাগল, উকীল আমলা সকলের সঙ্গে তার ভাব। আমি মূর্খ দালদী, ইমানের উপর নির্ভর ক'রে ছিলাম, একটা উকীলও বহাল করি নেই। এই সব গোলমালের মাঝে আমাদের দুঃখিনী অম্মা মারা গেলেন। মরার সময় আমায় ডেকে বললেন, মোকদ্দমা মিটিয়ে ফেলতে হবে। আমি পায়ে হাত দিয়ে কসম খেলাম যে তাঁর হুকুম তামিল করব।

ইমদাদকে বলাতে সে বললে, "তোর শাঁখ আর একটা হোড়ী তোকে ছেড়ে দেব। তাতে রাজী হস্ ত আজই আদালতে রাজীনামা দাখিল করব।"

তাইতেই রাজী হলাম। আমার বিবি চ'টে গেল, অনেক কষ্টে তাকে ঠাণ্ডা করলাম। ইমদাদ সব হোড়ীগুলো নিলে বটে, কিন্তু একমাসের ভেতর আবার বেচে ফেললে। তারপর তার বিবিকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে আফ্রিকা চ'লে গেল। তার ইলম্ আছে, জিদও আছে, সাহেব। এখন সে নাতালে একজন বড় সওদাগর। আমার উপর আর রাগ নেই। ইউসুফকে, ইউসুফের মাকে, কত রকম সেই মুলুকের জিনিস পাঠায়। বিবিকে নিয়ে গেছে। নিজের ছেলেপিলে হয়েছে। তাদের ছবি পাঠিয়েছে। সব সাহেব লোকের মতন।

ইমদাদ এখানে বাস তুলে দিয়ে চ'লে যাওয়ার পর আমরা বড় কষ্টে পড়লাম। চিরদিন সুখে থেকেছি, এখন একটা হোড়ীর রোজগারে গুজরান হবে কি ক'রে? কাজেই এতদিন পরে আবার নজর পড়ল সেই শাঁখের উপর। আবার ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলাম কি ক'রে সেটার জোরে কিছু মোটা পয়সা

রোজগার করা যায়। এদিকে আদালতের মুহুরী পেয়াদার সামনে সিন্দুক খোলার পর থেকে লোকে কানাঘুষো করতে লাগল যে ইব্রাহিম দেওয়ানা হয়েছে একটা শাঁখ নিয়ে। শুধু একজন লোক জানত যে আমি দেওয়ানা হই নেই, সে সেই পূজারী যার কাছে ক'বছর আগে কাগজটা পড়িয়ে এনেছিলাম। একদিন সে এল আমার কাছে, চেঁচিয়ে বললে,

"তোর ডিঙ্গীটা ক'রে আমাকে কারলা পৌঁছে দিতে পারিস্? বড় জরুরী কাজ আছে।" ব'লে চোখ টিপলে।

আমি একটাকা ভাড়া কবুল করিয়ে নিয়ে ডিঙ্গী বের করলাম। একটু দূর যেতে না যেতে বামুন বললে,

"ডিঙ্গী বেয়ে যা। কিন্তু আমি কারলা যেতে চাই না। অন্য কাজ আছে। তুই ক'বছর আগে যে কাগজটা পড়িয়েছিলি তার কথা আমি ভুলি নেই। এখন দেখছি মিথ্যা কথা বলেছিলি, শাঁখ তোর কাছেই আছে। আদালতের নাজিরের মুখে আমি শুনেছি যে তোর ঘরে সিন্দুকের ভেতর এক শাঁখ রাখিস্। আর সেই শাঁখ নিয়ে তুই হোড়ীগুলো সব ভাইকে ছেড়ে দিয়েছিস।"

আমি স্বীকার করলাম কথাটা সত্য। পূজারী আবার বললে, "এখন করবি কি? আমি তোকে সাহায্য করতে পারি। আমায় শাঁখটা দে। আমি নগদ পাঁচশো টাকা গুনে দেব।"

"না ঠাকুর, আমার সে কাগজের নসীহৎ (শাপ) খুব ইয়াদ আছে। আমার ইউসুফ বেঁচে থাকুক, আমি লায়েক রাজা না পেলে সে শাঁখ বেচব না!"

ব্রাহ্মণ চ'লে গেল। তার পর রাজাদের দূত আসতে আরম্ভ হ'ল। বুঝলাম ব্রাহ্মণের কাজ, সে কিছু দালালী রোজগারের চেষ্টায়

আছে। প্রথম এলেন মালওয়া দেশের রাজার এক আফ্সার। তিনি খরচ দিয়ে আমায় মহারাজের কাছে নিয়ে গেলেন। মহারাজকে দেখলাম, পছন্দ হ'ল না, ব'লে এলাম, "আপনি আমার হিন্দুস্তানের শাহানশাহ্ ন'ন, আপনাকে শাঁখ দেব না।"

তুমাস পরে দক্ষিণের দৌলতপুরের মীরসাহেবের এক হিন্দু উজীর এলেন। দৌলতপুর গেলাম। মীরসাহেবকেও লায়েক মনে হ'ল না। সেলাম ক'রে রোখসৎ নিয়ে এলাম। সাহেব, হাসির কথা নয় এটা? এক গরীব দালদী রাজা মহারাজাকে দেখে আসছে, আর ফতোয়া দিচ্ছে, না-পসন্দ। আমার সত্যি মনে হয় আমি কিছুই করছি না। আমার শাঁখ আমায় দিয়ে করাচ্ছে।

তার পর নীলগিরির মহারাজ, আরও কত হিন্দু মুসলমান রাজা নবাব দেখলাম। কাউকে দেখে আমার কাগজের বয়ানের সঙ্গে মিলল না। বেচবার উমেদ একরকম ছেড়েই দিলাম। আমার ইউসুফের জন্যই ধনদৌলত। যাকে তাকে শাঁখ বেচে তার জানের কোন নোকসান হতে আমি কেন দেব?

শেষ, গেল বছর একদিন রাত্রে তুতিন জন বামুনের ছোকরা এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেল মিরিয়ার রাস্তার উপর এক বাঙ্গলায়। সেখানে পুণার মাতব্বরগোছের এক বামন বসেছিলেন। বুড়ো মানুষ, বড় বড় চোখ, ভারী গোঁফ, কপালে তিলক, মাথায় বামনী পাগড়ী। আমি সেলাম করতেই জিজ্ঞাসা করলেন

"দালদী, তোর কাছে এক মস্ত বড় দক্ষিণাবর্ত্ত শাঁখ আছে, সত্যি?"

"হ্যাঁ রাও সাহেব, আছে।"

"আমার কাছে বেচবি?"

"নীলগিরির মহারাজ আড়াই হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন, আমি রাজী হই নেই।"

"ফিকির নেই, আমি তার দ্বিগুণ দেব।"

"তা আপনি দিতে পারেন, কিন্তু আমি রাজা ছাড়া কাউকে শাঁখ দিতে পারি না। আমার কাগজে হিন্দু জবানে সাফ লেখা আছে, সসাগরা ভারতের অধীশ্বর।"

"আমিও শাঁখ এক রাজার জন্য চাইছি। তিনিও সসাগরা ভারতের অধীশ্বর হবেন।"

"যখন হবেন তখন আমার কাছে এসো, রাও সাহেব। আজ নয়। এখনও সসাগরা ভারতের অধীশ্বর বিলেতে।"

ব্রাহ্মণ চ'টে আগুন হয়ে গেলেন। কিন্তু আমি নিরুপায়। আমার দৈন্যদশা ঘুচল না। হোড়ী সেই একখানাই আছে। ছেলেটা ডিঙ্গী ক'রে খাড়ীর মধ্যে কিছু চুনোপুঁটিও ধরে। এই ত রোজগার ছিল। এখন তুমি এসে অবধি তোমার নিমক খাচ্ছি, একটা বাঁধা রোজগার হয়েছে।

আমি বললাম, "ইব্রাহিম, আমাকে একবার শাঁখটা দেখাবি না?"

"কেন দেখাব না, সাহেব? তুমি আমার মুরুব্বী, তোমার বাড়ী নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারি। নইলে শাঁখ এনে অবধি বাড়ীর বার কখনও করি নেই। কাল সকালে আনব।"

পরদিন সকালে ইব্রাহিম এক সিন্দুক মাথায় ক'রে এল। সঙ্গে ইউসুফ। আমায় বললে, "ছোকরাটাও দেখুক, সাহেব। কোন

দিন মরে যাব!" সিন্দুক খুলে রেশমের রুমাল ঢাকা একটা জিনিস বের ক'রে টেবিলের উপর রাখলে। ছেলেকে বললে, সেলাম কর বেটা। বাপ বেটা দুজনে সেলাম করার পর রেশমটা খুলে নিলে। কি অদ্ভুত শঙ্খ! প্রায় এক হাত লম্বা আর কি চমৎকার গড়ন! ভেতর পর্য্যন্ত কত রেখা! যথার্থ দক্ষিণাবর্ত্ত তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ইব্রাহিম বললে, "এই বার শোন সাহেব, শোন বাইসাহেব।" ব'লে আস্তে আস্তে শাঁখটা তুলে ধরলে। অমনি ভোঁ ক'রে একটা গুরুগম্ভীর সুর বেজে উঠল।

আবার সে বললে, "মাজী, আপনি একবার ফুঁক দিন, দেখুন আওয়াজ কত দূর যায়।" আমরা রাজী না হওয়াতে ইব্রাহিম শাঁখটা হাতে ধ'রে দোলালে। কত রকমের সুর বেজে উঠল সেই দোলানতে! কতকটা আন্দাজ করা গেল যে সত্যি মুখ দিয়ে বাজালে কি ধ্বনি বের হবে! রাজচক্রবর্ত্তীর উপযুক্ত রণতূর্য্য বটে, পাঞ্চজন্যের জ্ঞাতি কুটুম্ব!

ইব্রাহিম জানালে, "মাজী, আড়াই হাজার টাকা নিতে রাজী হই নেই। এ শাঁখের লেনেওয়ালা রাজা হিন্দুস্তানে এখনও পয়দা হয় নেই।"

তারপর ইব্রাহিম দেখালে যে সে জেলে হ'লেও মুসলমান, বাদশাহের জাত, সেলাম ক'রে বললে, "মাজী, তুমি যদি রাখ ত আমি দিয়ে যাই। দাম কিছু নেব না, তাহলেই ইউসুফের কোন অকল্যাণ হবার ভয় থাকবে না। বাবাসাহেব রাজা হয়ে এই শাঁখ বাজাবে।"

আমাদের সে শাঁখ নেবার কি সাহস?

ভিখারিণী

কয়েক বছর আগের কথা। মথুরাপুরীর এক বিখ্যাত মন্দিরের উঠানে এক সন্ন্যাসিনী সকাল সন্ধ্যা বসত। কোথা হতে এসেছে, কি তার নাম, কি জাত, তা কেউ জানত না। বছর দেড়েক আগে একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ সে এসে উঠানের কোণে ব'সে ভজন গাইতে আরম্ভ ক'রে দিলে। সন্ন্যাসিনীর বয়স কম, ভারী মিঠে গলা, লোক জ'মে গেল। গান শুনে খুশী হয়ে কেউ বা আধ-পয়সা, কেউ বা এক পয়সা তার সামনে ফেলতে লাগল। সেদিন ভিখারিণীর অনেক সঞ্চয় হল। সেই থেকে সেই উঠানে একই জায়গায় রোজ বসে, সকাল সন্ধ্যা এক প্রহর গান গায়, তার পর পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে চ'লে যায়। সন্ন্যাসিনী কারও সঙ্গে কথা কইত না, সারা সময়টা মন্দিরা বাজিয়ে গান গাইত। মাঝে মাঝে যখন দুই এক লহমা বিশ্রাম করত, মুখে কেবল বলত, "জয় গিরধারী, মেরে গিরধারী।" সামনে একটা হাতে-লেখা পুঁথী খোলা থাকত। লোকে জানতে পেরেছিল যে সেটা মীরাবাইয়ের ভজনাবলী। তাই তাকে সকলে নাম দিয়েছিল মীরাবহিন। তার সাজ একটু আজগুবি রকমের ছিল। গেরুয়া কাপড় লুঙ্গীর মত ক'রে পরা, গায়ে গেরুয়া চাদর জড়ান, আর মাথায় বাউরীকাটা চুলের উপর ছোট্ট গেরুয়া পাগড়ী। মুখে এত ছাই মাখা যে চেহারা কি রকম তা বোঝা যেত না। সত্যি বলতে, প্রথম দর্শনে ছেলে কি মেয়ে বোঝা শক্ত ছিল। তবে গান

শুনে কারও সন্দেহ থাকত না। যখন ভাবে বিভোর হয়ে সজল চোখে গাইত,

"মীরা কহে বিনা প্রেমসে ন মিলে নন্দলালা"

তখন মনে হত সমস্ত প্রাণটা ঢেলে দিচ্ছে ঐ প্রেম শব্দটার উপর। যখন "মেরে গিরধারী" ব'লে দীর্ঘশ্বাস ফেলত, তখন "মেরে" কথাটা শুনে কত লোক কাঁদত। পনের বছরের ছেলে কোথা পাবে এই ব্যাকুলতা!

প্রথম প্রথম সন্ন্যাসিনী অনেক পয়সা পেত। পূজারী ঠাকুরদের হিংসা হল। তারা ভাগ চাইলে। পরদিন সে মন্দিরে এল না, অদূরে এক গাছতলায় বসল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা আরতির সময় বেশী লোক জমল না। যত ভিড় সেই গাছতলায়। যেন গিরধারী স্বয়ং মন্দির ছেড়ে সেখানে বসেছেন। পূজারীদের একটু ভয় হল। সকালবেলা মীরাকে ডেকে আবার মন্দিরে বসালে। মীরাবহিন একটু হাসলে। কিন্তু হাসি কেউ দেখতে পেলে না। তার ছাইয়ের মুখোসের মাঝেই মিলিয়ে গেল।

মন্দির যে কেবল দেবতার স্থান, তা ত নয়। নানারকমের রসিক লোকেরও সেথা সমাগম। তারা মীরাকে ছেড়ে কথা কইবে কেন? নিজেদের মধ্যে যুবতী সন্ন্যাসিনীর অনেক তারিফ করত। তবে প্রকাশ্য রসিকতা করতে সাহস পেত না, পাছে কেউ গোঁয়ার গোবিন্দ রসভঙ্গ ক'রে দেয়। একদিন এদের একজন গান শুনতে শুনতে দুবার তিনবার "আহা, আহা!" ব'লে, শেষে ঝনাৎ ক'রে দুটো টাকা সন্ন্যাসিনীর সামনে ফেলে দিলে। সন্ন্যাসিনী গান থামিয়ে টাকা তুলে নিয়ে, ধীরে ধীরে উঠে সেই বাবুজীর পায়ের কাছে রেখে, প্রণাম ক'রে আবার গান গাইতে বসল। মুখে কোন

কথা কইলে না। লোকে “ছি, ছি!” ক'রে উঠল। বাবুটী পাশ্চাতে পথ পেলে না। দুচারবার এই রকম হল। কোনও রকমে আমল না পেয়ে, শিকারীর দল শেষে হাল ছেড়ে দিলে। এত সহজে ছাড়ত কিনা কে জানে, তবে মীরা/সুন্দরী কি কুরূপা তা ত ঠিক বোঝা যেত না।' মুখখানা ছাই চাপাই থাকত। আর এই শ্রেণীর প্রেমিকদের যাতে অভিভূত করে, এমন কোন উদ্দাম যৌবনের চিহ্নও তার গেরুয়া ঢাকা শরীরে প্রকট ছিল না। সন্ন্যাসিনীর জীবন তাই অনেক দিন নিরুপদ্রব ছিল।

এক দিন হল কি, এক বাঙ্গালী বাবাজী এলেন। মামুলী নমুনার নয়। গেরুয়া রেশমের পিরান, গেরুয়া গরদের ধুতি চাদর, মাথায় মস্ত গেরুয়া পাগড়ী পাঞ্জাবী ধরণে বাঁধা। এমন কি তাঁর পায়ে পর্য্যন্ত গেরুয়া ছোবান কেম্বিসের ফিতে বাঁধা জুতো। তিনি ভিখারিণীর ভজন শুনে মোহিত হয়ে, দুবেলা সেখানে হাজরে দিতে লাগলেন। ধর্ম্মচর্চ্চারও চেষ্টা করলেন। কিন্তু জমল না। ভিখারিণী তাঁকে প্রণাম করে, কিন্তু কথা কয় না। বাবাজী বোধ হয় হঠযোগ অভ্যাস করেছিলেন। অগাধ দম। তিনি অবশেষে মন্দিরের উঠানে বসলেন, বেদান্তব্যাখ্যা করতে। ইংরেজী মিশ্রিত দুর্ব্বোধ্য হিন্দীতে ব্যাখ্যা করতেন। কেউ বুঝত না ব'লে, সবাই তাঁকে খুব ভক্তি করতে লাগল। তিনি সকলকে আশ্বাস দিতেন, যে তাঁর কাছে বীজমন্ত্র নিলে অবিলম্বে পুনর্জ্জন্ম বন্ধ হয়ে মোক্ষলাভ হবে। দুচারজন মন্ত্র নিলে। বেশী খরচও পড়ল না। আরও উমেদার আসতে লাগল। সোজা স্বর্গে ওঠবার সিঁড়ি, এ সুবিধা ছাড়াও শক্ত। গয়াসুরও ত এককালে এই রকম ক'রে খুব খাতির জমিয়েছিল। কিন্তু বাবাজীর নজর সর্ব্বসময়টা আমাদের ভিখারিণীর

উপর। তাকে মন্ত্রশিষ্যা না করতে পারলে তাঁর সন্তোষ হচ্ছে না রাস্তায় আলাপ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু মীরা আমল দেয় না নত হয়ে প্রণাম ক'রে এগিয়ে চলে যায়। তার কুঁড়েঘর মন্দির থেকে বেশী দূর নয়। একটু জোরে হাঁটলেই দুপাঁচ মিনিটে সেটুকু পথ পেরিয়ে যাওয়া যায়। কুটীরে মীরার কাছে থাকে এক বুড়ী বুড়ীও ভিখারিণী, তাকে মীরা আইমা বলে। সে খোঁড়া তাই ভিক্ষায় বের হতে পারে না। মীরা যা আনে দুজনে খায়। ইদানীং রোজগার বড় কমে গেছে। নূতনত্ব আর নেই, অনেকে গান শোনে কিন্তু ভিক্ষা দেয় না। বুড়ীকে মীরা বড় ভালবাসে। তার কাছেই সে অত সুন্দর ভজন গাইতে শিখেছিল। এ বছর অকাল পড়ায় মন্দিরের আসেপাসে অনেক ভিখারী জমেছে। তাই আমাদের মীরা আর তার আইমা পেট ভ'রে খেতে পায় না। এই কষ্ট দুঃখের মাঝে আবার জুটল এই বাবাজী। তার উৎপীড়ন এদের অসহ্য হয়ে উঠেছে। মায়ে ঝিয়ে এ সম্বন্ধে কত কথা হয়ে গেছে। বুড়ী বলে, "তুই আর কোথাও লুকিয়ে চলে যা, যেখানে রোজগারও বেশী হবে আর এই ভণ্ডের হাতও এড়াবি।" মেয়ে বলে, "আইমা, আমি তোকে ফেলে কি ক'রে যাব? আমি বিপদকে ডরাই না, আমার গিরধারী আছেন।" গেরুয়া বাবাজী তখন বেড়ার ফাঁক দিয়ে আড়ি পাতছিলেন, ভয়ে আঁতকে উঠলেন, "বাবা! এরা সহজ লোক ত নয়, আমায় চিনে ফেলেছে! আবার গিরধারী কে আছে, দাঙ্গা হাঙ্গামা না করলে বাঁচি!" এই ভেবে বৈদান্তিক স'রে পড়লেন।

যখন ব্যাপার এই রকম চলছে, একদিন মন্দিরে দুজন সম্ভ্রান্ত যাত্রী এলেন। তাঁরা সিন্ধু দেশের সওদাগর। অনেক টাকা দিয়ে ঠাকুর প্রণাম করলেন। পূজারীরা তাঁদের সারা মন্দির ঘুরে ফিরে

দেখালেন। তাঁরা মীরাবহিনকে নজর ক'রে দেখলেন। যাবার সময় বড় বণিক ছোটকে বললেন, "জেরামদাস, এ ছুঁড়ী ত বেওয়ারিশ মাল। হাত করার চেষ্টা কর না?"

জেরাম মাথা নেড়ে বললেন, "না শেঠজী, কাজ নেই। যোগী সন্ন্যাসীকে ঘাঁটিয়ে দরকার কি?. শেষে কি শাঁপমন্যি দেবে!"

টেকচাঁদ শেঠ হেসে উঠলেন, "জেরাম, তোমার মত ভয়তরাসে লোক আমি কোথাও দেখি নেই। একবার নিয়ে গিয়ে গাঁঠছড়া বেঁধে দিতে পারলেই ত হল। আমাদেরও লাভ, ওরও লাভ। বেচরসিংহকে বলি না খবর নিতে?"

আমাদের শেঠজীর ব্যবসা বাণিজ্যের ধারা পাঠক বুঝলেন ত? শিকারপুর শহরে এক দোকান ও গদী সত্যি আছে। কিন্তু তাঁর আসল ব্যবসা, লোককে ক'নে জোগান। সিন্ধের মরুভূমে অনেক জনবিরল জায়গায়, লোকে পয়সা দিয়ে মেয়ে কিনে বিয়ে করে। তারা মেয়ের কুলশীল, কি কন্যাকর্ত্তার নামধাম সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ করে না। টাকাটা ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে দিয়ে দেয় এই পর্য্যন্ত। টেকচাঁদের মত হুশিয়ার লোক কাকা, মামু, পিসে, মেসো সেজে, বছরে অনেক মেয়ে পার ক'রে দিত। বেশ দু পয়সা রোজগার হ'ত। মেয়ে ফুসলে বা ধ'রে আনবার জন্য একদল লোক পুষত।. তারা অধিকাংশই মাড়োয়ারী ওয়াগ্‌রী, কতকটা আমাদের বেদে জাতের মত। গাঁয়ে গাঁয়ে নেচে গেয়ে তারা ভিক্ষা মাগত, কখনও বা বেতের চুবড়ী পেতে ইত্যাদি তৈরী ক'রে বেচত। তাদের সর্ব্বত্র গতিবিধি ছিল। নজর ক'রে দেখে যেত, কাকে ফুসলে নিয়ে যাওয়া যাবে, কাকে ধ'রে নিয়ে যেতে হবে। এই ওগ্‌গরীদের সরদার ছিল বেচরসিংহ।

পরদিন বেচর মনিবের কাছে সব খবর সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এল। বললে, "শেঠ, ও ছুঁড়ী এদেশের নয়। অনেক তুঃখে নিজের ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে ভেক নিয়েছে। এক বুড়ীর সঙ্গে থাকে। সে ওর কেউ হয় না। মন্দিরে যে বাবু-সন্ন্যাসীটা বসে, সে কিছুদিন থেকে ছুঁড়ীর পেছনে লেগেছে। কাল সন্ধ্যাবেলা দেখলাম ওদের কুঁড়ের আসেপাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুড়ীর কথাবার্ত্তায় যা বুঝলাম, ওরা সাধুটাকে নিয়ে জ্বালাতন হয়েছে, পালাবার ফন্দী আঁটছে। কিন্তু ছুঁড়ী বড় শক্ত মেয়ে। আমার দ্বারা কিছু হবে না, শেঠ! কথাও কয় না, কোন দিকে চেয়েও দেখে না!"

টেকচাঁদ বললেন, "তোরা কোনও কাজের নয়। নিজেই দেখতে হল।"

সত্যি মীরাবহিন উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। পেটে খেতে পায় না, তার উপর স্বামীজীর উৎপাৎ। সেদিন সকালবেলা মন্দিরে বসতে যাচ্ছে, স্বামীজী এগিয়ে এসে খুব বৈদান্তিক ভাবে বললে, "মীরা, তোমার কুঁড়েতে একজন ওয়াগ্‌রী আনাগোনা করে কেন? এসব চিত্তবৃত্তিনিরোধের অন্তরায়।" ভিখারিণী কিছুই জবাব দিলে না। প্রণাম ক'রে নিজের ভজন গাইতে ব'সে গেল।

রাত্রি এক প্রহরে যখন পুঁথী বগলে ক'রে মন্দির থেকে বের হচ্ছে, তখন এক আধবয়সী সম্ভ্রান্তগোছের ভদ্রলোক এগিয়ে এসে তাকে বললেন, "মা, আমি দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। সারা সন্ধ্যা গান গেয়ে, তুটী আধলা বই রোজগার হল না। এতে তোমার চলবে কি ক'রে?" মীরা হাত জোড় ক'রে মাথায় ঠেকিয়ে, আকাশ পানে দেখিয়ে দিলে।

টেকচাঁদ বললেন, "ভগবান ত সবই দেন। কিন্তু মানুষের হাত দিয়ে দেন, জেনো।"

মীরা তখন কথা কইলে, "বাবা, আমি ভিখারিণী, একটা পয়সা দিন, গিরধারী আপনার মঙ্গল করবেন।"

শেঠ বললেন, "মা, আমি সিন্ধ দেশের মহাজন। তোমাকে আমি, আমার দেশে একটা বড় মন্দিরে বসিয়ে দেব। সেখানকার পূজারীরা আমার হাতে। যাবে আমার সঙ্গে? আর তা হ'লে অন্নকষ্ট থাকবে না। আমার দেশে মীরাবাইয়ের ভক্ত অনেক আছে।"

মীরা যেন একটু দোমনা হয়ে জবাব দিলে, "শেঠজী, আপনাকে দেখে আমার ভক্তি হচ্ছে। কিন্তু অনেক দিন এই মথুরায় আছি, এ মন্দির ছেড়ে যেতে মন সরছে না। একবার আমার আইমাকে জিজ্ঞাসা করব।"

"আমি সন্ধ্যাবেলা তোমার আইমার সঙ্গে কথা কয়ে এসেছি। তাঁর ইচ্ছা তুমি আজই আমার সঙ্গে যাও। কে একজন বাবাজীর কথা বললেন, তোমাদের নাকি বড় জ্বালাতন করছে?"

"আমায় কি আর জ্বালাতন করবে, বাবা? তবে আইমা একটু ব্যস্ত হয়েছেন। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।"

দুজনে মীরার কুঁড়েতে গেলেন। আইমা রাজী হলেন। শুধু রাজী হলেন কেন, বরং জোর ক'রে বললেন, "বাবা, তুমি নিয়ে যাও আজই ভোরের গাড়ীতে। আমাকে শীগ্‌গীর নিতে পাঠিও, আমি তৈয়ার থাকব।"

টেকচাঁদ বললেন, "আমার লোকজন ব্যবসাসূত্রে সর্ব্বদা এদিকে আসে। মীরাবহিন এক জায়গায় বসলেই, তোমাকে আনিয়ে নেব।"

স্বামীজী সবটাই দেখেছিলেন। তিনি দমে যাবার পাত্র ন'ন। যখন টেকচাঁদ কুঁড়ে থেকে বের হলেন, স্বামীজী এক ঝোপের পেছনে

লুকিয়ে। বেচর কোথায় দাঁড়িয়েছিল, এগিয়ে এল। তাকে শেঠ বললেন, "আজ ভোরের গাড়ীতেই। জেরামকে খবর দিস্।" ব'লে তিনি ধর্ম্মশালায় নিজের ডেরায় চ'লে গেলেন। স্বামীজী সব শুনলেন।

ভোরের গাড়ীতে এক সেকেণ্ড কেলাসে টেকচাঁদ উঠলেন। পাসে চাকরদের গাড়ীতে জেরামদাস, বেচর আর মীরা। শেঠের হুকুমে ভিখারিণী আজ ছোকরা সেজেছে। লাল পেড়ে ধুতি, হাঁটু পর্য্যন্ত ঝোলান ছিটের পিরান, আর মাথায় মলমলের টুপী। মোটে বে-মানান দেখাচ্ছিল না। মীরাকে শেঠ বলেছিলেন, "রাতবিরেতে রেলে যাওয়া, মেয়েছেলে নিয়ে অনেক ল্যাঠা। তুমি ধুতি পিরান প'রে নাও।" তার শেঠকে এত বিশ্বাস, আর তার সংসারের জ্ঞান এত অল্প, যে তার কোনও সন্দেহ হয় নেই।

এদের গাড়ীখানা থেকে দুই গাড়ী পরে এক থার্ড কেলাসে বৈদান্তিক বাবাজী চলেছেন। তিনি গেরুয়া ছেড়ে সাধারণ হিন্দুস্থানীর বেশে। তাঁর মোটামুটি মতলব চোরের উপর বাটপাড়ি।

রেলে খাবারের সঙ্গে কি খাইয়ে দিয়েছিল, তাই মীরা বেচারার সারা পথ এক রকম ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই কাটল। ভোর রাত্রে রেল-গাড়ী সিন্ধের রোহরী ষ্টেশনে পৌঁছল। তখনও মীরার ঘোর কাটে নাই। বাবাজী দেখলেন দুজন লোক মীরাকে ধ'রে নামিয়ে এক টাঙ্গায় বসালে। টাঙ্গা শহরের মাঝখানে এক ছোট বাড়ীর সদর দরজায় দাঁড়াল। একজন (জেরাম) নেমে দরজার তালা খুললে। তার পর মীরাকে নামিয়ে নিয়ে ভেতর থেকে আবার দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। স্বামীজী বাড়ীটা বেশ ক'রে চিনে নিয়ে

চ'লে গেলেন। ষ্টেশনে ফিরে অনেক খোঁজ ক'রেও টেকচাঁদের কোন পাত্তা করতে পারলেন না।

পরদিন সকালবেলা মীরা যখন জাগল, দেখলে যে সে এক ছোট্ট বাড়ীর রোয়াকে চারপাইয়ের উপর শুয়ে আছে। সামনে এক নামমাত্র উঠান, তার এক কোণে জলের কল ও চৌবাচ্চা। সদর দরজা ভেতর থেকে তালা লাগান। চারিদিকে উঁচু উঁচু বাড়ী, উঠান পর্যান্ত অন্ধকার। তার শব্দ পেয়ে জেরামদাস ঘর থেকে বেরিয়ে এল, একটু হেসে বললে, "চিড়িয়া, কেমন আছ? ছোলা দেব?"

মীরার একটু ভয় হচ্ছিল, কিন্তু নিজেকে বার বার বোঝাতে লাগল, "ছি, সন্ন্যাসিনীর ভয় করতে নেই।" মুখে বললে, "জেরাম ভাই, শেঠজী কোথায়? আমার মন্দির কতদূর?"

"তোর মন্দির যে কোথায় হবে তাই ঠিক হয় নাই। শেঠজী তাই ঠিক করতে গেছেন। শাঁসালো গোছের পূজারী চাইত!"

দুদিন গেল, তিনদিন গেল, শেঠজীর দেখা নেই। জেরামদাসও অনেক সময় বাড়ী থাকে না। যখন বের হয়, বেচরকে সেখানে বসিয়ে রেখে যায়। দুই একজন, দুই একজন ক'রে, বাইরের লোক সারাদিনই জেরামের সঙ্গে আসা যাওয়া করে। তারা অধিকাংশই হিন্দু। কখন কখন এক আধজন প্রকাণ্ড পাগড়ী বাঁধা, কাঁধে বোখারা রেশমের রঙ্গীন লুঙ্গী, লম্বা দাড়ী মুসলমান জমাদারও আসে। মীরার অন্য কাপড় ছিল না, সেই রেলের পোষাকই প'রে থাকত। জেরাম আগন্তুকদের গান শোনাতে বলত, কিন্তু মীরা কিছুতেই গাইত না, কথাও বড় একটা কইত না। একা থাকলে, বেশীর ভাগ সময় রোয়াকে ব'সে গুন্ গুন্ ক'রে ভজন গাইত আপন মনে।

সে বুঝতে পারছিল না যে কি হচ্ছে। জেরামের উপর তার কোন ভরসা ছিল না। টেকচাঁদকে বিশ্বাস করত, কিন্তু তাঁর ত দেখাই নেই। যখন বড় বেশী ভয় হত, লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত।

এই রকমে দুদিন কাটল। বাবাজী দিনের বেলায় বাইরে ডিটেক্‌টিবের মত পাহারা দেয়। কিন্তু ভেতরে আসবার কোন উপায়ই দেখতে পায় না। সে ক্রমশঃ মরিয়া হয়ে উঠছিল। কিন্তু জেরাম ও বেচরকে ভয়ও করে যথেষ্ট। রাত্রে অন্ধকারে পাহারা দিতে সাহস হয় না।

তৃতীয় দিনে সন্ধ্যাবেলায় জেরাম ফিরে এসে, বেচরকে ছুটী দিয়ে, সোজা মীরার সামনে গিয়ে বললে, "মীরা, তুই কাঁদিস্ কেন? মনে একটু ফুর্ত্তি কর। শেঠজীর ইচ্ছা তোকে কোন বড়লোকের ঘরে বিয়ে দেন। তা হলে তোর সব দুঃখ ঘুচবে।"

"জেরামভাই, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি শেঠজীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি সন্ন্যাসিনী, আমার বিয়ে কি ক'রে হবে? তুমি কি তা জাননা? তুমি যে মুসলমান জমীদার নিয়ে আসছ তাদের সঙ্গেও কি আমার বিয়ে দিতে চাও?" ব'লে মীরা কাঁদতে লাগল।

জেরাম আরও কাছে এল। মীরার কাঁধে হাত রেখে বললে, "দেখ্ মীরা, তোকে দেখে আমার মন মজেছে। তোর চোখের জল আমি সইতে পারি না। আমার সঙ্গে পালাবি? তা হলে কাউকে কিছু না ব'লে ভোরবেলাই স'রে পড়ি, চল্। আমায় তোর মনে ধরে ত? আমি তোকে সুখে রাখব। কত গয়না কাপড় দেব। চুলোয় যাক্ টেকচাঁদ।"

ভিখারিণী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "জেরাম ভাই, গিরধারীর জিনিসে লোভ ক'র না। তাঁকে তুমি কি চেন না? আমায় তুমি কি-ক'রে নেবে? আমার যখন মন হবে আমি আমার স্বামীর কাছে পালিয়ে যাব। শরীরটা থাকবে প'ড়ে। সেটা নিতে ইচ্ছা হয় নেবে।" জেরাম হো হো ক'রে হেসে উঠল।

সেই দিন গভীর রাত্রে সে উঠে পা টিপে টিপে মেয়েটার চার পায়ের কাছে গেল। দেখলে সে বেঘোরে ঘুমচ্ছে। তার মুখের উপর মুখ রেখে, দুহাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধ'রে জেরাম "মীরা, মীরা" ব'লে ডাকলে। মীরার মুখে কোন শব্দ নেই। চোখও খুললে না। তখন সে নাড়া দিয়ে দেখলে শরীরে কোন সাড়া নেই। ভয়ানক ভয় পেয়ে গেল। ভাবলে,

"এ কি হল? ছুঁড়ী ত তখনই বলেছিল, মরবে। সত্যি গেল নাকি? আমি কি শেষে খুনের দায়ে পড়লাম! সেই মথুরাতেই টেকচাঁদকে বলেছিলাম, বাবা, এ সব সন্ন্যাসী যোগিনী, ডাকিনী—" বলতে বলতে এক লাফে উঠে সামনের দোর খুলে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাল।

খানিক পরে মীরার জ্ঞান ফিরে এল। মনে হল যেন কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল। চেয়ে দেখে সামনের দোর খোলা। উঠে উঁকি মেরে দেখলে জেরাম বিছানায় নেই। বাড়ীতে সে একেবারে একা। কিছু বুঝতে পারলে না। সামনের দোরটা খিল দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

এদিকে জেরাম যখন ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়চ্ছিল তার কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ছিল না। সে বীর পুরুষ নয়। ভূত প্রেত, সন্ন্যাসী ফকীর, তন্ত্রমন্ত্র, হাঁচি টিকটিকি, নানা রকম জিনিসকে সে ভয় করত।

কিন্তু সব চেয়ে আতঙ্ক ছিল তার পুলিশকে। সে মাঝরাত্রে ঐ ভাবে খোলা মাথায় গেঞ্জি গায়ে দৌড়চ্ছে দেখে, এক ঘাটির পাহারাওয়ালা চেঁচিয়ে উঠল, "চোর, চোর।" জেরামের প্রাণ একেবারে খাঁচাছাড়া হল! সে এক ভীষণ ঠোক্কর খেয়ে ভুঁইয়ে প'ড়ে গেল। যেই পড়ল আর অমনি সেপাইও এক লম্ফে গিয়ে তার ঘাড় টিপে ধরলে। থানায় নিয়ে গেল। দারোগা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, কে সে, অমন ক'রে দৌড়চ্ছিল কেন, ইত্যাদি। জেরাম কোন কথাই কইল না। ভাবলে, "চুপ মেরে থাকাই ভাল। যদি ছুঁড়ীটা মরে গিয়ে থাকে ত এ ব্যাটারা আমারই মাথা নেবে!"

যখন কিছু কবুল করলে না, দারোগার হুকুমে সেপাইরা তাকে গুঁতো মেরে একটা ঘরের ভেতর বন্ধ ক'রে দিলে। অন্ধকারে দেখলে সে ঘরে তিন চার জন লোক রয়েছে। দুটী ছোট মেয়ে, তাদের সে চেনে না। কিন্তু অন্য দুজনকে দেখেই চিনলে। তারা টেকচাঁদের দলের ওয়াগ্‌রী চাকর। কথাবার্ত্তা কয়ে জানলে যে পুলিশ সহরের বাইরের এক বাগানবাড়ী থেকে তাদের সবাইকে সেই দিন ধ'রে এনেছে। জেরামের মাথায় নিজেকে বাঁচাবার এক ফন্দী গজাল। সে তখনই হাঁকডাক ক'রে বললে যে দারোগা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায়, কিছু পাত্তা দেবে। খানিক পরে দারোগার কামরায় ব'সে অনেক কথাই ব'লে দিলে। এটাও জানালে যে সম্প্রতি তার মনিব টেকচাঁদ, মথুরা থেকে একটী মেয়ে ধ'রে এনে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে; কোথায় রেখেছে তা একা টেকচাঁদই জানে। দারোগা বুঝলেন যে এই টেকচাঁদ যত নষ্টের গোড়া, তাকে জেলে পুরতেই হবে। কিন্তু সাক্ষী চাই আরও। একা জেরামের কথায় ত কোন

ফল হবে না। এই ভাবতে ভাবতে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। দেখেন যে গেরুয়া পরা এক হিন্দু ফকীর ব'সে আছে। লোকটা দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম ক'রে বললে,

"আমি মথুরা থেকে আসছি। আপনাদের এই জেলার টেকচাঁদ ব'লে এক সওদাগর, সেখান হতে একটী মেয়ে ফুস্‌লে এনেছে। তাকে লুকিয়ে রেখেছে। আমি তার পাত্তা ব'লে দিতে পারি।"

দারোগার আনন্দ দেখে কে! মেয়েটাকে পেলে, টেকচাঁদ ঠিক ঘায়েল হয়েছে! তাড়াতাড়ি সেপাই সান্ত্রী নিয়ে ফকীরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। ফকীর তাঁদের নিয়ে গেল শহরের মাঝখানে আমাদের জানা সেই ছোট বাড়ীতে। দারোগা জোরে জোরে সামনের দরজায় ঘা মারতে, একটী ছোকরা এসে খিল খুলে দিলে। দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর নাম কি রে, ছোকরা?" সে জবাব দিলে, "হুজুর, আমার নাম মীরচাঁদ, বাড়ী মথুরা।" দারোগা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "এ বাড়ী কার? এখানে একজন মেয়েকে লুকিয়ে রেখেছে?" জবাব পেলেন, "এ বাড়ীর মালিক আমার মনিব, শিকারপুরের টেকচাঁদ শেঠ। এখানে আমি একা আছি। কোনও মেয়ে নেই।" দারোগা সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে রেগে বললেন, "তুমি কি ঠাট্টা মস্করী করবার আর লোক পাও নেই? পুলিশের সঙ্গে চালাকী!"

বাবাজী মীরচাঁদকে চিনতে পারছিলেন না। ষ্টেশনে দূর থেকে এত কিছু ঠাহর ক'রে দেখেন নেই। মথুরার মন্দিরের গেরুয়া পরা মুখে ছাই মাখা সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে এর কোনও যোগ আছে তা মনে হচ্ছিল না। অথচ মুখখানা চেনা চেনা লাগল। বেচারা তাই

কিছু বললে না, বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল। মীরা কিন্তু বাবাজীকে দেখেই চিনেছিল। মনে মনে ঠিক করেছিল যে সে একটা কুমৎলবে এসেছে, কিছু বলা হবে না। তার তখনও বিশ্বাস যে টেকচাঁদ তার শুভানুধ্যায়ী। পুলিশকে তাই আর কিছু বললে না। থানাতল্লাসী ক'রেও আর কাউকে পাওয়া গেল না।

জেরামদাসের কোটের জেবে টেকচাঁদের এক চিঠি পাওয়া গেল। তাতে লিখেছে, "মথুরার মেয়েটার জন্য একটা ভাল মনিব আজও জোগাড় হয় নেই। একটু মোটা পয়সা না পেলে হাত ছাড়া করব না। খুব সাবধানে থাকবে।"

সন্ন্যাসীর সাক্ষী আর এই চিঠি, এই দুয়ের উপর নির্ভর ক'রে টেকচাঁদকে গেরেপ্তার করা চলবে। দারোগা হুকুম দিলেন, "ছোকরাটাকে হাতকড়ি লাগাও। ফকীরকে বাঁধবার দরকার নেই, নজরবন্দী রাখ। দুজনকে নিয়ে থানায় এস।"

থানায় পৌছে প্রথম কাজ শরীর তল্লাসী। তাই করতে গিয়ে মীরচাঁদের ছদ্মবেশ ধরা প'ড়ে গেল, সব কথা ফাঁস হয়ে গেল! দারোগা চোখ রাঙ্গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই সেই ছুঁড়ী! আমায় মিথ্যা কথা কেন বলেছিলি?" জেরামকে ডাকলেন। সে এসেই চেঁচিয়ে উঠল, "হুজুর, এই সেই ছুঁড়ী। একেই টেকচাঁদ মথুরা থেকে এনেছিল।" তার মহাফুর্ত্তি, ছুঁড়ীটা মরে নেই, ফাঁসীও যেতে হবে না।

জেরামকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে দারোগা মীরাকে বললেন, "দেখলি ত, টেকচাঁদ শেঠ কি রকম লোক। এই চিঠিখানা টেকচাঁদ জেরামকে লিখেছে, শোন্ আমি পড়ছি।" ব'লে চিঠিখানা পড়লেন।

"এখন সব কথা খুলে বল্। আমি সব লিখে নিচ্ছি।" মীরা পুরো এজাহার লেখালে। এ কথাও বললে, "ঐ সন্ন্যাসীটা যে বাহিরে ব'সে আছে, সে অতি দুষ্ট লোক। ও আমাকে নানা রকমে উত্যক্ত করছিল। ওর হাত থেকে বাঁচবার জন্যই আমি টেকচাঁদ শেঠের সঙ্গে সিন্ধ এসেছি। শেঠকে আমি খুব ভাল লোক মনে ক'রে বিশ্বাস করেছিলাম। উনি আমাকে এখানে এক মন্দিরে স্থান ক'রে দেবেন বলেছিলেন। সাহেব, এইবার ত আমি সব কথা বলেছি আমাকে ছুটী দাও, আমি মথুরা চ'লে যাই। তুমি ঐ বাবাজীকে ব'লে দাও, দারোগা সাহেব, আমাকে জ্বালাতন না করে। আমি বড় গরীব।"

দারোগা বাবাজীকে ডেকে তার এজাহার লিখে নিয়ে বললেন, "বাবু, তুমি কি রকম সাধু তা আমি জানতে পেরেছি। ভাল ক'রে সাক্ষী দাও, তারপর সোজা কলকাতা চ'লে যেও, নইলে তোমাকেও তুরঙ্গ ঠুকে আমি ছাড়ব।"

বাবাজী কেঁদে ফেললেন, তাঁর শিকারের সখ মিটেছে, দেশের জন্য প্রাণ কাঁদছে। জোড় হাত ক'রে বললেন, "দারোগা সাহেব, আমি ফকীর মানুষ, আমার উপর রাগ করবেন না। আপনি যা হুকুম করেন তাই করব।"

বারান্দায় গিয়ে বাবাজী ভিখারিণীর কাছে জোড় হাত ক'রে বললে, "মীরা, দোহাই তোমার, আর আমার নামে দারোগার কাছে লাগিও না। এই সব ব্যাপার জানাজানি হয়ে গেল; আমার আর এ অঞ্চলে পসার কিছুতেই জমবে না। আমি দেশে চ'লে যাচ্ছি।" ভিখারিণী হেসে বললে, "বাবাজী, গিরধারী তোমাকে সুমতি দিন।"

পরদিন টেকচাঁদ গেরেপ্তার হয়ে থানায় এলেন। তিনি দারোগাকে বললেন, "দারোগা সাহেব, আমার সঙ্গে পুলিশের কত দিনের দোস্তী, আর তুমি মিছেমিছি আমায় বে-আব্রু করলে? আমার মথুরায় চাকর দরকার হয়েছিল। মীরচাঁদকে আমার কাছে জেরাম নিয়ে এল, আমি তাকে পাঁচটাকা মাইনে কবুল ক'রে রাখলাম, এই ত আমার কসুর," ব'লে মীরার দিকে চাইলে একটু কাতর দৃষ্টিতে। মীরা তখন চোখ বুজে বসেছিল। চোখ বুজেই জবাব দিলে, "না এ কথা সত্যি নয়, শেঠজী। তুমি ত জান।" জেরামের সঙ্গে ত টেকচাঁদের সেই থানাতেই গালিগালাজ সুরু হয়ে গেল। দারোগা দুজনকে ধমক দিয়ে আলাদা আলাদা কুঠুরীতে বন্ধ করলেন।

যথা সময় মোকদ্দমা দায়রা সোপর্দ্দ হল। টেকচাঁদ পদস্থ লোক। অনেক পয়সা। তাই আদালত আজ লোকে লোকারণ্য। জেরাম যথাযথ সাক্ষী দিলে। শেষ জোড়হাত ক'রে জজকে বললে, "হুজুর, আমি সরকারের খয়েরখা তাবেদার, আমায় ছেড়ে দেওয়ার হুকুম হোক। আমি প্রথমেই টেকচাঁদকে বলেছিলাম, ডাকিনী যোগিনীর পেছনে লেগো না, চাষার মেয়ে যত চাও এনে দেব; তা শুনলে না। আমার প্রাণটা যেতে যেতে বেঁচে গেছে। হুজুর, ও ছুঁড়ী মন্ত্র জানে।"

মীরা সাক্ষী দিতে উঠে বললে, "আমার নাম মীরা, স্বামীর নাম গিরধারী, বয়স ১৭, পেশা ভিক্ষা, সাকীম মথুরাপুরী।" বাপ মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করায় বললে, "হুজুর, ভুলে গেছি। প্রথম স্বামীর নামও ভুলে গেছি। এখন বুঝছি যে এই গিরধারী চির-দিনই আমার স্বামী। বাইরে যে বাবাজী ব'সে আছে, আমি তারই

দেশের লোক।” সরকারী উকীল পীড়াপীড়ি করায় মীরা বললে, “আমার জীবনের সব কথা শুনে কিছু লাভ আছে কি? আচ্ছা, হুকুম করেন বলব। হুজুর, আমি বাঙ্গালী। ব্রাহ্মণের মেয়ে। নয় বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। যখন আমি দশ বছরের, আমার স্বামী বিদেশে মারা গেলেন, আমি তাকে চিনতাম না। আমরা থাকতাম দূর পাড়াগাঁয়ে। আমার শাশুড়ী আমাকে সাদা কাপড় পরিয়ে, আমার শাঁখা ভেঙ্গে, সিন্দূর মুছে আমার মাথা মুড়িয়ে দিলেন। কিছুই ত বুঝতাম না, হুজুর। মনে হল, সবাই বিনা কারণে আমার উপর জুলুম করছে। এত কাণ্ডের পরও বাড়ীতে আমার কোনও স্বস্তি ছিল না। শাশুড়ীর স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে আমি তাঁর ছেলেকে খেয়েছি। তাই উঠতে বসতে আমাকে “রাক্ষসী” “ডাইনী” ইত্যাদি বলতেন। হুজুর, আজ আমি বুঝেছি যে আমাকে আমার গিরধারীর মুখ চেয়ে সকল দুঃখ সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করতেই হবে। তখন তা বুঝতাম না। বাড়ী থেকে মাঝে মাঝে পালিয়ে গিয়ে নদীর ধারে ব’সে থাকতাম। ওঁরা ধ’রে এনে সাজা দিতেন। একদিন এক মাল বোঝাই নৌকায় লুকিয়ে চ’ড়ে বসেছিলাম। নৌকা অনেক দূর যাওয়ার পর ধরা পড়লাম। নৌকার মালিক এক ফেরৎ নায়ে আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দিলে। সেবার সাজাটাও বেশী কঠিন হল। শ্বশুর তাঁর হুঁকোর শিক উনোনে গরম ক’রে দিলেন। শাশুড়ী তাই দিয়ে পিঠে “ডাইনী” লিখে দিলেন। আমি বুঝলাম যে এঁদের প্রাণের ইচ্ছা আমি এঁদের বাড়ীতেই অবিলম্বে প্রাণটা দিই। আমার মাথাতেও ভূত চাপল। ঠিক করলাম কখনও এদের কাছে মরব না। দূরে অনেক দূরে কোথাও চলে যাব। মরি ত সেইখানে মরব। শেয়াল কুকুরের

দুদিন খিদে মিটবে। এই ভেবে একদিন রাত্রে বাড়ী ছাড়লাম। আমার বাপ মায়ের দেশ অনেক দূর। তাঁরা আমার কোনও খবরই নিতেন না। তাই সেখানে যাওয়ার চেষ্টাও করলাম না। সারা রাত হেঁটে দিনের বেলা এক ক্ষেতে লুকিয়ে রইলাম। আবার সারা রাত হাঁটলাম। এবার কিন্তু দিনের বেলায় ধরা পড়লাম। তখন আমার চলবার শক্তি নেই। খিদেয় শ্রান্তিতে মাথা ঘুরছে। সেইখানেই ভুঁইয়ে প'ড়ে গেলাম। যখন চোখ খুলল তখন রাত হয়েছে। এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে তক্তার উপর শুয়ে আছি। পাসে মেজের উপর বাড়ীর গিন্নী ব'সে রয়েছেন। আমার কাছে উঠে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "ভাল আছ বাবা?" আমি বলতে ভুলে গেছি যে আমি ব্যাটা ছেলের মত কাপড় প'রে বাড়ী থেকে পালিয়েছিলাম। আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম যে ভাল আছি। তিনি একটু গরম দুধ খাইয়ে আমায় শুয়ে পড়তে বললেন। বড় দুর্ব্বল বোধ হচ্ছিল তখনই ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর বেলা উঠে উঠানে গেলাম। গায়ে পায়ে ভয়ানক ব্যথা, ব'সে পড়লাম। অল্পক্ষণের মধ্যে বাড়ীর কর্ত্তা বেরিয়ে এলেন। গিন্নীকে ডেকে বললেন, "ছেলেটাকে একটু দুধ দাও।" যেমন কর্ত্তা তেমনই গিন্নী। দুজনেই হাসিমুখ, নধর গড়ন। কর্ত্তা জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে, তোমার নাম কি? আমার ক্ষেতে কাল অমন ক'রে পড়েছিলে কেন?"

আমি উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে আমার নাম রাধা। আমায় বাড়ীতে বড় মারে তাই পালিয়ে যাব ব'লে বেরিয়ে এসেছি।"

"কাদের ছেলে তুমি? কোন গাঁয়ে বাস? বাড়ীতে একটু মারধর করেছে ব'লে একেবারে উধাও হয়েছ! এ ত ভাল কথা নয়।"

"আজ্ঞে, আমি আমার পরিচয় কিছু দেব না। আপনার ইচ্ছা হয় মেরে তাড়িয়ে দিন। পিঠ দেখুন, বুঝতে পারবেন যে মারধর একটু নয়।" পিঠ খুলে দেখালাম ছ্যাঁকার দাগ, আরও কত কি দাগ।

ভদ্রলোক চুপ ক'রে গেলেন। চোখ দুটী যেন ছলছল ক'রে এল। গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললেন, "আচ্ছা রাধা আমি কিছুই জিজ্ঞেস করব না। তুই থাক্ এখানে। আমরা কায়স্থ। তুই কি জাত?" আমি অম্লান বদনে জবাব দিলাম যে আমিও কায়স্থ।

গিন্নী এলে কর্ত্তা তাঁকে সব বললেন। গিন্নী আমার দাড়িতে হাত দিয়ে বললেন, "তা থাক্ বাছা তুই এখানে। গোবিন্দের কৃপায় আমাদের কোন অভাব নেই। তোকে দুমুঠো ভাত দিতে পারব।"

আপনার জন আপনার জাত ত্যাগ ক'রে আশ্রয় মিলল। আমি যে রাধারাণী, রাধাচরণ নই একথাটা সযতনে লুকিয়ে রাখলাম। কয়েকমাস কেটে গেল বড় সুখে বড় আদরে। গিন্নীর ঠাকুরঘরে ৺গোবিন্দ ছিলেন। তাঁর নিত্য সেবার সমস্ত জোগাড় আমিই দিতে লাগলাম। কর্ত্তার সঙ্গে কখন কখন মাঠে যেতাম। গরুর যত্নের ভারও আমি নিলাম। দিন দিন এঁদের উপর আমার মায়া বেড়ে যেতে লাগল। কিন্তু কেবল ভাবতাম, যেদিন ধরা পড়ব যে আমি রাধারাণী সেদিন আমার দশা কি হবে।

একদিন শুনলাম কর্ত্তা গিন্নী বলাবলি করেছেন যে দুচার দিনে কাশী যাবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মা, আমার কি ছুটী হবে?" গিন্নী হেসে বললেন, "তুই না গেলে আমাদের দেখবে কে?"

কয়েকদিন পরে তিনজনে কাশী গেলাম। আমরা বাঙ্গালীটোলায় এক ছোট বাড়ী ভাড়া ক'রে ছিলাম। একমাস বেশ কাটল।

সন্ধ্যাবেলায় কাছে এক মন্দিরে বড় সুন্দর ভজন গান হত। সেখানে আমি প্রায়ই যেতাম। কখনও কর্ত্তা গিন্নীর সঙ্গে কখনও বা একা। আমি একটু একটু গাইতে পারতাম ব'লে দেশে গোবিন্দের কাছে গিন্নী আমায় প্রায়ই কীর্ত্তন গাইতে বলতেন। কাশীতে আমাকে হুকুম করলেন মিষ্টি মিষ্টি ভজন দুচারটে শিখে নিতে। তাই আমি রোজ যেতাম সেই মন্দিরে। যাঁরা গাইতেন তাঁদের মধ্যে একজনের নাম কিষণ পিয়ারী। তিনি আমায় বড় ভালবাসতেন। দুই একটা গান শিখিয়েছিলেন আর আমায় প্রায়ই তাঁর সঙ্গে আস্তে আস্তে গাইতে বলতেন।

এই রকম ক'রে দিন যাচ্ছে এমন সময় একদিন গিন্নীমা আমায় ঘরের ভেতর ডেকে নিয়ে গিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, "রাধা, তুই ছেলে না মেয়ে? আমার চোখে ধূলো কতদিন দিবি? আমি কর্ত্তাকে কিছু বলি নেই এখনও। কিন্তু আমি তাঁর কাছে কখনও কথা লুকোই না। তুই কেন আমাদের ঠকালি?"

আমি গিন্নীমার পায়ে হাত দিয়ে বললাম, "মা, আমার অপরাধ নিও না। আমি বামুনের মেয়ে, বিধবা। অনেক দুঃখে প'ড়ে রাস্তায় বেরিয়েছি। আমিই কর্ত্তামহাশয়কে বলব। পায়ে পড়ি তুমি কিছু বল না।"

বড় লজ্জা হল কর্ত্তাকে বলতে পারলাম না। কিন্তু কতদিন আর ছেলে সেজে বেড়াব? প্রকাশ ত একদিন হবেই তখন এঁরা কত লজ্জা পাবেন। দরকার নেই গোলমালে, আবার পালাব। সন্ধ্যাবেলা কিষণ পিয়ারীর কাছে চুপি চুপি সব বললাম। তিনি হেসে উঠলেন, "তাই বল্! রাধারাণী! আমি কেবলই ভাবতাম এত মিষ্টি গলায় কি ক'রে ডাকিস্।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কাকে ডাকি

মাজী ?" "সে তোকে চিনিয়ে দেব, রাধা। কিন্তু এখন তুই কি করবি বল্‌ত ?" "আমি আর বাড়ী যাব না। তোমার কাছে আমায় রাখবে ?" "হ্যাঁ রাখব রাধা। তোকে আমার সব ভজন শেখাব। আর তোর মুখের মধুর গান শুনে প্রাণ জুড়াব।" রাত্রে আইমা আর আমি কাশী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কত তীর্থ ঘুরলাম, কত দেশ দেখলাম দুজনে। আইমা আমায় ধীরে ধীরে পৌছে দিলেন গিরধারীর চরণে। আমার ত কিছুই দেবার ছিল না তাঁকে, গৃহহীন ভিখারিণী আমি, তবু তিনি আমায় ফিরিয়ে দিলেন না।"

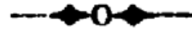
"জয় গিরধারী," ব'লে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলতে আরম্ভ করলে, "হুজুর, পাঁচ বছর এই রকমে কেটে গেল। একদিন চিতোর গড় থেকে নামবার সময় আমার আইমা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। দু পায়েই চোট লাগল। অনেক কষ্টে ধর্ম্মশালায় নিয়ে গিয়ে সেকতাপ করলাম। ঔষধ লাগালাম কত রকমের কতদিন ধ'রে। কিন্তু পা আর সারল না। তাঁর চলা ফেরা বন্ধ হয়ে গেল। গিরধারী আমাকে নূতন ক'রে পরীক্ষা করতে লাগলেন। দুয়েক জায়গা ঘুরে শেষ মথুরা এলাম। সেখানে গোপাল মন্দিরের উঠানে ভজন গেয়ে ভিক্ষা মাগতে ব'সে গেলাম। প্রথম প্রথম যা পেতাম দুজনের খাওয়া চ'লে যেত। কিন্তু ক্রমশঃ আয় কমে গেল। শেষ একবেলা আধপেটা বই জুটত না। গিরধারীকে আমরা কত ডাকতাম। যখন বাঙ্গালী বাবাজী এসে লোভ দেখালে চিনতে পারলাম তাকে। কিন্তু টেকচাঁদকে চিনতে পারি নেই। মনে করেছিলাম গিরধারী তাকে পাঠিয়েছেন আমার দুঃখ ঘোচাবার জন্য। আবার পরীক্ষা হল। এবার বুঝেছি, সাহেব, সব কথা। শরীরটা নিয়ে অনেক ভাবনা ভাবতাম। আজ জেনেছি এ শরীর ত আমার

গিরধারীর নয়, তাঁর যা তিনি নিয়েছেন। এই শরীরটার জন্য ঐ বাবাজী, জেরাম এরা মারামারি কাটাকাটি করছে। এর উপর আর আমার মায়া নেই। এই আমার এজাহার হুজুর। এখন হুকুম ক'রে দিন আমি মথুরা চ'লে যাই।"

মোকদ্দমা শেষ হল। টেঁকচাঁদের সাত বছর কয়েদ হুকুম হল। বেচরসিংহ ফেরারী। জেরাম সরকার তরফে সাক্ষী দিয়েছে ব'লে ছাড়া পেলে। বাবাজীকে দারোগা খুব শক্ত তাকিদ দিয়ে দিলে যে সোজা তার বাঙ্গলা দেশে ফিরে যায়; এ দেশে আর তার বীজমন্ত্র দিয়ে কাজ নেই।

মীরা মথুরা ফিরেছে। সেই গেরুয়া সাজে আবার মন্দিরে ভজন গাইছে। গলা যেন আগের চেয়েও মিঠে হয়েছে। পূজারী ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মীরাবহিন, কোথায় গেছলে?" মীরা জবাব দিয়েছিল, "বৃন্দাবনে, আমার নন্দদুলালের সন্ধানে।"

চাষার বুদ্ধি



আমরা শহরের বাসিন্দা। বিজলীর পাখা আলো, ট্রাম বাস্, পুলিশ হাইকোর্টের মাঝে থাকি। একটা ঠোক্কর খেলে ডাক্তার-বাড়ী দৌড়াই, কেউ চোখ লাল ক'রে কথা কইলে লালপাগড়ীর ছাতার নীচে দাঁড়াই। অকারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা ক'রে বলক্ষয় করতে হয় না। ডাক্তার বাবুকে দর্শনী, আর লালপাগড়ীকে (দর্শনী বলব না) মিষ্টি কথা জোগাতে পারলেই কাজ হাসিল। কিন্তু সাহেবদের এই রাজ্যের মধ্যেই এমন কত জায়গা আছে যেখানে সালিয়ানা জমীর খাজনা আর মাঝে মাঝে দারোগা সাহেবকে এক আধটা খাসী মুরগী দিতে পারলেই আর কোন ল্যাঠা থাকে না, কে রাজা কে বাদশাহ তা কেউ জানতেও পারে না। শুনতে পাই, গান্ধীজীর উদয়ের পর এখন আর এ রকম অন্ধকার স্থান বেশী নেই। হবেও বা, কিন্তু আমি যখন ঘুরে বেড়াতাম তখন ঢের ছিল।

অনেক বছর আগের কথা বলছি। আমি তখন দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে হাকিমী করি। আইন বিদ্যা সে রকম কখনও শিখি নেই, কাজেই কাজীর বিচারটা খুব রপ্ত করেছিলাম। প্রজারা যে তা'তে বেশী নারাজ ছিল তা নয়। বরং খুশীই ছিল যে এমন হাকিম পেয়েছে যার কাছে লেখা-দরখাস্ত না নিয়ে গিয়েও আমল পাওয়া যায়। একদিন আমি আমার ডেরা থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছি। এক গ্রামের বাহির দিয়ে টাঙ্গায় চড়ে চলেছি। গ্রামখানা বেশ

বড় মনে হচ্ছিল। তবে চারিদিকে গড় প্রাচীর দিয়ে এমনি ঘেরা যে ভেতরের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। পাহাড়ে দেশ হলেও রাস্তাটা মন্দ ছিল না, তাই আমি খুব জোরে চলেছিলাম। হঠাৎ রাস্তার পাসের ঝোপগুলো থেকে একজন ছোকরাগোছের লোক দৌড়ে বেরিয়ে আমার গাড়ীর সামনে শুয়ে পড়ল। একটু হলেই তার ইহজন্মের লীলা শেষ হত। আর, আমার রথের নীচে প্রাণ দিয়ে কিছু সে জন্মান্তরের হাত এড়াতে পারত না। সব রকমেই বেচারার লোকসান হয়ে যেত। যা হোক, আমি গাড়ীর মধ্যেই দাঁড়িয়ে উঠে প্রাণপণে রাশ টেনে, ঘোড়া দুটোকে পেছনের পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে দিলাম। লোকটা বেঁচে গেল। গাড়ীর একটা চাকা এক পাথরের উপর চড়ে যাওয়াতে আমরা কাত হয়ে গেলাম, কিন্তু উলটে পড়লাম না। সহিস লাফিয়ে নেমে ঘোড়া ধরতেই আমিও চট্ ক'রে নেমে পড়লাম। প্রথম কাজ হল লোকটার কান ধ'রে তাকে খাড়া করা। তারপর, হাতে ছিল এক গণ্ডারের চামড়ার ছড়ি, সেইটে তার পিঠে ভাঙ্গবার চেষ্টা, কোন কথা না কয়ে। কাজটা গর্হিত, কিন্তু স্বাভাবিক নয় কি? লোকটার আমার হাতে মরবার আগে আমায় একবার জিজ্ঞাসা করাটা উচিত ছিল ত? মোটের উপর কিন্তু ঘা দুই বেত লাগাতেই আমার রাগ অন্তর্হিত হল।

বেত নামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম, কে সে, কি চায়, কেনই বা মূর্খের মত নিজের প্রাণটা দিতে বসেছিল। তা'তে লোকটা হতাশভাবে বললে, "আমার উপর দিয়ে টাঙ্গা চালিয়ে দিলে না কেন, সাহেব? আমার যা দুর্দ্দশা হয়েছে আর আমার নিজের গাঁয়ে মুখ দেখাবার জো নেই।" "কেন, তুই কে? কোন গাঁয়ে

তোর বাস ?" জানলাম তার নাম তুকারাম, জাতে কুনবী, বাড়ী মোগলাইতে (নিজাম রাজ্যে) বেগমপুরা গ্রাম।

আমি আবার তাকে প্রশ্ন করলাম, "সেত অনেক দূর। এখানে কেন এসেছিস্? আর তুই নিজামের প্রজা, আমাদের কাছেই বা কি চাস্?" তুকারাম উত্তর করলে, "আমার সর্ব্বনাশ করেছে তোমার এই গাঁয়েরই এক বামুন ইনামদার। ওদের পেশোয়াই ত অনেকদিন গেছে। আজও বামুনরা যা খুশী করবে? তুমি হাকিম, পরদেশী লোক, বামুনের বিচার তুমি করতে পারবে। দয়া কর, রাও সাহেব।"

আমার একটা বড়াই ছিল যে মরাঠী খুব বলতে পারি, কিন্তু এ হতভাগা দুচার কথাতেই ধ'রে ফেললে আমি পরদেশী লোক, একটু রাগ হল। কিন্তু অত্যাচারী ইনামদারের নাম শুনে শিকারী কুকুরের মত দুকান খাড়া হয়ে উঠেছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে তোর খুলে বল দেখি, এ গাঁয়ের সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক?" তুকিয়া বললে, "আমি এই গাঁয়ে বিয়ে করেছি। শ্বশুর নেই শাশুড়ী আছেন। তিনি আমার স্ত্রীকে আমার কাছে পাঠাতে চান না।" আমি চ'টে গেলাম, "তুই কি মনে করেছিস আমার কাজ লোকের মেয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠান? তোর পরিবারকে তোর শাশুড়ী আটকে রেখেছে তাতে ইনামদারের কি দোষ?"

লোকটা কাঁদতে লাগল, "রাগ করবেন না, রাও সাহেব। আমার শাশুড়ীকে আমি ঠিক বাগাতে পারতাম। কিন্তু তাঁর পেছনে ইনামদার রামরাও দেশপাণ্ডে, আর গাঁয়ের পাটিল রঘুজী কদম দুজনেই আছে। কাল আমাকে দেশপাণ্ডে জুতোপেটা ক'রে গাঁ থেকে বের ক'রে দিয়েছে। পিঠের অবস্থা দেখ। এর

উপর আর তোমার দু'ঘা বেত কি করবে সাহেব? সারারাত গাছতলায় পড়েছিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোর স্ত্রীর বয়স কত? কখনও তোর সঙ্গে ঘর করেছে?" জবাব পেলাম, "আজ্ঞে, তার বয়স পনের বছর। আর বছর আমার সঙ্গে যাবার কথা ছিল। পাঠালেনা, ফিরে গেলাম। আমার গাঁয়ের লোক আমায় কত টিটকিরী দিলে। এ বছর তারা শাসিয়ে রেখেছে যে বৌ না নিয়ে যেতে পারলে আমার ধোবা নাপিত বন্ধ করবে। এখন কোথায় যাই, রাও সাহেব?"

আমি বললাম, "তুই জাতে মরাঠা কুনবী না? শাশুড়ী পরিবারকে পাঠালে না তাই পরিবারকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজে অপঘাতে মরতে গেছলি। খুব বাহাদুর জোয়ান তুই!"

"না সাহেব, আর মরতে যাব না। তুমি বাঁচিয়ে দিয়েছ। এবার ব্যাটাদের গাঁ জ্বালিয়ে দিয়ে পালাব, নিজের দেশেও যাবনা। শোলাপুরে কলে মজুরী ক'রে খাব।"

"না, তুই ভারী মরদ লোক, তোকে গাঁ জ্বালাতে হবেনা, এইখানে গাছতলায় বস্। আমি ডাকতে পাঠালে গাঁয়ে আসবি।"

"আবার জুতো মারবে না ত?"

"সে আমি বুঝব। তুই ব'সে থাক চুপ ক'রে। কথা না শুনলে কিন্তু আমিই জুতো লাগাব।" লোকটা একটু দোমনা হয়ে গাছতলায় বসল।

আমি গাঁয়ের দরওয়াজার দিকে গাড়ী ছোটালাম। পথে পড়ল মহারবাড়া (আমাদের বাগদীপাড়ার মত)। সেখানে এক

বুড়ী মহারীন বেরিয়ে এসে আমার গাড়ী থামালে, বললে, "মোগলাইয়ের তুকিয়া ছোঁড়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সাহেব? রামা দেশপাণ্ডে বৌ ছুঁড়ীটার পেছনে এমনি লেগেছে যে গাঁ শুদ্ধ লোক ছি ছি করছে। মেয়েটা নিতান্ত ভাল তাই আজও ঘায়েল হয় নেই। কিন্তু কদিন, সাহেব? যে ডাইনী ঐ পার্ব্বতী কুনবীন, ছুঁড়ীটার মা, মেয়েকে না খেয়ে শান্ত হবে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "পাটিল কিছু জানেনা?"

"সে আবার জানে না! রঘু পাটিলটা কি একটা মানুষ? তাকে ঐ বামনা এমনি ধমকে দিয়েছে যে সে ভয়ে চুপ ক'রে আছে। নইলে গাঁয়ের পাটিল সে, নিজের জাতের একটা ছুঁড়ীকে বামুনের কাছে বিকিয়ে দিচ্ছে? কাল আমাদের এরা তোমার তাঁবুতে চৌকী দিতে গেছল শুনে এসেছে তুমি এই পথ দিয়ে আজ যাবে। তাই ত তুকিয়াটাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম রাস্তার উপর। একটা গতি ক'রে দে, বাবা।"

এতক্ষণে কথাটা বেশ বুঝলাম। রঘু পাটিলকে এক আধবার আগে দেখেছিলাম, লোকটা আস্ত গাড়ল।

গাঁয়ের ফটক খোলাই ছিল। ঢুকেই বাঁদিকে পাটিলের কাছারী, যাকে চাওড়ী বলে। সেখানে সারি সারি গোটা ছয়েক ঢাল তলওয়ার ঝোলান রয়েছে। তুজন চৌকীদার কম্বল পেতে প'ড়ে আছে। আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠল। আমি হাকিমী গলায় হুকুম দিলাম, "রঘু পাটিলকে ডাক্। আর গাঁয়ের লোক জমা কর্, বল্ প্রান্ত (মহকুমা) সাহেব এসেছেন।" পাটিল তাড়াতাড়ি এক মস্ত পাগড়ী বাঁধতে বাঁধতে এল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে গ্রামে কেউ পার্ব্বতী কুনবীন থাকে কিনা।

পাটিল বললে, "একজন বুড়ী ঐ নামের আছে, সাহেব; কিন্তু তার ত কোনও জমীজমা নেই।"

সে মনে করেছিল আমি নিত্য প্রথামত খাজনা আদায় সংক্রান্ত কাজে এসেছি। আমি বললাম, "তার একটী মেয়ে আছে না? সেই মেয়েকে আমি দেখিতে চাই।"

বোধ হয় বেচারা সন্দেহ করলে যে ব্যাপারটা ঠিক সোজা নয়, জবাব দিলে, "আজ্ঞে তাকে নিয়ে আসছি এখনই। কিন্তু বোধ হয় ক্ষেতে কাজ করতে গেছে।"

আমি একটু রুক্ষস্বরে বললাম, "তোমার গিয়ে কাজ নেই তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে থাক।" দেখতে দেখতে গ্রামের রাইয়ৎ জমা হতে লাগল। আমি একজন বুড়োমত লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, "পার্ব্বতী কুনবীন আর তার মেয়ে, কার বাড়ীতে থাকে?" একজন কুনবী এগিয়ে এসে বললে, "আজ্ঞে, আমার বাড়ীতে থাকে। আমি পার্ব্বতীর ভাই ইঠু।" লোকটা রোগা, কালো, বেঁটে, চোখদুটো ভয়ানক ধূর্ত্তের মত।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোর বাড়ী থাকে কেন? তার শ্বশুর বাড়ী কোথায়?"

সে উত্তর দিলে, "শ্বশুর বাড়ী দশ পনের ক্রোশ দূরে। সেখানে কেউ নেই, বছর দশেক হল আমার কাছেই আছে। স্বামী কিছুই রেখে যায় নেই। মজুরী ক'রে খায়।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "মেয়েটার বিয়ে হয়েছে?" সে উত্তর দিলে, "বিয়ে হয়েছে আজ বছর তিন চার। বয়সও ১৫ বছর হল। কিন্তু এমন হতভাগা স্বামী, তার খোঁজও করে না।"

"আচ্ছা, আমার সঙ্গে তোমার বাড়ীতে এস." এই কথা ব'লে আমি ইঠুর বাড়ীতে গেলাম। সেখানে তার বোন পার্ব্বতীর সঙ্গে পরিচয় হল। বুড়ী হলেও কুশ্রী নয়। কিন্তু এমন রুক্ষ মুখের ভাব, এমন রূঢ় কথাবার্ত্তা যে তাকে মোটে ভাল লাগল না। মেয়ে জানকীকে কোথাও পাওয়া গেলনা।

পার্ব্বতী আমার মুখের উপর বললে, "আমি কি জানি? আমি কি অত বড় মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াই নাকি?"

ভাই ভগ্নীকে চাওড়ীর দিকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি একটু এদিক ওদিক বেড়াতে লাগলাম। এক বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় একজন ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে (ওদেশে দেখলেই চেনা যায়) বেরিয়ে এসে বললেন, "সাহেব, তুমি জানকী কুনবীনকে খুঁজছ? ওর একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে যেও। রামচন্দ্র দেশপাণ্ডের খামারের কাছে যে ইঁদারা আছে সেইখানে লোক পাঠাও, জানকীকে পাবে। রামচন্দ্র নিজে তাকে আগলাচ্ছে। আমি এই দেখে এলাম। জানকীর স্বামী কাল গাঁয়ে এসেছিল তাকে নিতে। প্রাণের ভয়ে পালিয়েছে।"

আমি কিছুই বললাম না, নমস্কার ক'রে চাওড়ীর দিকে গেলাম। ব্রাহ্মণীটী বোধ হয় দেশপাণ্ডেদের বাড়ীর মেয়ে, ঢলাঢলি দেখে উত্যক্ত হয়েছেন। চুপি চুপি আমার সহিসকে একজন চৌকীদারের সঙ্গে দেশপাণ্ডের খামারে পাঠিয়ে দিলাম। চাওড়ী পৌঁছেই পাটিলকে এক জোরে চড় মেরে চেঁচিয়ে ধমকে উঠলাম, "তুমি সরকারী লোক, তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা! এই সব পেজোমির প্রশ্রয় দিচ্ছ?"

লোকটা অত্যন্ত বোকা। ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে উঠল, "আমি কিছুই জানিনা, সাহেব। ওদের মেয়ে, ওরা তাকে শ্বশুরবাড়ী না পাঠালে আমার কি কসুর, হুজুর?"

আমি বললাম, "তুই তা হলে জানতিস্ যে মোগলাই থেকে তুকারাম আর বছর এসেছিল, এবছরও এসেছে, পরিবার নিয়ে যেতে?"

পার্ব্বতীর চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছিল। সে চীৎকার ক'রে উঠল, "বল্‌না রঘু কদম, আমার মেয়ে আমি আটকে রাখব তাতে কার কি?"

পার্ব্বতীর ভাই হাত জোড় ক'রে বললে, "রাও সাহেব, ও মেয়েমানুষ ওর কথায় রাগ করবেন না। আমাদের অনেক পাওনা আছে, জামাই সেটা চুকিয়ে দিলেই মেয়ে পাঠাতে পারি।"

আমি যেন কিছুই শুনছিনা এইভাবে পাটিলকে আবার প্রশ্ন করতে লাগলাম, "তুকারামকে কাল মারধর করেছে দেশপাণ্ডে, সে কথা তুই জানতিস্ না? রিপোর্ট করেছিস্ থানায়?"

দেশপাণ্ডের নাম শুনেই রঘু পাটিল ভুঁইয়ে ব'সে পড়ল। বোধ হয় মনে করলে সব কথা ফাঁস হ'য়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "হুজুর, এই ইনামদারগুলো কি সরকারকে মানে? আমি গরীব কুনবী মানুষ, আমায় দয়া কর বাবা। আমি সরকারের গোলাম।"

এমন সময় আমার সহিস দেশপাণ্ডেকে নিয়ে উপস্থিত হল। আমি একটু কড়া স্বরে বললাম, "রামচন্দ্র রাও, আমি গ্রামে এসেছি, আপনি কি হাজির হওয়া দরকার মনে করেন নেই? কোথায় ছিলেন আপনি?"

"রাওসাহেব, আমি কিছুই জানতাম না। নিজের খামারে ছিলাম। আপনার ঘোড়াওয়ালা এত্তলা দিতেই ছুটে এসেছি।"

হায়দার সহিসকে জিজ্ঞাসা করলাম "হ্যাঁরে, দেশপাণ্ডে রাও সাহেবের সঙ্গে কেউ ছিল?"

"হ্যাঁ হুজুর, এক কুনবীন ছুড়ী ছিল, এই যে চৌকীদারের সঙ্গে এসেছে।"

আমি দেশপাণ্ডেকে বললাম, "পাটিলকে আমি মার লাগিয়েছি। দেখুন ব'সে কাঁদছে। আপনাকে রাইয়তদের সামনে বেইজ্জৎ করতে চাইনা। কিন্তু সোজা জবাব দিন, এ মেয়েটী কে? আপনার কাছে কি করছিল?"

"ঐ মেয়েটা? ও পার্ব্বতী কুনবীনের মেয়ে জানকী। পার্ব্বতী আমার খামারে রোজ মজুরী করতে যায়, আজ যায় নাই। মেয়েটাকে পাঠিয়েছিল, তাকে কাজ দেখিয়ে দিচ্ছিলাম।"

"পার্ব্বতীর জামাইকে তুমি চেন, ইনামদার সাহেব?"

রামচন্দ্র দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, উন্নত ললাট, চেহারা সুন্দর, কতকটা নানা ফড়নবীশের ছবির মত দেখতে। সে মুখ তুলে আমার মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে বললে, "সাহেব, ছোটলোকদের মুখ আমি ভাল মনে রাখতে পারি না। হয় ত কখনও দেখে থাকব।"

আমি আমার সহিস ছোকরাকে বললাম, "যা ত রে, সেই তুকারাম ছোঁড়াকে ডেকে আন। রাস্তার ধারে গাছতলায় ব'সে আছে। একজন চৌকীদার সঙ্গে যা।"

গাঁয়ের লোকের সঙ্গে নানারকম অন্য কথাবার্ত্তা কইতে লাগলাম চাওড়ীর দাওয়ায় ব'সে। দেশপাণ্ডে মুখ ভার ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

যখন তুকারাম এল তাকে বললাম, "তোর পরিবারকে নিয়ে যা। দেখি কে তোকে আটকায়।" পাটিল আবার হতাশ-ভাবে ব'সে পড়ল।

ইনামদার চাওড়ীর ছাদের উপর দিয়ে দূরে একটা গাছের মাথায় এক জোড়া ঘুঘু বসেছিল তাই দেখতে লাগলেন। কিন্তু পার্ব্বতী বাঘিনীর মত মেয়ের সামনে এগিয়ে এসে বললে, "হারামজাদা, ভিখারী, আমার পয়সা বুঝিয়ে দে, তবে আমার মেয়ে নিয়ে যাবি। খেতে পায় না, ওর আবার পরিবার নিয়ে ঘর করবার সখ!"

আমি তুকারামের দিকে চাইতেই সে ব'লে উঠল, "কিসের পয়সা? বিয়ের সময় ৭৫৲ টাকা হুণ্ডা (পণ) নগদ গুণে দিয়ে গেছি। এই রঘুনাথ রাও পাটিলও দেখেছে। বল না পাটিল, বাবা।" পাটিল ঘাড় নেড়ে কবুল করলে।

পার্ব্বতী এগিয়ে এসে হাত নেড়ে বললে, "তার পর তু তিন বছর যে নিতে আসিস্ নাই, আমি সমানে তোর পরিবারকে খাওয়াচ্ছি, সে পয়সা কে দেবে? আমার পয়সা কড়ায় গণ্ডায় না বুঝিয়ে দিলে তোমার পরিবারকে নিয়ে ঘর করা বের করছি।"

তুকারাম এই চীৎকারে যেন কাবু হয়ে যাচ্ছিল, আমার দিকে কাতরভাবে তাকিয়ে বললে, "সাহেব, তু বছর ত বৌ ছোট ছিল। তারপর আমার দেশে আকাল পড়েছিল তাই আমাকে মজুরী করতে অন্যত্র বেরিয়ে যেতে হয়েছিল। একটু গোছগাছ ক'রেই গেল বছর এসেছিলাম, কিন্তু এরা মেরে তাড়িয়ে দিলে।"

ইঠু মামা একটু হেসে বললে, "তা বাবা, তুই খোরাকীবাবৎ কিছু টাকা আমায় দিয়ে যা না, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

আমি বললাম, "আমি টাকা কড়ির কথা কিছু জানি না, কিন্তু তুকারাম যদি তার বৌকে নিয়ে যায় ত আমি দাঁড়িয়ে দেখব যে কেউ বাধা দিতে না পারে। জানকী সামনে আয়। তুই যাবি তোর মানুষের সঙ্গে?"

জানকী মুখ নীচু ক'রে নথ খুঁটতে খুঁটতে বললে, "হ্যাঁ সাহেব, আমাকে নিলেই যাব। এখনই যাব।"

আমি জানকীর কাছে গিয়ে বললাম, "মুখ তোল্। তোর স্বামী তোকে কেন নেবে না বল্ দেখি। তোর নিজের মতিগতি কিছু বিগড়েছে কি?"

জানকী আমার পায়ে হাত দিয়ে বললে, "তুমি সরকার দেবতা, তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি, আমার মতিগতি চালচলনে কোন দোষ হয় নাই।"

আমি তুকারামকে আবার বললাম, "তুই ওকে নিতে রাজী থাকিস ত হাত ধ'রে নিয়ে যা। দুজন চৌকীদার তলওয়ার নিয়ে ওদের সঙ্গে যা, আমার পুলিশের জিম্মা ক'রে দিয়ে আয়।"

তুকারাম স্ত্রীর হাত ধরতেই পার্ব্বতী তাকে একটা ইঁট নিয়ে মারতে গেল কিন্তু তার ভাই তাকে টেনে সরিয়ে দিলে।

পরাজয় নিশ্চিত দেখে রামচন্দ্র ইনামদার হাসতে হাসতে তার অব্যর্থ বাণ ছাড়লে। ইঠুকে বললে, "হ্যাঁরে, পার্ব্বতীর স্বামী মরার কতদিন পরে জানকী জন্মেছিল? তার জন্মের পর পার্ব্বতীকে জ্ঞাতিরা বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিয়েছিল না? সব কথা সাহেবকে খুলে বল্? তুকিয়াটাও শুনুক যে কাকে নিয়ে ঘর করতে যাচ্ছে।"

লোকটা কিছু বলবার আগেই আমি পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাই, এ সব কি কথা? তোকে সারা গাঁয়ের সামনে এই রকম ক'রে অপমান করবে?"

পার্ব্বতী একটা হিংস্র হাসি হেসে বললে, "সত্যি নয় ত কি মিথ্যে? কে না জানে জানকী মামুদশা দারোগার মেয়ে। এইবার নিয়ে যা, তুকিয়া, তোর বৌকে।"

পার্ব্বতীর ভাই বললে, "সাহেব, আমাদের বড় লজ্জার কথা, কিন্তু সত্যি। পার্ব্বতীকে জ্ঞাতিরা বদনাম দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। ও কলে কাজ করতে যায় মেয়ে নিয়ে। আমি খুঁজে খুঁজে অনেক দিন পরে বাড়ী নিয়ে আসি।"

গাঁয়ের লোক রাগে গর গর করতে লাগল। রঘুনাথ পাটিল ব'লে উঠল, "দোহাই হুজুর, আমরা কেউ এ কথার বিন্দু বিসর্গও জানতাম না। এ হারামজাদারা আমাদের সবায়ের জাত মেরেছে। এর একটা বিচার কর সাহেব, নইলে গাঁ শুদ্ধ লোকের সর্ব্বনাশ হল।"

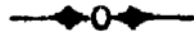
আমি জানকীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম। তার নাক, চোখ, গড়ন নজরে পড়ল। এতক্ষণ ওকে কুনবীর মেয়ে মনে করছিলাম কি ক'রে কে জানে! নিজের জন্মকথা শুনতে শুনতে বেচারার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। দেশপাণ্ডে মিটি মিটি হাসছিল। শিকার আবার বাগে এসেছে।

কিন্তু মূর্খ তুকারাম সব গণ্ডগোল ক'রে দিলে। সে জানকীর হাত একবারও ছাড়ে নাই। এখন আমার দিকে ফিরে বললে, "সাহেব, ওসব এদের চালাকী। আমি আমার স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে যাবই। তুমি তোমার চৌকীদার হুকুম ক'রে

দাও। আমার দেশের লোক বিচার করতে হয় করবে জানকী কার মেয়ে। কিন্তু আমি কিছুতেই ওকে এই বাঘনার খর্পরে ফেলে দিয়ে যাব না।" জানকী তুকারামের পায়ের ধূলো নিলে। দুজনে গাঁয়ের ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল। পেছনে দুই চৌকীদার। রঘু পাটিল শুনলাম দেশপাণ্ডেকে বলছে, "তোমায় এক হাত এইবার দেখে নেব, ঠাকুর।" আমার তাঁবুতে ফিরে, দম্পতিকে পুলিশ সঙ্গে দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলাম। রঘুনাথকে চাকরী থেকে বরতরফ্ করব ঠিক করেছিলাম কিন্তু করলাম না। এই আশায়, যে সে পাটিল থাকলে দেশপাণ্ডে, পার্ব্বতী, পার্ব্বতীর ভাই, সবাইকে বেশ ক'রে ঘোল খাওয়াবে।

তুকারাম বিনা দরখাস্তে, বিনা উকীলখরচায় জানকী উদ্ধার ক'রে নিয়ে গেল। কিন্তু তার দেশে পৌছবার মাস তিনেক পর আমি এক ইংরেজী দরখাস্ত পেলাম। নীচে দুই নাঙ্গল আঁকা, তার পাসে লেখা, সই দস্তখৎ তুকারাম কুনবী ও জানকী কুনবীন, সাং বেগমপুরা, মোগলাই। প'ড়ে জানলাম যে বেগমপুরার কুনবী পঞ্চায়ৎ একদিন পরমানন্দে জানকীর রান্না ভাত ও পাঁঠা খেয়ে গেছে। দরখাস্তে প্রার্থনা যা জানিয়েছে তা কিন্তু প্রান্ত সাহেবের কাছে নয়, ৺বিঠোবার কাছে, প্রান্ত সাহেবের দীর্ঘজীবন কামনা ক'রে।

মরুর দেশ



মানুষের ধরণধারণ চালচলন তার প্রাকৃতিক আবেষ্টনের উপর অনেকটা নির্ভর করে। আমরা বাঙ্গলা দেশের লোক, সমতল আমাদের দেশ, মলয়জশীতল আমাদের হাওয়া। মাটি আঁচড়ালেই শস্য জন্মায়, আর সেই শস্য জমীদার, পত্তনীদার, দরপত্তনীদার চাষীর সঙ্গে কাড়াকাড়ি ক'রে খায়। বিধির বিধানে বিদেশীর এদেশের উপর চিরদিনই লোভ, তাই নিজেকে বাঁচাবার জন্য যা একটু হাত পা নাড়তে হয়। নইলে দেশসুদ্ধ সবাই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে যেত। কিন্তু সারা ভারত ত আর শস্যশ্যামল নয়। সিন্ধ নামে এক প্রদেশ আছে, যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে অহরহ যুদ্ধ ক'রে বেঁচে থাকতে হয়। সেখানে গ্রীষ্মে গা জ্বলে যায়, এক ফোঁটা ঘাম হয় না। শীতে গনগনে আগুন জ্বেলে কোন রকমে ৯৮'৪ বজায় রাখতে হয়। বৃষ্টি নেই। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন কৈলাসে বুড়ো শিবের জটা গ'লে সিন্ধুর জল বাড়ে, তখন সেই বাড়তি জল খাল নালা দিয়ে লোকের ক্ষেতে যা যায়, তাইতে চাষ হয়। এই জলের জন্য কত মারামারি খুন দাঙ্গা যে হয় তার গুনতি নেই। উত্তর সিন্ধে অনেক লোক এখনও উট গরু ভেড়া চরিয়ে খায়। যে বড় লোক তার পশুর পাল বেশী। তাই এদেশের ভাষায় ধন মানে টাকা নয়, গরুর পাল। ভগবানের বড় আদরের নাম ধনী। গ্রামকে বলে গোঠ, কেন না যেখানে গোচরণের সুবিধা আছে সেইখানেই লোকে বসবাস করেছে। মানুষের পোষাকও জল হাওয়ার উপযোগী। এখানে ধুতি প'রে, গা খুলে, দখিনে বায়ু সেবন করার সুবিধা নেই,

বরং লু লেগে মরণের সম্ভাবনাই বেশী। তাই এদের পরন, রোদ ঠাণ্ডার সঙ্গে যুদ্ধ করার সাজ। অন্ততঃ দশ গজ কাপড়ের ঢিলে ইজার, হাঁটু অবধি ঝোলান পিরান, আর মাথায় এক প্রকাণ্ড আড়াই সেরী পাগড়ী। গরীব শ্রীমন্ত সবারই এই পোষাক। শুধু বড়লোকের ইজারটা বিশ গজ কাপড়ের তৈরী আর কাপড়টা একটু মিহি। সকলেরই কাঁধে এক চাদর। বড়লোকের চাদর বোখারার রেশমের। হিন্দুর বাস খুব কম। বেশীর ভাগই মুসলমান। মুসলমানেরা জমীদার ও চাষী। হিন্দুদের পেশা মুদীর দোকান ও মহাজনী। তারা শান্তশীল, ধর্ম্মে নানকপন্থী। মরুভূমির দেশ, মুসলমানেরাও ধর্ম্মটাকে বেশ সরল ক'রে নিয়েছে। পাঁচবার নমাজের ল্যাঠা নেই। মুরশিদের (গুরুর) বাড়ী যাতায়াত ও পীরস্থানে ফুল চড়ানই যথেষ্ট মনে করে। সুফী কবিতার বড় আদর ছোট বড় সকলের কাছে। চাষীরা সবাই কাফী বায়েৎ আওড়ায়। গ্রামগুলো খুব দূরে দূরে, মাঝে বিস্তৃত বালির মাঠ ধূ ধূ করছে। যেখানে খাল নালা আছে সেখানে গাছ, নইলে কোশের পর কোশ খোলা ময়দান, বহু দূর নজর চলে। অরাজকতা অন্য প্রদেশের চেয়ে অনেক বেশী। জোর যার মুলুক তার, পল্লীবাসী অধিকাংশ লোকের এই মন্ত্র। তাই আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেকে তার জাতের (tribe) এবং জাতের সরদারের মুখাপেক্ষী। এই সরদারদের অপ্রতিহত ক্ষমতা। এঁদের সাহায্য না পেলে, ঐ মরুর মাঝে পুলিশ কোন চুরি ডাকাতির কিনারা করতে পারে না। এটা পুলিশও জানে, তাই জমীদারদের খুব তোয়াজ করে। সিন্ধের বেলুচরা আবার খাস সিন্ধীর চেয়ে আরও বেশী যাযাবর প্রকৃতির, আরও বেশী দুর্দ্দান্ত। এখনও ঠিক পোষ মানে নেই। তাদের

পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটিও খুব হয়। তবে ইংরেজ রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ, তাই তারা খুনখারাবী ক'রেই সাধ মেটায়। অনেক সময় এই খুন খারাবীর জের চলে দু তিন পুরুষ। আদালতে কিছু নিষ্পত্তি হওয়া কঠিন, কারণ একটা জাতের সব লোক এক তরফে সাক্ষী দেবেই, সত্য হোক্ বা মিথ্যা হোক। যখন আদালতে কিছু হবার নয়, তখন মামলা সরদারদের জিরগার সামনে যায়। তাঁরা পঞ্চায়তী বিচার ক'রে সাজা দেন। একটা সমগ্র tribe (জাতি) এর সরদার যাঁরা; তাঁরা নবাব ওমীর পদস্থ লোক। কিন্তু তাঁদের আজ্ঞাধীন ছোট ছোট ওডেরো বা গ্রাম্য জমীদার আছে। তারা গরীব হলেও তাদের পদগৌরব খুব বেশী। এত কথা বলার দরকার হল, কেন না, উত্তর সিন্ধের আবহাওয়া না জানলে বাঙ্গলার পাঠকের আমার গল্প ভাল লাগবে না।

মজারী ও জতোই নামে দুই মস্ত বড় বেলুচ tribe আছে। তাদেরই এক ক্ষুদ্র শাখা সম্বন্ধে কতকগুলো ঘটনা নীচে লিখছি। ঘটনাগুলোর যোগ আছে। ব্যাপারটা চলেছিল মোট ৬০ বছর ধ'রে। ধনীবক্স জতোই আর সাঁইদিনো মজারী পাসাপাসি দুই গাঁয়ের ক্ষুদ্র ওডেরো। গাঁ দুটোর নাম জতোইজো-গোঠ আর মজারীজো-গোঠ। এদের পরস্পর বেশ সদ্ভাব ছিল। একদিন ভোরে দুই জমীদারই শিকার করতে গেছেন এক বিলে। বিলটার মাঝখানে এক বাঁধ। সেই বাঁধ দুই গ্রামের সীমানা। প্রত্যেক দল আপন আপন হদ্দের মধ্যে হাঁস মারছেন। হঠাৎ এক হাঁস গিয়ে পড়ল বাঁধের উপর। কার হাঁস হল সেটা, এই নিয়ে দুই দলের চাকরদের মধ্যে ছোটখাটো ঝগড়া বেধে গেল। চেঁচামেচি শুনে, ওডেরো সাহেবেরা দুজনেই বাঁধের উপর এসে পড়লেন। তাঁরা

প্রথমটা অনুচরদের ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করলেন, শেষে নিজেরাই গরম হয়ে উঠলেন। বেলুচদের বিশেষত্ব এই যে গরম হতে আরম্ভ হলেই দেখতে না দেখতে মাথার ভেতর রক্ত ফুটে ওঠে। দুই জমীদারই মুখ লাল ক'রে সামনাসামনি দাঁড়ালেন।

ওডেরো ধনীবক্স হঠাৎ বন্দুক তুলে বললেন, "দেখি কোন বেজন্মা এই হাঁস ওঠায়।"

মজারী জমীদার সাঁইদিনো তাঁর বন্দুকের ঘোড়া টিপতে টিপতে গর্জ্জন ক'রে উঠলেন, "আমরা মজারীরা এই রকম ক'রে জঙ্গলী কুত্তা মারি।"

ধনীবক্স বুকে গোটা চল্লিশেক ছররা নিয়ে ভুঁইয়ে লুটিয়ে পড়লেন। মজারীদের সেদিন অনেক বেশী লোক। জতোইরা কিছু না করতে পেরে তাদের ওডেরোর লাশ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে গ্রামে ফিরে গেল। তখন সিন্ধে বেলুচ মীরদের রাজত্ব চলছে। দুই দলের এক আধবার লাঠালাঠি দাঙ্গা হল কিন্তু খুনের দাদ তোলা হল না। অল্পদিনের মধ্যেই ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে তালপুর মীরদের যুদ্ধ বাধল। দেশের স্বাধীনতা গেল। গোলমালে খুনটা গায়েই রইল।

অনেক দিন পরের কথা। এখন ইংরেজ রাজত্ব। কিন্তু ছোটখাটো বিষয়ে অবস্থা প্রায় আগের মতই আছে। সিন্ধ কমিশন যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করেছেন এই পর্য্যন্ত। তাঁদের পুলিশের প্রতি লোকের ঘোর অবিশ্বাস ও ঘৃণা। ধনীবক্সের নাতি আল্লাদিনো জতোই তখন ২১ বছরের জোয়ান। এরই মধ্যে সে পালোয়ান ব'লে ঐ অঞ্চলে খ্যাতিলাভ করেছে। সে তার ঠাকুমার কাছে বিলের বাঁধের উপর ধনীবক্সের মৃত্যুর গল্প শুনেছিল। তার বড় সাধ

কুস্তীতে সাঁইদিনোর ভাইপো খুদাবক্স মজারীকে হটিয়ে দিয়ে ঋণ শোধ করবে। ঘরে ভাল বন্দুক আছে, নিশানাও তার খুব ভাল, কিন্তু গুলিমারার গোলমালে কাজ নেই, ইংরেজের পুলিশের বড় দৌরাত্ম্য আরম্ভ হয়েছে। তার চেয়ে বরং কুস্তীর প্যাচে ফেলে হাত পা ভেঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। বুড়োরা তাকে কেবল টিটকারি দিত, তাই একদিন সমবয়স্ক ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে গম্ভীর ভাবে পরামর্শ করলে। কা'কে দিয়ে যুদ্ধের আহ্বানটা [illegible]? মজারীদের গোঠের সঙ্গে জতোইদের কোন কারবারই নেই। ঠিক হল গাঁয়ের মহাজন নেহালচাঁদকে পাঠান হোক। সে হিন্দু, সুতরাং শিখণ্ডীর মত অবধ্য। মজারী ওডেরোর সঙ্গেও তার লেনদেন আছে। দুদিন বাদ নেহালচাঁদ দৌত্য ক'রে ফিরে এল।

মুখ ভার ক'রে বললে, "ওডেরো সাঁই, খুদাবক্স মজারী বড় অপমানের কথা বলেছে। সে গাল দিয়ে বললে যে জতোইগুলো ত বেলুচের বাঁদীপুত্র, তাদের সঙ্গে কুস্তী লড়ার চেয়ে বরং নেহালচাঁদ বেনের সঙ্গে লড়বে।"

শুনে আল্লাদিনো আর তার সাথীরা রাগে অধীর হয়ে গেল। বুড়োদের মজলিসে গিয়ে সব কথা বললে। এক ষাট বছরের বুড়ো জতোই উটওয়ালা, সে ধনীবক্সের চাকরী করত, বললে, "দেখ ওডেরো, খুনোখুনিতে কাজ নেই। খুদাবক্সের এক বোন আছে। আমি দেখেছি সে বড় সুন্দরী। ভাই তাকে বড় ভালবাসে। এক কাজ কর, রাত্রিবেলা চুপি চুপি গিয়ে তার মাথার চুল একটু কেটে নিয়ে এস। তাতে ত আর ধরা পড়লেও কোম্পানীর আদালতে এমন কিছু সাজা হবে না, অথচ বেলুচের চোখে পুরো প্রতিশোধ হবে।"

অন্য বুড়োরাও এই কথায় সায় দিলে। বললে, "এই ভাল পরামর্শ। পুলিশকে রাগিয়ে কাজ নেই, হারামখোররা বড় বদমায়েশ।"

ছোকরারা নিজেরা ব'সে সলা পরামর্শ করলে। অনেকেই এই অসমসাহসিক কাজে যেতে চাইলে। কিন্তু আল্লাদিনো রাজী হল না, বললে, "ভাই, এ আমার কাজ। আমিই যাব। আমার কিছু ভালমন্দ হয় ত তোরা রইলি।"

মজারীদের গোষ্ঠ দু ক্রোশ দূরে। ঘোর গ্রীষ্মকাল, সবাই বাহিরে শোয়, খুব সাবধানে যেতে হবে। রাত দুপুরে একলা চুপি চুপি খুদাবক্সের গ্রামে আল্লাদিনো গিয়ে পৌছেছে। ওডেরোর বাড়ী মামুলী ধরণের। খানিক দূরে ওতাক্ (বৈঠকখানা বাড়ী), সেখানে রাত্রে কেউ থাকে না। পরিবারের সবাই শোয় কোটের ভেতর। চাকর-বাকর কোটের দরজার সামনে। চারিদিকে সাত হাত উঁচু মাটির দেওয়াল। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে একটা সুবিধা মত জায়গা দেখে, এক গাছের সাহায্যে আল্লাদিনো নেমে পড়ল ভেতরে। দৈবক্রমে কোন কুকুর ডাকলে না। ডাকলে তার আর রক্ষা ছিল না। নেমে দেখে উঠানের একদিকে ওডেরো শুয়ে আছেন, অন্যদিকে মেয়ে ছেলেরা। মাঝে একটা কাঠির বেড়া আব্রুর জন্য বোধ হয়। অনেক ক্ষণ ঠাউরে দেখলে। তারপর বুঝলে বাড়ীর মেয়ে কোনটী। গুড়ি মেরে, কোথাও বা বুকে হেঁটে তার পায়ের কাছে উপস্থিত হল। দেখে যে মেয়েটীর বেণী ঝুলছে খাটের পাশে। সঙ্গে কাঁচি ছিল। আল্লাদিনো আস্তে আস্তে কুচ্ ক'রে কেটে নিলে বেণীর ডগাটা। কাঁচি সেইখানে ফেলে রেখে এল, বুঝবে কার কাজ।

বেণী নিয়ে ভোরবেলা জতোই গোঠে ফিরল। সেদিন খুব ধুমধাম হ'ল গ্রামে। সারাদিন, বাজনাবাদ্য, কুস্তীকসরৎ, দৌড়-ঝাঁপ, খালে সাঁতারের বাজী, ক'রে কাটল। যেন ঈদের দিন। সে আওয়াজ নিশ্চয় মজারীদের কানে পৌঁছেছিল। দু দিন গেল। তিন দিনের দিন সকালে উঠে সবাই দেখলে যে আল্লাদিনোর কোটের সদর দরজায় ও খিড়কীর দরজায় অগণ্য রক্তের ছাপ। বুঝলে যে রাত্রে মজারীরা এসে শাসিয়ে গেছে। আবার কমিটি বসল, পুলিশে খবর দেওয়া হবে কিনা। অনেক তর্কবিতর্ক ক'রে ঠিক হল যে পুলিশ ডেকে কাজ নেই, তার চেয়ে মজারী ব্যাটারাও ভাল। আল্লাদিনোর ঠাকুমা ব'লে পাঠালেন যে তাঁর নাতির ত অনেক দিন থেকেই দক্ষিণে উট ভেড়ার ব্যবসা করতে যাওয়ার কথা আছে, এখনই যাক্ না। বুড়োরা সকলে তাইতে সায় দিলেন। জোয়ানরাও ওডেরোকে বলতে লাগল, "ওডেরো, তাই কর। মজারীরা একটু ঠাণ্ডা হোক। তারপর আবার ব্যাটাদের জব্দ করলেই হবে।"

এই পরামর্শ অনুসারে আল্লাদিনো গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়ল লোকজন নিয়ে। তার স্ত্রী রক্তের ছাপ দেখে এমনই ভয় পেয়েছিল যে সে সঙ্গ ছাড়লে না। এক মাস বেশ কেটে গেল। উট ভেড়াও অনেক বিক্রী হল। প্রথম প্রথম চাকর-বাকর রাত্রে পাহারা দিত। ক্রমশঃ সে অভ্যাস ছেড়ে দিলে। এক পূর্ণিমার রাত্রে আল্লাদিনো ডেরা গেড়েছে সক্কর থেকে খানিক দূরে, সিন্ধুর পারে বালির উপর। পাশেই এক খেজুর বাগান। তার আগের দিন তার কুকুরটা হঠাৎ অসুখ হয়ে মরে গেছে। ডেরা সাবধানে সাজান হয়েছে। মাঝখানে ওডেরোর তাঁবু। তার কাছেই উটগুলো। উটের সঙ্গে জনা দশেক জতোই জোয়ান। বেলুচদের মধ্যে অনেক হুসিয়ার উট চোর আছে

তাই তাদের পাহারা দেওয়া দরকার। বাইরের দিকে ভেড়ার পাল আর বাকী চাকর-বাকর। তাঁবুর সামনে দুই চারপায়ে ওডেরো আর তার স্ত্রী শুয়ে আছে। চাকররা যে যার জায়গায় খেজুর পাতার চেটাই বিছিয়ে শুয়েছে। গভীর রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ। হঠাৎ একটা ধুপ্ ক'রে শব্দ হল আর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকণ্ঠে আর্ত্তনাদ! যারা জাগল দেখলে যে একটা লোক দৌড়ে খেজুর বাগানে ঢুকে গেল। কি হল কি হল, রব উঠল। মশাল জ্বেলে দেখা গেল যে আল্লাদিনোর স্ত্রী একটা কাটামুণ্ড হাতে ক'রে কাঁদছেন। সবাই সভয়ে চিনলে যে তাদের ওডেরোর মাথা। হায় হায়, করতে লাগল। পুলিশের কাছে রাত্রেই এতেলা গেল।

পরদিন সকাল বেলা পুলিশ ও জমাদাররা খুব হুশিয়ার পগী নিয়ে এসে উপস্থিত হল। এই পগীরা পায়ের দাগ দেখে কত খুনী, ডাকাত, চোর আগে ধরেছে। তারা সরজমীন খুব ভাল ক'রে পরীক্ষা করলে। বালির উপর অজস্র পায়ের দাগ। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেগুলো জতোইদের পায়ের ছাপ, সেগুলো মুছে ফেললে। বাকী রইল একজন কোন বেগানা লোকের চিহ্ন। সেগুলো খেজুর বন থেকে এসেছে আবার খেজুর বনেই ফিরে গেছে। শুনে সবায়ের আশা হল যে খুনী ঠিক ধরা পড়বে। কিন্তু অল্পক্ষণেই সে আশা ছাড়তে হল। পগীরা বললে যে ছাপগুলো দিয়ে কাউকে চেনা অসম্ভব, কারণ লোকটা পায়ে ন্যাকড়া বেঁধে এসেছিল আর খেজুর বনের ভেতর দিয়ে গিয়ে নদীর জলে নেমে পড়েছিল। পগীরা বিকেলে বিদায় নিলে। তদন্ত কদিন ধ'রে চলল। জতোইদের ভেড়া অনেকগুলো পেটে গেল। কিন্তু ফল কিছু হল না। চাকর বাকররা কেউ খুনীর মুখ চিনতে পারে নেই। একমাত্র ওডেরোর

স্ত্রী তার মুখ দেখে চাঁদের আলোয় খুদাবক্স মজারী ব'লে চিনেছিলেন যখন সে তার পাশ দিয়ে পালিয়ে গেছ্ল।

অন্য পক্ষে, মজারী গোঠের এক পীর, এক হকীম, তিন চারজন রাইয়ত এজাহার দিলে, যে খুনের আগে পরে সাত আট দিন খুদাবক্স ব্যারাম হয়ে বাড়ীতে প'ড়ে ছিলেন। যখন দারোগা মজারী গোঠে গেলেন, তখনও খুদাবক্স শয্যাগত। কাজেই পুলিশ সাহেব হাকীমকে রিপোর্ট দিলেন যে খুনের পাত্তা লাগছে না।

জতোইরা বেলুচিস্থান গিয়ে তাদের বড় সরদারকে নিয়ে এল। তিনি সিন্ধের শাসনকর্ত্তার কাছে গেলেন। মজারীদের নবাবসাহেবের তলব পড়ল। কমিশনার বাহাদুর দুই নবাবের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ক'রে দিলেন। হয়ত জতোই নবাবসাহেবের কিছু খেসারৎও মিলল। এ অবস্থায়, আল্লাদিনোর বিধবা আর তার গ্রামের ক্ষুদ্র জতোইদের কথা আর কে শুনবে? কিছুদিন দুই গ্রামে ছোটখাটো দাঙ্গা মারামারি হতে থাকল। ইংরেজের আদালত বসেছে, উকীল মোক্তার হয়েছে, সুতরাং নানা রকমের মোকদ্দমাও দুই দলের চলল। এইভাবে ঝগড়াটা ধোঁয়াতে লাগল কিছুকাল।

আরও পনের বিশ বছর কেটে গেছে। সিন্ধের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। রাজকার্য্য, সিন্ধ কমিশনের জো-হুকুম সাহেবদের হাত থেকে, সিবিলিয়ানদের হাতে এসেছে। নূতন নূতন খাল কাটার দরুন চাষবাস অনেক বেড়ে গেছে। যাযাবর বৃত্তি রোজ কমে যাচ্ছে। আদালতের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ছেলে মেয়েদের ইস্কুলও খোলা হয়েছে। বেলুচ পাঠানদের পর্য্যন্ত অনেকের মনে সন্দেহ জন্মেছে যে তাদের পুরানো মারামারি কাটাকাটিই জীবনের

একমাত্র সার পদার্থ নয়। এমন কি পাঠান বেলুচ জাতের দুচার জন হাকীমের চাকরী করছে, ইংরেজী লেখা পড়া শিখে।

আল্লাদিনোর ছেলে গুলামনবী এখন বিশ বছরের হয়েছে, আর তার বোন সতের বছরের। বোনের নাম গুলবদন। সত্যি তার দেহ ফুলের মত সুকুমার, আর মুখখানি যেন জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া। জতোইদের গোঠের ছেলে বুড়ো সবাই তার কথায় উঠত বসত। ইদানীং একটা গোল হয়েছে। সে কথা পরে বলব। গুলামনবী বাপের বেটা। বিশাল শরীর, অসাধারণ সাহস। সে তাদের বাড়ীর ইতিহাস খুব ভাল ক'রেই শিখেছে। মাকে রোজ বলে, "মা, এনে দেব তোকে দুশমনের কাঁচা মাথা, একটু সবুর কর।" মা মরবার আগে সেইটাই দেখতে চান। হয়ত এর আগেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত। হয় নেই গুলের জন্য। তার বদন যে শুধু গুলের মত তা নয়, তার হৃদয় ফুলের মত কোমল। সে সিন্ধী ও ফারসী পড়তে শিখেছে। ঐ দুই ভাষায় বায়েৎ কাফী প'ড়ে তার মনটা এমনই গ'ড়ে উঠেছে যে তাতে হিংসা দ্বেষ স্থান পাওয়া অসম্ভব।

সে ক্রমাগত তার ভাইকে বলত, "ভাই সাহেব, মানুষ মানুষকে মারে, এ কখনই খোদাতালার মরজী হতে পারে না। ওদের বাবা গুনাহগার ছিলেন, তিনি ত চলে গেছেন। ছেলেদের সঙ্গে দুশমনী কেন?"

কখনও বা বলত, "দুশমনকে মহব্বৎ দিয়ে জয় কর, শমশের দিয়ে নয়, জ্ঞানীরা এই কথা বলেছেন।"

যতদিন ছোট ছিল দাদা রাগ করত না। তার বাঁধা জবাব ছিল, "নে, তোর আর জ্যাঠামি করতে হবে না।"

কিন্তু ইদানীং কথা সইতে পারে না, বলে, "তুই বেলুচের মেয়ে হয়ে এই সব বলিস্? দুপাতা পড়তে শিখে তোর মাথা বিগড়েছে।"

খুব রাগ হলে বলে, "মেয়েছেলে বাঁদী, বাঁদীর মত থাকবি। জতোইএর ইজ্জৎ কিসে বাঁচে কিসে নষ্ট হয় তুই কি বুঝবি?" মা ছেলেকে চুপ করিয়ে দিতেন, কিন্তু মেয়ের উপরও রোজ বেশী চ'টে যাচ্ছিলেন।

খুদাবক্স মজারী অনেক দিন মরেছে। তার দুই ছেলে খালিকদিনো আর রাজিকদিনো। বড়টী দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি, গুলামনবীর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। ছোট প্রকৃতিতে একেবারে অ-বেলুচ। সে দাদাকে ছেলেবেলা থেকে জপায় যে মুসলমান মাত্রই মুসলমানের ভাই, মুসলিমের যদি জাতিভেদ থাকবে ত সে কাফেরের মতই হল। রাজিক ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখেছে। এমন কি ইংরেজীও একটু আধটু পড়তে পারে। খালিকদিনো মূর্খ গোঁয়ার, সে ভাইয়ের কথা বুঝতে পারত না, বুঝতে চাইতও না। বলত যে ভাইটার ইস্কুলে গিয়ে হিন্দুর মত প্রকৃতি হয়ে যাচ্ছে।

মজারীদের গাঁয়ে ইস্কুল ছিল না। জতোইরা একেলে বিদ্যার দিকে একটু ঝুঁকেছিল। তাদের গাঁয়ের মসজিদের পাসে এক ইস্কুল বসিয়েছিল। সেই ইস্কুলে রাজিকদিনো ছেলেবেলায় পড়তে আসত। মেয়েদের একটী ছোট ইস্কুল পাসে ছিল। গুলবদন সেইখানে পড়তে যেত। রাজিকের এই ফুটফুটে ছোট মেয়েটীকে দেখে বড় ভাল লেগেছিল। কি ·সুন্দর মুখ, কি গড়ন, রঙ্গচঙ্গে রেশমের পোষাক তাকে এমন মানাত! ইচ্ছা ক'রে মেয়েটীর সঙ্গে

ভাব করেছিল। রাজিকও এমন শান্তপ্রকৃতির ছেলে যে জতোইরা তাকে ভালই বাসত। সে তাদের ওডেরোর বোনকে আদর যত্ন করে, এটা কারও চোখে অশোভন লাগত না। অন্ততঃ প্রথম প্রথম। কিন্তু যখন গুল রোজ ইস্কুলের পর দাঁড়িয়ে থাকতে লাগল রাজিকভাই বাড়ী পৌছে দেবে ব'লে, তখন কেউ কেউ বিরক্ত হতে আরম্ভ করলে। একদিন রাজিকের সঙ্গে মেয়ে বাড়ী এল দেখে মা মেয়েকে ভয়ানক ধমকালেন। আর একদিন রাজিকদিনোকে শুনিয়ে শুনিয়ে দুজন জতোই বললে, "বোনের সঙ্গে ভাব ক'রে ভাইকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা। জান বাঁচাবার জোগাড়ে আছে, বুঝলি ?"

যখন এই সব পাঁচরকম বাধা পেতে লাগল, তখন ছেলে মেয়ে দুজনেরই জিদ চাপল। কেন তারা একসঙ্গে বাড়ী যাবে না? কেন তারা দুজনে গল্প করতে পাবে না ? অবশ্য জিদ চাপার চেয়েও যে বড় কারণটা ছিল এই ইচ্ছার পেছনে, সেটা তখনও তাদের অগোচর। গুল দশ বছরের হতেই তার ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তবু আরও কিছুদিন দরকার হলে বাড়ীর বাইরে যেতে পেত। রাজিক তাকে তাকে থাকত, সুবিধা পেলেই একবার গুলকে দেখে যেত। ক্রমে এই সুযোগ কমে আসছিল। শেষ, যখন গুল বার তের বছরের হল, তখন আর তাদের মোটেই দেখা সাক্ষাৎ হত না। এই রকমে তিন বছর কাটল। গুলবদনের বাড়ীতে পড়াশুনো চলছিল। সে ফারসীতে লয়লা মজনুনের গল্প, আর সিন্ধীতে সুসী পুন্হুর গল্প পড়েছে। বারবার এই দুই করুণ প্রেমকাহিনী পড়ত আর ভাবত, "আমিই লয়লা, আমিই সুসী।" কিন্তু তার মজনুন কে, পুন্হু কে, এই কথা মনে আসতেই ছোট্ট দুটী

কান লাল হয়ে উঠত। একদিন রাত্রে এক ছোট চিঠি এল তার নামে, তার ঝির হাতে। খুলে দেখে লেখা রয়েছে,

"কাল ভোরে খিড়কীর দরজা খুলে একবার দাঁড়াবে কি? তোমায় ভাল ক'রে দেখব। অনেকদিন দেখি নেই। সেদিন ষ্টেশনে চকিতের মত মুখখানি একবার নজরে পড়েছিল। কি সুন্দর হয়েছ তুমি, গুল?'

রাজিক ভাই।"

ভোরবেলা খিড়কী খুলে দাঁড়াতেই দেখে রাজিক। ছুজনের কোনও কথাবার্ত্তা হল না। রাজিকের হাতে এক গুল (ফুল) ছিল, সেইটে ঠোঁটে ঠেকিয়ে, গুলবদনের হাতে দিয়েই পালাল। গুলবদন ফুলটা তাঁর কাঁচুলীর ভেতর রেখে ধীরে ঘরে ফিরে গেল।

বেলুচের রাগের কথা আগে বলেছি। রাগের মত, তার অনুরাগও ঝড়ের বেগে এসে, সব উলট পালট ক'রে দিয়ে যায়। না দেখে রাজিকও আর থাকতে রাজী নয়, গুলও রাজী নয়। সুযোগের যেখানে অভাব, উন্মত্ত প্রেম সুযোগ তৈরী ক'রে নেয়, এদেরও তাই হল। ব্যাপার গোপন রইল না। আগেকার কালে মামলা সহজেই নিষ্পত্তি হত, ছুজনই হঠাৎ একদিন গুম হয়ে যেত। এখন ইংরেজের রাজত্বে ত আর তা হয় না। দাদা বোনকে কোটের ভেতর বন্ধ ক'রে পাহারা বসালেন। রাজিক দিশেহারা হয়ে ফিরতে লাগল। একদিন যেই সে জতোই গোঠে এসেছে, গুলামনবীর লোকজন তাকে ধ'রে ফেললে। মেরে অপমান ক'রে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিলে। রাজিক ঝগড়া বাধাতে চায় না, তাই দাদাকে

কিছু বললে না। কোন গতিকে দিন কয়েক চুপ ক'রে রইল। তারপর থাকতে না পেরে এক চিঠি পাঠালে আবার,

"গুল, একবার কাল সকালবেলা তোমার কয়েদের কোন জানালায় দাঁড়িও। তোমায় দেখব দূর থেকে।

দিওয়ানা।"

চিঠি পড়ল দুশমনের হাতে। ফলে রাজিক গেরেপ্তার হল। এবার গুলামনবী রাজিককে সহজে ছাড়লে না। তাকে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে, তার গলায় জুতোর মালা পরিয়ে মজারী গোঠে তার দাদার কাছে পাঠিয়ে দিলে। খালিকদিনো ভাইয়ের অবস্থা দেখে, লাফিয়ে উঠে, রক্তবর্ণ চোখ ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে রে?" জতোই চাকররা কাঁপতে কাঁপতে বললে যে রাজিক সাহেব তাদের ওডেরোর বোনকে লুকিয়ে চিঠি লিখেছিলেন।

শুনে খালিকদিনো অট্টহাস্য হেসে বললে, "এই কথা? গুলামনবীকে সেলাম দিয়ে বলিস্ যে আমি কাল রাত্রেই তার বোনকে ধ'রে এনে বাঁদী করব। পালা, ব্যাটারা, নইলে জুতিয়ে লাল ক'রে দেব।"

জতোই চাষারা গাঁয়ে ফিরে তাদের জমীদারকে সব কথা জানালে। শুনে তার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। সোজা গুলের কাছে গিয়ে বললে,

"তুই আজ আমার এই দশা ঘটালি? হারামজাদা মজারী ওডেরোটা চাকরদের সামনে বড়াই করেছে যে আমার বাবার মেয়েকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে বাঁদী ক'রে রাখবে! কাল যদি আমি তার জিব কেটে কুকুর দিয়ে না খাওয়াই ত আমি কাফের।" গুল

ভাইয়ের পা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগল, "আল্লাহকে ইয়াদ ক'রে দুশমনকে মাফ কর, ভাই।"

গুলামনবী ঝটকা মেরে পা ছাড়িয়ে নিয়ে পাগলের মত বলতে লাগল, "ওর বাপ আমার বাপ্‌কে খুন করেছিল, ওর ভাই আমার আদরের বোনকে পর ক'রে দিয়েছে, আর ও নিজে আজ আমার মুখে চুণকালী দিয়েছে। এর পরেও বেলুচের বাচ্চা চুপ ক'রে থাকবে?" ব'লে ঝড়ের মত বেরিয়ে চ'লে গেল। গুল শুনতে পেলে ভাই উঠানে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলছে, মাকে, "আর একটী দিন সবুর কর মা, এইবার এনে দেব।"

মজারীদের গোঠেও একটা গোলযোগ চলছিল। রাজিকদিনোর বাঁধন খুলে দিলে পর, সে দাদার সামনে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, "আমি কালই তোমার গাঁ ছেড়ে চলে যাব। একটা অসহায়া মেয়ের নামে ঐ সব কথা বলতে তোমার জিব খ'সে পড়ল না?"

দাদা হেসে বললেন, "যা না। জতোইদের গাঁয়ে গিয়ে বাস করগে যা। গুলাম ব্যাটার পা টিপে দিস্ তাহলেই আর জুতো মারবে না।"

রাজিক ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল। পরদিন সকাল উঠেই সে তাদের পীরের দরগায় গেল। সেখানে অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে আল্লার চরণে তার সমস্ত দুঃখ নিবেদন করলে। পীরের কবরের দিকে ফিরে জোড় হাত ক'রে সজল চোখে বলতে লাগল,

"কেন হজরৎ, কেন মানুষে মানুষে, জাতে জাতে, এত বিদ্বেষ, এত শত্রুতা? এত বিষ কোথা থেকে এল?"

খানিক প'ড়ে থেকে মনটা একটু হালকা হল। আনমনা হয়ে দরগা হতে বেরোল। গাঁয়ের মাঝ বরাবর গিয়ে দেখলে

ভয়ানক শোরগোল। আরও এগিয়ে গেল। দেখে মজারীরা জতোই জমীদার গুলামনবীকে দড়ি দিয়ে বাঁধছে। তার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে যাবে এমন সময় নজরে পড়ল, তার দাদার প্রাণহীন দেহ ভুঁইয়ে লুটোচ্ছে। মাথাটা শরীর থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন, কাছে একটা রক্তমাখা কুড়ুলী। রাজিকের সমস্ত গা কেঁপে উঠল। সে "আল্লাহ করিম" ব'লে আবার ফিরে গেল দরগায়। পীরের সমাধির কাছে জোড় হাত ক'রে ব'সে রইল মাটির পুতুলের মত।

ঘণ্টা দুই বাদে তার ডাক পড়ল, পুলিশ এসেছে। তাকে দেখেই দারোগা মহা উৎসাহে বললেন, "ওডেরো সাহেব, মোকদ্দমা ভাল ক'রে চালাতে হবে। সরকারের রাজ্যে আমরা খুনখারাবী করতে দিই না। আপনার মদ্দৎ চাই, গুনাহগারকে ফাঁসী দেওয়াব।"

রাজিক হেট মাথা তুললে না। বললে, "দাদা ত গেছেন, এখন মোকদ্দমার কি হয়, না হয়, তাতে আমাদের কি বলুন? আপনি তদন্ত করুন, কিন্তু আমায় ছুটী দিন। আমি বেলুচিস্থানে গিয়ে আমাদের নবাবসাহেবকে নিয়ে আসি। আমি প্রত্যক্ষ কিছুই জানি না। যখন এই কাণ্ড হয় তখন আমি দরগায় নমাজ পড়তে গেছলাম।"

দারোগার হুকুম পেয়ে রাজিক পরদিন নবাবসাহেবের দেশে গেল। তাঁর কাছে জোড় হাত ক'রে জানালে যে সে হজে যাবে, তার দ্বারা ওডেরোগিরি হবে না। নবাবসাহেব তাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে সঙ্গে ক'রে সিন্ধে এলেন। তত দিনে খুনের মোকদ্দমা দায়রায় চ'লে গেছে। ইতিমধ্যে গুলবদনের পরামর্শে তার মা জতোই

নবাবসাহেবকেও পায়ে হাতে ধ'রে এনছিলেন। দুই নবাবের দেখা সাক্ষাৎ হল এক বেলুচ হাকীমের তাঁবুতে। এই হাকীম সব সাক্ষীদের এজাহার নিয়েছিলেন। রাজিকদিনো আর গুলবিবির কাহিনী তাঁর অজানা ছিল না। এই দুজনের উপর তিনি অনেকটা নির্ভর করছিলেন। নবাবদ্বয় তাঁর কুটুম্ব। দুজনকেই তিনি জোর ক'রে ধরলেন।

"আপনারা মধ্যস্থ হয়ে এত দিনের পুরানো মামলা মিটমাট ক'রে দিন। মূর্খ গরীব এরা, বুদ্ধি কতটুক, আর, কত-পুরুষ এই ঝগড়া চলবে?"

খুনীর সাজা হয়ে গেলে আপোষ নিষ্পত্তি অসম্ভব। এই বুঝে তিন জনে মিলে জেলা হাকীমের কাছে গিয়ে মিনতি করলেন যে মোকদ্দমা দায়রা থেকে তুলে নেওয়া হোক। হাকীম যখন বুঝলেন যে গুলামনবীর ফাঁসী হলে জতোই মজারীর ঝগড়ার জের আরও দু তিন পুরুষ চলবে, তখন তিনি দরখাস্ত মঞ্জুর করলেন। মোকদ্দমা জিরগায় যাবে ব'লে আদালত থেকে তুলে নেওয়া হল।

তারপর, একদিকে গুলামনবী, তার মা ও বোন, অন্যদিকে রাজিকদিনো ও খালিকদিনোর বিধবা, আর দুই জাতের মাতব্বর এই সবাইকে নিয়ে নবাবরা বসলেন। বেলুচ ডেপুটী সাহেবের সামনে তিন চার ঘণ্টা কথাবার্ত্তা তর্ক বিতর্ক চলল। শেষ ঠিক হল যে, জতোইরা একটী বিবাহযোগ্যা মেয়ে, তিরিশটা উট আর একশোটা ভেড়া জরিমানা স্বরূপ দিয়ে তাদের জমীদার গুলামনবীকে ছাড়িয়ে নেবে। জতোইরা রাজী হল। কে সে মেয়েটী, কে তাকে বিয়ে করলে তা কি পাঠককে ব'লে দিতে হবে? বিয়েটা হল সদরে জেলা হাকীমের সামনে। কাজী মুল্লা সব এল সাহেবের

খাসকামরায়। গ্রামে ফিরে গিয়ে মহা ঘটা হল। তিন দিন খাওয়া দাওয়া নাচ গান চলল। উৎসবান্তে নবাবসাহেবরা বর কনেকে দুয়া ক'রে মুলুকে ফিরে গেলেন।

গুলামনবী মজারীদের পীরের দরগায় গিয়ে কবর ঢাকবার জন্য এক কিংখাপের চাদর দিয়ে জোড় হাত ক'রে আরজী জানালে।

"হজরৎ, আজ থেকে রাজিক আমার ভাই। তুমি বেহেস্ত থেকে তাকে আর আমার বোন গুলবদনকে দুয়া কর। আমাদের দুই জাতের উপর নেকনজর রেখো।" তিন বার সেলাম ক'রে বেরিয়ে এল। এত দিনের ঝগড়া মিটল!

ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ

কাপ্তান শঙ্কর আগাশের জন্ম হয়েছিল, কোকন প্রদেশে শেরপুর গাঁয়ে। তাঁর বাপ মোরভট্ট যজমান বৃত্তি ক'রে দিনপাত করতেন। গাঁয়ে প্রায় পঞ্চাশ ঘর চিতপাবন ব্রাহ্মণের বাস। অধিকাংশ ঘরেরই কেউ না কেউ আগেকার দিনে পুণা, নাগপুর, সাতারা গিয়ে বড় লোক হয়েছিল, নাম কিনেছিল। ইদানীং ইংরেজের আমলেও অনেক জন বেরিয়েছে। উদ্যোগী যারা, তারা অদৃষ্ট পরীক্ষা করতে বাইরে চ'লে গেছে আর ফেরে নেই। আছে যারা তারা নিরুদ্যম, অল্পে তুষ্ট। অনেকেরই কিছু কিছু জমীজেরাৎ আছে, ভাগে দিয়ে চাষ করায়। বামুনের ছেলে লাঙ্গল ধরতে ত পারেনা! সন্ধ্যাবেলায় বৃদ্ধেরা মন্দিরের সভামণ্ডপে জমা হয়ে সুখ দুঃখের কথা কয়। কার জ্ঞাতি কোন দেশে গিয়ে টাকা রোজগার করেছে, খ্যাতি সঞ্চয় করেছে, সেই সব গল্প করে। সবাই গরীব, শ্রীমন্ত কেউ নেই, কিন্তু কুলগৌরবে কেউ কম যায় না। এদের মধ্যে আবার যারা নিতান্ত দুঃস্থ, মোরভট্ট তাদের এক জন। তার চাষবাসও নেই, মামলা মোকদ্দমাও নেই, তার বংশের কেউ সরদার জায়গীরদার মনসবদারও হয় নেই। সে তাই চুপ চাপ ব'সে থাকে, অন্যের গল্প শোনে। তার নজর ভবিষ্যতের দিকে। পুত্র শঙ্কর গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে বুদ্ধিমান ছেলে। এত তাড়াতাড়ি সে কেলাসের পর কেলাস উঠছে যে তাকে শেরপুরের চৌহদ্দির ভেতর বেশী দিন রাখা যাবে না। তা এ কথা নিয়ে মোরভট্ট কখন বড়াই করত না। কি দরকার বাপু, কখন কে নজর দেবে।

ক্রমে শঙ্কর শেরপুরের মাইনর ইস্কুল শেষ ক'রে রত্নাগিরি হাই ইস্কুল থেকে শেষ পরীক্ষায় জলপানি পেয়ে বোম্বাইয়ে পড়তে গেল। উইলসন কলেজে ঢুকল। কলেজটা পাদ্রীদের। তারা শঙ্করকে ভালবাসত। একে ভাল ছেলে, তায় বারফট্টাকাই নেই, সাদাসিধে কাপড় চোপড় চালচলন, মাষ্টাররা ভাবতেন এ এক দিন মানুষের মত মানুষ হবে। সাহেবদের যত্নে তার বুদ্ধি রোজ বাড়তে লাগল, কিন্তু মোটা চাল বেশী দিন রইল না। দুবছর উইলসন কলেজে প'ড়ে যখন শঙ্কর গ্রাণ্ট মেডিক্যালে গেল, তখন ধুতি গেছে, পেণ্টলুন কোট চড়েছে। মাথায় চুল রেখেছে, টিকিটা ক্রমশঃ ছোট হচ্ছে। ফিট ফাট বোম্বাইয়ের ছেলেদের মত মরাঠী বলবার সময় খুব ইংরেজীর বুকনিও দেয়। এই রকম ক'রে ক'বছর কাটিয়ে শঙ্কর যখন ডাক্তার আগাশে হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে এল, তখন সে ঠিক বুঝলে যে শেরপুরের কাছাকাছি থাকা তার চলবে না। কোকনের চিতপাবন সমাজ অনেক জিনিস মার্জ্জনা করতে পারে, কিন্তু ফতো বাবুগিরি, সাহেবী চালচলন কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। তার মা বাবা দুজনের তখন কাল হয়েছে, কাজেই তার দূর দেশে গেলেও দোষ নেই। তা ছাড়া একথা সে জানত যে মোরভট্টের বড় সাধ ছিল যে সে বিদেশে গিয়ে একটা কেউকেটা হয়। সে মনে মনে ইংরেজীতে এক মন্তব্য পাস করলে, ড্যাম দি পিঞ্জরাপোল, অর্থাৎ চুলোয় যাক কোকন, ও ত একটা পিঞ্জরাপোল বিশেষ। আহমদনগরে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিল, তার পরামর্শে সেই খানেই ডাক্তারী সুরু ক'রে দিলে।

এখন গল্পটা আর বেশী দূর যাওয়ার আগে কিছু বাজে কথা বলব। কেন না চিতপাবন বা কোকনস্থ ব্রাহ্মণ জাতটাকে না বুঝলে

শঙ্কররাওকে বোঝা শক্ত হবে। মহারাষ্ট্রে আরও দুতিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন তাঁরা হয় ত চিতপাবনদের জাত হিসাবে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মনে করেন না। কিন্তু বালাজী বিশ্বনাথ গদী-নশীন পেশোয়া হওয়ার পর একথা কেউ আদৌ মুখ খুলে বলতে সাহস করে না। কোকন প্রদেশের সব জাতের মত কোকনস্থ ব্রাহ্মণেরাও গরীব। কিন্তু বুদ্ধির বলে আর চরিত্রের জোরে, কতকটা ঘটনাচক্রেও, এঁরা মহারাষ্ট্রের সেরা জাত হয়ে দাঁড়িয়েছেন। শুধু যজন যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনে নয়, শৌর্য্য পরাক্রমেও চিতপাবন ব্রাহ্মণ কারও চেয়ে কম নয়। পেশোয়া বাজীরাও ও সরদার পটবর্দ্ধনের নাম ত মরাঠার ইতিহাসে স্থিরজ্যোতি নক্ষত্রের মত জ্বল্ জ্বল্ করছে। কিন্তু জাতীয় অধঃপতনের দিনেও বাপুসাহেব গোখলের মত শূর বীর, ঝাঁসীর লক্ষ্মীবাইয়ের মত নির্ভীক যোদ্ধাকে এই জাতই জন্ম দিয়েছে। পরশুরাম এঁদের কুলদেবতা। নিন্দুকেরা বলে যে এই বিপ্র অবতারের আশীর্ব্বাদে সাহস ও শৌর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষাত্রবিদ্বেষও এঁদের চরিত্রের একটা অঙ্গ হয়ে গেছে। আমি সে কথা বলতে প্রস্তুত নই, কিন্তু এটা ঠিক যে চিতপাবন ব্রাহ্মণেরা মনে করেন যে তাঁরা একাই ভারতের সব দুঃখ ঘোচাতে পারবেন, আর কাউকে দরকার নেই। এক জন সুবিজ্ঞ ইংরেজ ব'লে গেছেন এঁদের চরিত্র অনেকাংশে ইংরেজ চরিত্রের অনুরূপ। হয় ত সেই জন্যই ইংরেজের সঙ্গে এঁদের একটা রেশারেশি ভাব সর্ব্বদা রয়েছে, দুজাতের কিছুতেই বনে না। তা চরিত্র ইংরেজের মত হোক বা না হোক, চেহারায় সাদৃশ্য আছে। গৌর বর্ণ, নীল চোখ, কটা চুল এঁদের মধ্যে এত বেশী আছে যে এঁদিকে খাঁটি নেটিব অন্য মরাঠাদের সঙ্গে এক পর্য্যায়ে ফেলা শক্ত। কিন্তু এত দিন মহারাষ্ট্রের ভাগ্য

চালনা করেও এঁরা নষ্ট হয়ে যান নেই। আগের মত কষ্টসহিষ্ণু আজও আছেন আর চালচলন যৎপরোনাস্তি সাদাসিধে।

এ হেন জাতে জন্মেও আমাদের ডাক্তার সাহেব বোম্বাইয়ের জল হাওয়া সইতে পারলেন না। নগরে পৌঁছে মাথার গোল টুপিটাও গেল। এক খাকী সোলা টুপী মাথায় চড়ল। টিকিটা এখন প্রায় অদৃশ্য, যেটুকু ছিল তা বুরুশ মেরে বেশ ক'রে চুলের ভেতর বসান। সোলা টুপী খুললেও বিসদৃশ দেখাত না। মোরভট্ট মরবার আগেই ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। ছেলে ত আর পূজারী বামুন হবে না, তাই বৌ পার্ব্বতীকে এনেছিলেন পুণা শহর থেকে। গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, কিন্তু ইস্কুলে পড়েছিল। ইংরেজী না জানলেও মরাঠী ভাল লিখতে পড়তে পারত। বাপ লোকমান্য টিলকের ভক্ত ছিলেন তাই মেয়ে "কেশরী"র নিয়মিত পাঠক ছিল। "সুধারক" দলকে দেখতে পারত না। শ্বশুর বাড়ীর আবহাওয়ার সঙ্গে এ সব ঠিক খাপ খেয়ে গেছল। কিন্তু মুস্কিল হল নগরে এসে। পার্ব্বতী দেখলে যে স্বামী সনাতন নিরামিষ ভোজন ত্যাগ করেছেন, অন্ততঃ মাঝে মাঝে বাহিরে থেকে ডিম মাংস রান্না হয়ে আসে।

এক দিন জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার কি ও সব খাবার না হলে চলে না?"

শঙ্কর বললে, "চলবে না কেন? তবে আমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে বলে যে আমিষ ভোজন শরীরের পক্ষে বড় উপকারী। তবে তোর যদি ভাল না লাগে ত আমি বাইরে খেয়ে আসব এক এক দিন।"

পার্ব্বতী বললে, "না বাহিরে খাবেন কেন? খান ত ঘরেই রাঁধাবার বন্দোবস্ত আমি করব। আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে খেতে বলেছেন তাই কথাটা তুলতে হল। যে দিন মাংস হবে,

সে দিন আমাকে রান্নাঘরে খেতে অনুমতি দেবেন। আমি ত ও গন্ধ সইতে পারব না।"

একটা রফা হল। হিন্দু প্রথামত দুপুর সন্ধ্যা শঙ্কর রান্না-ঘরেই খেতে লাগল। সকালে চায়ের সঙ্গে ডিম, ও বিকেলে জলখাবারের সঙ্গে কিছু একটা বিজাতীয় জিনিস বাইরের ঘরেই খেত।

ব্রাহ্মণদের পর্দ্দা নেই, সুতরাং রোজ স্বামীর সঙ্গে পার্ব্বতী বেড়াতে যেত। কিন্তু একটু গোল বাধত পোষাক নিয়ে। সে ভালবাসত সেকেলে বিশহাতী নীলাম্বরী, দেশী কাঁচুলী আর পায়ে ভারী লাল পুণার চটী। বোম্বাই ফেরৎ ডাক্তার সাহেবের এতে লজ্জা হত।

সে বলত, "বোম্বাইয়ের গুজরাতী ও প্রভু মেয়েরা কেমন সুন্দর সুন্দর ছিটের পাতল পরে, তাই পরলেই ত হয়।"

পার্ব্বতী বলত, "বলেন ত ও কাপড় ঘরে পরতে পারি, কিন্তু ও প'রে কি রাস্তায় বেরোন যায়?"

শঙ্কর বিরক্ত হয়ে উত্তর দিত, "তোর মতে কি ওদের মেয়েদের লজ্জা সরম নেই? যত আব্রু কি তোদেরই?"

তাতে স্ত্রী বলত, "আপনি বলেন ত পরব।"

এ বিষয়টারও একটা নিষ্পত্তি হল। পার্ব্বতী মাঝে মাঝে হালকা ছিটের কাপড় পরত কিন্তু কাঁচুলী লাল চটী ছাড়ল না।

কিন্তু গোল বাধল অন্য বিষয়ে। শঙ্কর খুব ভাল টেনিস্ খেলত। তাই নগরে এসে বিশ্রামবাগ ক্লাবে রোজ খেলতে যেত। কখন কখন স্ত্রীও যেত। খেলা দেখত, অন্য মেয়েদের সঙ্গে গল্প গুজব ক'রে আসত। এতে তার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু

মাঝে মাঝে সাহেব লোকদের খেলতে নিমন্ত্রণ করা হত। কলেক্টর ও অন্যান্য সাহেবও শঙ্করের দলকে খেলতে নিমন্ত্রণ করতেন তাঁদের বাড়ীতে। পার্ব্বতী এ সব ব্যাপারে যোগ দিতে একেবারে নারাজ। অন্য মেয়েরা কেউ কেউ যেতেন, কিন্তু সে কিছুতেই একবারও গেল না। এতে স্বামী একটু বিরক্ত হয়ে অনুযোগ করাতে পার্ব্বতী বললে,

"আপনি কিছুতেই আমাকে বোঝাতে পারবেন না যে ওরা আপনাদের সঙ্গে সমান সমান ভাবে মেশে।"

"তুই কি বলতে চাস যে আমাদের কারও সম্মান জ্ঞান নেই?"

"আপনাদের সম্মান বজায় রাখাই ত আমাদের কাজ। আপনারা কিছু একটা ভুল বুঝে ওদের সঙ্গে মিশতে যান। যত ক্ষণ আমরা না যাই তত ক্ষণ ওরা জানবে যে অন্ততঃ এক জায়গায় আমাদের জাতীয় ইজ্জৎ বজায় রেখেছি।"

"এ সব তোর ঐ "কেশরী"ওয়ালাদের উলটো বুদ্ধি। এ বিষয়ে গোপালরাও গোখলের কি মত, তা জানিস? আমার "জ্ঞান-প্রকাশ"খানা পড়িস মাঝে মাঝে।"

"আপনি বললেই পড়ব। কিন্তু আমার মত বদলাবে না।"

শঙ্কর যে খোসামুদে ধাতের লোক ছিল তা নয়। কিন্তু তার বিশ্বাস যে গোঁড়ামির কেল্লার মাঝে ব'সে থাকলে সাহেবদের সঙ্গে সদ্ভাব কি ক'রে হবে? দেশের ভালর জন্য ওদের সঙ্গে একটা বোঝা পড়া ত দরকার। কিন্তু টিলকের ভক্ত পার্ব্বতীকে একথা কিছুতেই বোঝাতে পারলে না।

পার্ব্বতীর ছেলে বালকৃষ্ণ যখন দু বছরের হয়েছে তখন বিলেতে মহাযুদ্ধ বাধল। অল্প দিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে ব্যাপার অতি

গুরুতর। ইংরেজ সরকার বিপন্ন হয়ে পড়লেন। শঙ্করের ধারণা হল যে এই বিপদের সময় আমাদের দেশের লোক সরকারকে সাহায্য করলে চিরদিনের জন্য দুই দেশে একটা বন্ধুত্ব হয়ে যাবে। ইংরেজের সঙ্গে তার নিজের চিতপাবন জাতের অ-বনিবনাও দেখে সে চিরদিনই কষ্ট পেত। পাঁচ রকম ভেবে সে যুদ্ধে যাবে স্থির করলে। পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করলে। সে 'না' বলবার মেয়ে নয়। শুধু এই টুকু জিজ্ঞাসা করলে,

"আপনি ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ করবেন?"

"না, পার্ব্বতী, আমি যুদ্ধ করব না, কারও হয়েই নয়। আমি ডাক্তার, লোকের প্রাণ বাঁচাতে যাব। কিছু বাছবিচার করব না, সকলেরই সেবা করব। এতে তোর আপত্তি নেই ত?"

"আমি কেন আপত্তি করব? ৺বিঠোবা আপনাকে রক্ষা করবেন।"

শঙ্কররাও লেফ্‌টেনেণ্ট আগাশে হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে চ'লে গেল। পার্ব্বতী আর শিশু বালকৃষ্ণ তাকে বোম্বাইয়ে জাহাজে তুলে দিয়ে এল। তারপর মা ও ছেলে শেরপুরের বাড়ীতে গিয়ে রইল। যাওয়ার আগে শঙ্কর ৪০।৫০ বিঘে জমী কিনেছিল। জন খাটিয়ে পার্ব্বতী সেই জমী আবাদ করতে লাগল। সমুদ্রের ধারে বালির উপর খানিকটে নারিকেল বাগান ছিল, বাকী জমীটায় ধান চাষ হত। এ সব পার্ব্বতীকে দেখা শুনো করতে হত। জ্ঞাতিরা তার উপর অত্যন্ত নারাজ ছিল। শঙ্কর ডাক্তার হয়ে আহমদনগরে খুব রোজগার করছে শুনে তারা কিছু দিন বড় কষ্ট পেয়েছিল। তবে শঙ্করের বসত বাড়ী আর যজমান বৃত্তিটা তাদের হাতে এল। এইতে তারা কতকটা সান্ত্বনা পেয়েছিল। এখন পার্ব্বতী আসায় তাতেও

ছাই পড়ল। বড় রাগ হল, কিন্তু তারা করে কি ? শঙ্কর পলটনের অফিসার হয়েছে, যুদ্ধের দিন, তার স্ত্রীর সঙ্গে বিরোধ করতেও সাহস হয় না। ভেবে চিন্তে তারা ঠিক করলে যে দূরে দূরে থাকবে, পার্ব্বতীকে কোন রকম সাহায্য করবে না। তাতে কিছু এসে গেল না। পার্ব্বতীর সাহায্য দরকার ছিল না, সে বুদ্ধিমতী সবই ঠিক চালিয়ে নিতে লাগল। জ্ঞাতি ছাড়া অন্য ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়েদের সঙ্গে তার যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। সে লোকের বাড়ী বাড়ী হোমিওপেথিক ঔষধ দিত আর ইস্কুলের মেয়েদের সেলাই শেখাত। আগের মত সে "কেশরী", "কাল" এই সব গরম দলের খবরের কাগজ নিত। বড় মেয়েদের কাগজ প'ড়ে শোনাত, তাদের নানা বিষয় বুঝিয়ে দিত। এই রকমে দিন কাটতে লাগল। বালকৃষ্ণ চাকরদের সঙ্গে মাঠে বাগানেই বেশী সময় কাটাত। বেশ শক্ত বলিষ্ঠ ছেলে হয়ে উঠছিল। স্বামী বড়-সাহেব হচ্ছেন ব'লে পার্ব্বতীর কোন উৎকণ্ঠা ছিল না। নিজেকে মেমসাহেব তৈরী করবারও কোন আগ্রহ ছিল না। একে ত মরাঠা মেয়েদের এদিকে ঝোঁক কম। তার উপর শঙ্করের চিঠি পত্র থেকে পার্ব্বতী বেশ বুঝতে পারছিল যে স্বামীর সাহেবী নেশার ঘোর কেটে আসছে। মা ছেলের খরচ আর কতটুকু, তাই পার্ব্বতী জমীর আয় থেকে পয়সা বাঁচিয়ে আরও কিছু জমী কিনলে। এই ত এদের খবর। এখন দেখা যাক শঙ্কর চার বছর কি ক'রে কাটালে।

বোম্বাই থেকে বেরিয়ে লেফ্‌টেনেণ্ট আগাশে যথা সময় বসরায় পৌঁছল। পৌঁছে দস্তুরমত মেডিক্যালের বড় সাহেবের কাছে হাজির হল। তিনি দিন কুয়েক তাকে নিজের কাছে রেখে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি এক পাঞ্জাবী পলটনের

ছাউনীতে পাঠিয়ে দিলেন। কদিন বসরায় থেকে শঙ্করের দুপাঁচ জন ছোকরা বাঙ্গালী ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তারা বেশ ক'রে তাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিল যেন সে সব সময় নিজের মান ইজ্জৎ সম্বন্ধে জোগ থাকে, কেন না পলটনের সাহেব অফিসাররা নূতন ডাক্তারদের আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ভাবে, মোটে খাতির করে না। শঙ্কর মনে করলে যে ওরা নিশ্চয়ই বাড়িয়ে বলছে, বাঙ্গালী নিজে দুর্ব্বল তাই সর্ব্বদা অপমানের বিভীষিকা দেখছে। ছাউনীতে পৌঁছে কর্নেল সাহেবের অমায়িক ব্যবহারে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেল। অল্প দিনের মধ্যেই তার পলটন যুদ্ধের লাইনে গিয়ে পৌঁছল। মরণ বাঁচনের খেলার মাঝে কারও জাত বিচারের অবসর রইল না। কাল সাদা, হিন্দু মুসলমান সব একাকার হয়ে গেল। কয়েক মাস এই রকমে কাটল। কিন্তু এই বিষম বিপদের দিনে অফিসার সেপাই সবাই আগাশের ব্যবহারে মোহিত হয়ে যেত। যেখানে দরকার সেখানেই এই নির্ভীক, অক্লান্ত, স্বল্পভাষী ডাক্তার সাহেব হাজির। তার সাহেবী সভ্যতার মুখোস পরার সময় হত না। বোম্বাইয়ে সভ্য সমাজের যে সব কায়দা কানুন শিখেছিল সব যেন ভুলে গেছে। বাহিরে অফিসারের খাকী উর্দ্দীপরা, কিন্তু ভেতর থেকে ফুটে বের হচ্ছে চৌদ্দ পুরুষের সঞ্চিত তেজ। অফিসার মহল ছেড়ে সে সর্ব্বদা সেপাইদের কাছে কাছে ফিরত। যখন কোন সেপাই খাদের ভেতর ক্ষুধায় শ্রান্তিতে শুয়ে পড়ত সে পিঠে হাত বুলিয়ে কানে কি দুই একটা কথা বলত, সেপাই তৎক্ষণাৎ উঠে ব'সে আবার বন্দুক তুলত। অফিসারদের মনে যে একটু হিংসা না হত তা নয়। এ লোকটার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, প্রখর রোদে

মাথার টুপী ফেলে দিয়ে সেপাইদের খিদমৎ করছে। এ শিক্ষা কোথা থেকে পেলে, "A mere Baboo!" সাহেব, কি ক'রে তুমি বুঝবে যে এরা পরশুরামের বংশধর, একাই হাজার হাজার ক্ষত্রিয়ের সমকক্ষ। শত্রুর বন্দুকে, রোগে, রোদে, যখন পলটনের তিন ভাগের এক ভাগ খতম হয়েছে, তখন এরা বিশ্রামের জন্য পেছনে যাবার হুকুম পেলে। বসরায় ফিরল। আবার প্রকাণ্ড Mess Tent (খানার তাঁবু) উঠল, বরফ এল, সোডা এল, হুইস্কি এল। দিবানিশি হৈ হৈ কাণ্ড। আগাশের সাহেবী করার সাধ কিন্তু তখন অর্দ্ধেক মরে এসেছে। এক দিন কি হল, নিজের তাঁবুতে ফিরে এসে ধুতি পরবার বড় ইচ্ছা হল। মনে করলে, আমি যা তাই হয়ে একবার বসি। ধুতি প'রে খালী গায়ে বিছানার উপর আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে আছে। চোখ বুজে ভূত ভবিষ্যৎ সব ভাবছে। এমন সময় "হ্যালো", ব'লে এক কাপ্তান সাহেব এসে হাজির। আড়চোখে সে ডাক্তারের সাজটা দেখে নিলে। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কিছুই বললে না। খানিক ক্ষণ কথাবার্ত্তা কয়ে চ'লে গেল। পর দিন দুপুর বেলা শঙ্কর খেতে গিয়ে দেখে যে Mess তাঁবুর চারিদিকের কানাতে কানাতে তার ছবি, ব্যঙ্গ-চিত্র। The Doc at home, the Doc at dinner, the Doc at his ablutions, এই রকম সব নাম। সব গুলোতেই ডাক্তারকে লম্বা টিকি, লম্বোদর, ধুতিপরা, গা খোলা ক'রে এঁকেছে। এক বার ভয়ানক রাগ হল, কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই মনে পড়ল এই ত আমার সত্যিকার রূপ, ধরা পড়েছে মাত্র। খাওয়া দাওয়ার পর ছবিগুলো আস্তে আস্তে খুলে নিয়ে কর্নেল সাহেবের কাছে গিয়ে বললে,

"এগুলো দেখেছেন? বড় সুন্দর হয়েছে। অনুমতি করেন ত আমি নিই। আমার স্ত্রীকে পাঠাব।"

কর্নেল অপ্রস্তুত হলেন; কিন্তু সব চেয়ে অপ্রস্তুত হল আগের রাত্রের সেই কাপ্তানটী। সেই ছবিগুলো এঁকেছিল। কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে,

"ডাক্তার, আমায় মাপ করতে হবে। আমি না বুঝে বাঁদরামি করেছি।"

আগাশে তার করমর্দ্দন ক'রে হেসে বললে, "মাপ করার কিছুই নেই। হাসি তামাসা না করলে যুদ্ধের দিনে মানুষ বাঁচবে কি করে?"

ছবিগুলো কিন্তু শেরপুরে পার্ব্বতীবাইয়ের কাছে গেল।

আর এক দিন কর্নেল আগাশেকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "ডাক্তার, তোমার সঙ্গে কি পুণার টিলকের কোন যোগ আছে? হিন্দুস্থান সরকার জানতে চেয়েছেন।"

"আমার সঙ্গে যোগ? কিছু মাত্র নেই। আমি সামাজিক ব্যাপারে গোখলের ভক্ত, টিলকের নই। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের আমি কিছুই বুঝি না।"

"কিন্তু বোম্বাই সরকারের রিপোর্ট যে মিসেস্ আগাশে তাঁর গ্রামে, টিলকের রাজদ্রোহী খবরের কাগজ প'ড়ে শোনান। আর তিনি টিলকের কি একটা ফণ্ডে টাকা দিয়েছেন।"

"হতে পারে। তিনি ত আর সরকারের চাকরী করেন না। আপনি বিবাহিত, আপনার ত বোঝা উচিত যে স্ত্রীর নিজেরও একটা স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি আছে।"

"ভাল, আমি তা হলে সরকারকে জানাব যে আপনার সঙ্গে টিলকের কোন সম্পর্ক নেই।"

আগাশে এ সম্বন্ধে স্ত্রীকে কিছু লিখলে না। কারণ, জানত যে চিঠি পুলিশে খুলে পড়বে। এই টুকু মাত্র জানালে যে যুদ্ধ শেষ হলে সে চাকরী আর করবে না স্থির করেছে। চিঠি পেয়ে পার্ব্বতী মহা আনন্দিত হল।

কিছু দিন পরে আগাশের পলটন আবার যুদ্ধের লাইনে যাবার হুকুম পেলে। অফিসারদের খুব আনন্দ। তারা নানা রকম পুরস্কারের, তক্‌মার স্বপন দেখতে আরম্ভ করলে। সেপাইদের কিন্তু উৎসাহের অভাব। সাম্রাজ্যের গৌরব জিনিসটা সে বেচারারা কত টুকু বোঝে? জাতে পাঞ্জাবী, যুদ্ধ তাদের পেশা, এই পর্য্যন্ত। ডাক্তারের তাদের দেখে বড় দুঃখ হত। গরীব লোক, কিসের জন্য তারা গরু ভেড়ার মত প্রাণ দিতে যাচ্ছে? এবারকার যুদ্ধ ত আর সখের ব্যাপার নয়। এর আগেই পল্টনের দু তিন শ' লোক মরেছে। কেন তাদের এ বিড়ম্বনা?

যুদ্ধ চলেছে। আগাশে এখন কাপ্তান পদ পেয়েছে। একটা পাহাড়শ্রেণীর অন্য পিঠে তুর্কীরা আছে। . পাঞ্জাবীরা এ পাশে ছাউনী ফেলেছে আজ দুদিন। উপরওয়ালাদের হুকুমের অপেক্ষায় আছে। সন্ধ্যাবেলা হুকুম এল যে অবিলম্বে পাহাড় পার হয়ে, অন্য পিঠে এক বন আছে, সেইটে দখল করতে হবে চট্‌ ক'রে। এক জায়গায় দুই খাড়া পাহাড়ের মাঝে সরু রাস্তা আছে, সেইটে ধ'রে যেতে হবে। দুটোর সময় বেরিয়ে, অন্ধকারে, নিঃশব্দে তারা সেই ঘাটি পার হল। চাঁদ নেই। তারার আলোয় সেই ছ সাত শ' লোক পা টিপে টিপে চলেছে। ঘাটির অন্য মুখে খানিকটা খোলা জায়গা। সেই খানটায় গিয়ে দাঁড়াবামাত্র, চারিদিকের পাহাড়ের চূড়া থেকে পিট্‌ পিট্‌ ক'রে তুর্কী মেশিনগানের গুলি ছুটল। দেখতে

দেখতে চল্লিশ পঞ্চাশজন সেপাই ভুঁইয়ে লুটিয়ে পড়ল। তখন কর্নেল বুঝলেন গাধামি হয়েছে। হুকুম দিলেন,

"ঘুরে এখনই আবার ঘাটির পথে ফিরে চল। একটুও দেরী ক'র না।"

সবাই ফিরল। কাপ্তান আগাশে এক মিনিট বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর চীৎকার ক'রে হুকুম দিলে,

"ডাক্তার, ডুলী বেহারা, হাঁসপাতালের চাকর, সব দাঁড়িয়ে যাও।"

তারা সব খাড়া হয়ে গেল। আবার আগাশে চীৎকার ক'রে উঠল,

"অফিসারদের মধ্যে কেউ কি আমায় সাহায্য করতে পারবেন? অনেক সেপাই জখম হয়েছে।"

এক জন বুড়ো সাদা দাড়ীওয়ালা পাঠান সুবেদার সেলাম ক'রে কাছে দাঁড়ালেন। দুজনে তখন ছোট ডাক্তারদের সাহায্যে জখম লোক সব একত্র ক'রে তাদের সেবা করতে লেগে গেলেন। গুলি আরও খানিকক্ষণ চলল। জনা দুই তিন বেহারাও পড়ল। তারপর তুর্কীরা বুঝতে পারলে ব্যাপারটা কি। একটা প্রকাণ্ড সাদা আলো, সার্চ্চলাইট, পাহাড়ের উপরে হঠাৎ জ্বলে উঠল; আর তার কিরণ আগাশের সেবাদলের উপর পড়ল। যেন তুর্কীদের দেবতাও তাদের উপর থেকে আশীর্ব্বাদ করছেন!

যখন আগাশে প্রায় তিরিশ জন জখম সেপাই নিয়ে ছাউনীতে ফিরে এল, তখন সূর্য্য মাথার উপর চড়েছে। পৌঁছবামাত্র এক জন আরদালি তাকে জানালে যে কর্নেল এখনই ডেকেছেন। গিয়ে সেলাম ক'রে দাঁড়াল।

কর্নেল বললেন, "আপনি কার হুকুমে সেই ঘাটির মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন? জানেন, আমার স্পষ্ট হুকুমের বিরুদ্ধে আপনি কাজ করেছেন? আমি আপনার নামে রিপোর্ট করেছি বসরাতে।"

আগাশে উত্তর দিলে, "কর্নেল, জখম সেপাইদের ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালাবার জন্য আমি চাকরী নিই নেই। আপনি রিপোর্ট করুন, আমিও করব। অবশ্য, আমি আমার রিপোর্টে আপনার ভুল সম্বন্ধে কিছু বলব না। আপনার চুকের জন্যই এতগুলো প্রাণ গেল। কিন্তু সে কথা বলা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা।"

কর্নেল চ'টে আগুন হয়ে গেলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে উপরওয়ালার হুকুম মানার যে দরকার আছে তা আপনি বোঝেন না। এখনও আপনি বেয়াদবী করছেন।"

"বেয়াদবী হয়ে থাকে ক্ষমা করবেন, কর্নেল। কি বলতে কি বলেছি, সব বোঝবার এখন শক্তি নেই। কিন্তু এটুকু জানি যে আমি ডাক্তারের কর্ত্তব্য পালন করেছি। কোনও ডাক্তার আমায় দোষী করতে পারবেন না।"

"সুবেদার লাল খাঁ ত ডাক্তার নয়। সে কোন সাহসে আমার হুকুম অমান্য করলে? তাকে আমি তার তাঁবুতেই আটক রাখার হুকুম দিয়েছি। তার সম্বন্ধে আমি খুব কড়া রিপোর্ট পাঠাব।"

"সুবেদার সাহেবের মন যে কত উঁচু তা আমি ভুলতে পারব না। কিন্তু তাঁকে শাস্তি দেওয়া না দেওয়া আপনাদের হাতে, আমার হাতে নয়। আমাকে যদি অনুমতি করেন ত আমি যাই। এখনও মুখে জল দেওয়ার সময় পাই নেই।"

"আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন, কাপ্তান আগাশে।"

শঙ্কর তাঁবুতে যাওয়ার পথে লালখাঁকে দেখে গেল। তিনি বললেন, "কাপ্তান সাহেব, আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না। ভাল কাজের জন্য সাজা পাওয়া পলটনে আজ পর্য্যন্ত দেখি নেই। এখনও জেনেরাল সাহেবদের এত মাথা খারাপ হয়েছে আমার মনে হয় না। আর যদি সাজাই হয়, ত হবে। আমি সেপাই।"

বড় কর্ত্তারা রাগ করা দূরে থাক ডাক্তার ও সুবেদার দুজনেরই খুব সুখ্যাতি ক'রে মন্তব্য লিখলেন। কিছু দিন পরে খবর এল কাপ্তান আগাশে মিলিটারী ক্রস্ আর সুবেদার লাল খাঁ অর্ডার অফ্ মেরিট্ তক্‌মা পেয়েছেন। সুবেদার সাহেব খুশী হলেন, কারণ তিনি সরকারের উপর বিশ্বাস হারান নেই, কিন্তু আগাশের চাকরী সম্বন্ধে মনে আর কোনও উৎসাহ ছিল না, সে M. C. নিয়ে কি স্বর্গ পাবে?

কয়েক মাস পরে যুদ্ধ শেষ হল। আগাশে ছুটী চাইলে, কোনও কায়েম চাকরীই কবুল করলে না। যথা সময় তার জাহাজ বোম্বাই পৌঁছল। পার্ব্বতীবাই আর বালকৃষ্ণ তাকে নিতে এসেছে। তারা খাকী-পরা সেনানীদের মাঝে শঙ্করকে খুঁজছে। এমন সময় ধুতি চাদর লাল চটী পরা একজন লোক দৌড়ে এসে বালকৃষ্ণকে ছোঁ মেরে তুলে নিলে। বললে, "কিরে ব্যাটা, বাপকে চিনতে পারছিস্ না!" পার্ব্বতী স্বামীকে গড় হয়ে প্রণাম করলে। বুঝলে সে আজ স্বামীকে সব রকমে ফিরে পেয়েছে। তাকে আর পায় কে? সেই দিনই রত্নাগিরির জাহাজে আগাশে-পরিবার দেশে চ'লে গেল। কিছুতে শঙ্কর বোম্বাইয়ে থাকতে রাজী হল না। এক দিনও না।

শেরপুরে দুতিন দিন থাকার পর হঠাৎ পার্ব্বতী অসুখে পড়ল। কি অসুখ কিছুই স্থির হল না। শঙ্কর তার সমস্ত ডাক্তারী বিদ্যার

পুঁজী উজাড় করলে, কিন্তু রোগের কিনারা করতে পারলে না। যাবার সময় পার্ব্বতী বললে,

"আপনি বালকৃষ্ণকে নিয়ে যত শীঘ্র পারেন আবার নগরে ফিরে যাবেন। সেইখানেই ডাক্তারী করা সুবিধা।"

"না পার্ব্বতী, ডাক্তারী আর করব না। তুই থাকতিস্ তবুও করতাম না। তোর এই গাঁয়ের জীবনে নিজেকে মিশিয়ে দেব ঠিক ক'রেই এসেছিলাম। ভগবান তোকে নিলেন। কেন, তিনিই জানেন। আমি যতদিন থাকি তোর কাজই করব এইখানে। আবার যখন দেখা হবে, খুশী হ'বি।"

পার্ব্বতী চ'লে গেল। তারপর বালকৃষ্ণের হাত ধ'রে শঙ্কর সমস্ত দিন নিজের ক্ষেতে ক্ষেতে কাটাতে লাগল। আস্তে আস্তে জন মজুর কমিয়ে দিয়ে নিজেই লাঙ্গল ধরতে লেগে গেল। বালকৃষ্ণ গরু চরায়, জমী নিড়ায়, ফসল হলে ক্ষেত আগলায়। লেখা পড়ার বালাই বাপেরও নেই, ছেলেরও নেই।

দুই একবার কেউ বয়োবৃদ্ধ আপত্তি করায় শঙ্কর বলেছিল, "রাও সাহেব, চাষ যদি করতে হয় ত নিজের হাতে করাই ভাল। কোঁকনস্থ বামুনের ছেলে পেশোয়াও হতে পারে, তলোয়ারও ঘোরাতে পারে, দরকার হলে লাঙ্গলও চালাতে পারে। তাতে তার মান যায় না। জানেন ত?

ব্রাহ্মণ ঝালা কিতীহি ভ্রষ্ট।
তরী তিহীঁ লোকীঁ শ্রেষ্ঠ॥"
ব্রাহ্মণ হোক্ না যতই ভ্রষ্ট,
তবু সে এ তিন ভুবনে শ্রেষ্ঠ।

ডঙ্কার ডাক

কয়েক বছর আগে গল্পটা শুনেছিলাম। বাস্তবিক এরকম ঘটনা ঘটেছিল কি না জানি না। তবে যে কোনও দিন ঘটতে পারত তাতে সন্দেহ নেই।

উত্তর গুজরাতে অনেক রাজপুতের বাস। তাঁদের মধ্যে যাঁরা সেকালের সেনানী, এখন তালুকদার, তাঁদিকে গরাসিয়া বলে। এই গরাসিয়া তালুকদারদের বেশীর ভাগই গরীব, ধারে আকণ্ঠ ডুবে আছেন। কিন্তু এখনও কি সুন্দর এঁদের আদব কায়দা, কি আশ্চর্য্য এঁদের খানদানী চাল। যে গুজরাতী ভাষাটা একটা নিতান্ত আটপৌরে বড়বাজারের বুলি, তাই এঁদের মুখে এমন মিষ্ট শোনায়, মনে হয় যেন দিল্লীর উর্দ্দু, কি বুর্বঁ যুগের ফরাসী শুনছি। অতীতের স্বপ্ন নিয়ে এঁরা আছেন, বর্ত্তমানের মাঝে কিছুতেই নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেন নেই। ভরসা ক'রে মরচে পড়া তলোয়ারখানা ফেলে দিয়ে কলম ধরাটা আজও হয়ে ওঠে নেই। যাঁদের জায়গীর একেবারে পায়মাল হয় নেই, তাঁরা সাবেকী ঠাট কতকটা বজায় রাখেন। কিন্তু এমন অনেকে আছেন যাঁদের পুরানো ভাঙ্গাচোরা পৈতৃক কেল্লাটা ছাড়া আর কিছু নেই। কিছু নেই বলাটা ভুল হল। বাপ দাদার আমলের তলোয়ারখানা মখমলের খাপের ভেতর দেওয়ালে কোথাও ঝুলছে। তালুকদারই হোন আর সাধারণ রাজপুতই হোন, এঁরা বরাবর নিজেদের গ্রামের রক্ষক ব'লে মনে ক'রে আসছেন। রাতে দিনে যে কোনও সময়ে গাঁয়ের চাউড়ীতে (কাছারী) ডঙ্কা বাজলেই রাজপুত মাত্রেই সড়কী

তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়বেই। অন্ততঃ ইংরেজের পুলিশ দেশ রক্ষার ভার নেওয়ার আগে এর ব্যতিক্রম হত না। এখন সম্ভবতঃ অন্য পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে এটাও লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গুজরাতের এক গাঁয়ে এক নিতান্ত গরীব তালুকদার বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল হিম্মৎসিংহজী তখৎসিংহজী চৌহান। বংশের আদি পুরুষ, যিনি উদয়পুর থেকে এসে বাহুবলে জায়গীর, অর্জ্জন করেছিলেন, তাঁরও নাম ছিল হিম্মৎ সিংহ। তাঁরই নামে গাঁয়ের নামাকরণ হয়েছিল, হিম্মৎগড়। ক্রমে হিম্মৎগড় গ্রাম ও জায়গীর মহাজনের হাতে চ'লে গেছল। বাকী ছিল শুধু ভাঙ্গা কেল্লাটী। তারই দুটী ঘরে আমাদের হিম্মৎ সিংহ ও তাঁর রাজপুতানী বাস করতেন। আত্মীয় স্বজন কেউ ছিল না। সব মরে হেজে গেছল। গাঁয়ের লোক দেখা হলে হিম্মৎকে, সিংহজী কি ঠাকুর সাহেব ব'লে সম্বোধন করত। তার কারণও ছিল। প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ দেহ, ইয়া দুই গোঁফ কান পর্য্যন্ত পাকিয়ে তোলা, মেজাজ চড়া, তাকে সহজে কেউ চটাতে চাইত না। কিন্তু হিম্মতের পক্ষে মান সম্ভ্রম রাখা দিন দিন শক্ত হয়ে আসছিল। বছর কয়েক আগে, কপাল ঠুকে, কেল্লার এক ভাঙ্গা ঘরে ঘানি বসিয়েছিল। ধারধোর ক'রে এক বুড়ো বলদ সংগ্রহ করেছিল। বলদটা কানা ছিল তাই তার চোখ বাঁধতে হত না। এই ঘানি চালিয়ে কায়ক্লেশে এদের অন্ন সংস্থান হত। আটার রুটী বড় একটা কপালে জুটত না। মোটা মোটা কালো বাজরীর রুটী, কিছু লঙ্কার আচার বা শাক, এই ছিল খাদ্য। জোয়ান বয়সে হিম্মৎ ভীলেদের সঙ্গে তীর ধনুক নিয়ে বের হত, দু চারটে তিতির

খরগোশ, কচিৎ কখনও বা একটা হরিণ, মেরে নিয়ে আসত। সে সব অনেক দিন বন্ধ। এখন একমাত্র কাজ আফিঙ্গের নেশায় বুঁদ হয়ে ঘানি গাছে ব'সে কানা বলদটার ল্যাজে মোচড় দেওয়া। মৌজে থাকলে ভাঙ্গা গলায় গান ধরত। বাপ্পারাও, পৃথুরায়, পরতাপসিংহ প্রভৃতি যত শিশোদীয়া বীর ছিলেন, তাঁদের গুণগান করত। রাঠোর, হারা, এসব রাজপুতদের সে বাজে মার্কা ভাবত। তাই তাদের নাম বড় একটা করত না। রাস্তায় যেতে যেতে লোকে এই গান আর ঘানির সঙ্গত শুনে হাসত, বলত, "বুড়ো আজ বড় মৌজে আছে।"

এই ত হল হিম্মতের দৈনিক জীবন। তার রাজপুতানী লছমীবাইয়ের কিন্তু দিন কাটতে চাইত না। সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপি চুপি গিয়ে বেনের বাড়ী তেল বেচে আসত। গ্রামের সেকেলে বড় ইঁদারাটা থেকে খুব ভোরে জল তুলে নিয়ে আসত। পাড়া-পড়শীদের সঙ্গে জটলা করা সিংহজীর মানা ছিল। কাজেই তার সখী সাথী কেউ জোটে নেই। ঘরকন্না সামান্য, তার কাজই বা কতটুকু। সেটুকু সেরে বৃদ্ধ স্বামীর কাছে কাছেই ফিরত, ফাই-ফরমাশ খাটত। লছমীর রূপ অসাধারণ ছিল। মোটা সাদাসিধে গরীবী কাপড়ের মধ্য থেকে সে রূপ যেন আরও ফুটে বের হত। সেই কাঁচা সোনার রঙ্গ, টানা টানা কালো চোখ, মাধবীলতার মত দেহভঙ্গ, রাজমহিষী হলেও মানাত। হিম্মতের ত তাকে কাপড় গয়না দিয়ে সাজাবার সাধ্য নেই, তবে বড় ভালবাসত ছেলে মানুষ বৌটীকে, বড় আদর করত।

গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু প্রজারা সব জাতে ঘাঁচী ছিল। ঘাঁচীদের জাত ব্যবসা তেল বিক্রী। তাদের অবস্থা বেশ ভাল। হিম্মৎও যে

ঘানি বসিয়েছে, তা সবাই জানত। কিন্তু এমন ভাব দেখাত যেন কেউ কিছু জানে না। যেন হিম্মৎ সেই চিরদিনের তালুকদার সাহেব। যতদিন এ ভাব ছিল ততদিন কিছু গোলযোগ ছিল না। ক্রমে কিন্তু একটু গোলমাল হল। তার কারণটা বলি। ঘাঁচী-দের এক ছেলে, ব্রিজলাল, অনেক দিন থেকে বোম্বাইয়ে লেখাপড়া শিখছে। এখন কলেজে পড়ে। ছুটীতে বাড়ী এসেছে। এতদিন শহরের হাওয়ায় থেকে তার একটা বেশ স্বাধীন ভাব হয়েছে। নিঃস্ব গরাসীয়া তালুকদারের কাছে মাথা নোয়াতে সে প্রস্তুত নয়। ঘাঁচীদের এই প্রথম কলেজে-পড়া ছেলে। পাঁচ জনের কাছে তার কি খাতির! তার উপর আবার নানা রকম কাব্য-চর্চ্চা ক'রে তার মাথাটা একটু গুলিয়েছে। হৃদয় সৌন্দর্য্য-পিপাসু হয়েছে। এই ছোকরাটী গোল বাধালে। এক দিন ভোরবেলায় বেড়াতে গিয়ে দেখলে লছমীকে। ইঁদারা থেকে জল নিয়ে বাড়ী ফিরছে। কিবা সুন্দর মুখ, কিবা দেহের গড়ন, প্রতি পদক্ষেপে তার চারু অঙ্গে যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছে। গাগরীর জল তালে তালে ছলকে ছলকে নীচে পড়ছে। এ রকম ত ব্রিজলাল কখনও দেখে নেই। শহরে কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে দেখেছে, তাদের কত রকমের চমৎকার সাজ, কত বিচিত্র প্রসাধন! কিন্তু এ রকম চকিত হরিণীর মত চোখ, মরালের মত চলনভঙ্গী ত কখনও নজরে পড়ে নেই। চলেছে যেন রাজরাণী। কে এ? বাড়ী গিয়েই বোনেদের কাছে খোঁজ নিলে। তারা বর্ণনা শুনে বললে,

"বুঝেছি। গরাসিয়াদের বৌ লছমীকে দেখেছ বুঝি? তার কি এমন রূপ দেখলে? ছুঁড়ীর ছিরি ত কত, ঐ ছেঁড়া কাপড় পরে, তবু দেমাকে মট্‌মট্ করছে।"

ব্রিজলাল বললে, "তোমাদের কাছে তার রূপের কদর হবে কি ক'রে? তার সঙ্গে তোমাদের ঘাঁচী মেয়েদের আকাশ পাতাল তফাৎ।"

বোনেরা হাসতে হাসতে বললে, "দেখো ভাই, তার দিকে রাস্তায় হাঁ ক'রে চেয়ে থেকো না। বুড়ো ঠাকুর সাহেব জানলে অনর্থ বাধাবে।"

ব্রিজলাল তার ছোট্ট গোঁফে তা দিতে দিতে উত্তর করলে, "তোদের ঠাকুর সাহেবের গোঁফের চাড়ার পরোয়া আমি থোড়াই করি। ভারী ত তালুকদার! ভাঙা বাড়ীতে থাকে। ক-অক্ষর গোমাংস। ওর মত লোক বোম্বাইয়ে কত দরওয়ানী করে। ওদের আবার মান ইজ্জৎ!"

মুখে যাই বলুক ছোকরা কিন্তু লছমীকে দেখার লোভ সামলাতে পারলে না। মাঝে মাঝে ইঁদারার দিকে ভোরের বেলা বেড়াতে যেত, লছমীকে দেখে আসত। শুধু চোখের দেখা। লছমী কিন্তু বেচারার মনোভাব কিছুই বুঝতে পারত না। তার বরং এই সুদর্শন সভ্য ভব্য ছোকরাটীকে ভালই লাগত। ঘাঁচীর ছেলে, কিন্তু বেশ আদব কায়দা। লছমীকে দেখলে কেমন রাস্তা ছেড়ে দেয়, এক পাসে দাঁড়িয়ে থাকে! লছমীর মনের ভাব বোধ হয় মুখে প্রকাশ পেত। কেন না, ব্রিজলাল একেবারে মরমে মরেছিল।

বোনেরা ভাইয়ের ভাব গতিক দেখে ভয় পেলে, কি একটা ক'রে বসবে। মাকে সব কথা বললে। মা তখনই ছেলেকে কিছু বললেন না। মনে করলেন, "ঘোলা জল ঘাঁটিয়ে কাজ কি?" কিন্তু তাঁকে ঘাঁটাতে হল না। কিছু দিনের মধ্যে ঘাঁচী মেয়েদের ভেতর বেশ জটলা হতে লাগল যে লছমী রাজপুতানী তাদের

গোপালদাসের ছেলেকে যাদু করেছে। তখন ব্রিজলালের মা রূপালী-বাই ভাবলেন, "ব্যাপারটা বেশী দূর গড়িয়েছে, এর একটা প্রতিবিধান দরকার। ছুঁড়ীটাকে বেশ ক'রে দুকথা শুনিয়ে দেব।"

একদিন সন্ধ্যাবেলা লছমী যখন তেল নিয়ে বেনের দোকানে বেচতে এসেছে, রূপালী সেখানে উপস্থিত হয়ে তার সঙ্গে গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করতে লেগে গেল।

"কি রে লছমী, এখানে কি করতে এসেছিস্? তালুকদারের গিন্নী না কি বেনের দোকানে যায়?"

লছমী ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে। তার সঙ্গে একটা ঘাঁচীন এই রকম ক'রে কথা কইবে? কই, এ রকম ত কখনও হয় নেই। রূপালী আবার বললে,

"যা যা, ও সব চাল দিতে আসিস্ না। ঘরে নেই এক মুঠো বাজরী। একটা কানা বলদে টানে এক ভাঙা ঘানি, তবে খেতে পাস্। ভারী আমার গরাসিয়া রে!"

লছমী দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। পেছন থেকে রূপালী ঘাঁচীন চেঁচিয়ে বললে,

"ঘাঁচীর ঘরে বিয়ে হত, বর্ত্তে যেতিস্। আমাদের এক বাড়ীতে পাঁচ পাঁচটা বড় ঘানি চলে জানিস্? তার উপর আজ বাদে কাল আমার ব্রিজলাল ডিপ্টী কলেক্টর হবে, তখন আরও দেখবি।"

এই রকম আরও দুচার দিন হল। লছমী বুঝতে পারলে যে রূপালী সেই সভ্য শহুরে ছেলেটার মা। এক বার ভাবলে ব্রিজলালকে বলে,

"আমরা গরীব হলেও তালুকদার ঘরানা। তোমার মা আমাকে ও রকম করে কেন?"

আবার ভাবলে সেও ত ঘাঁচীর ছেলে, হয় ত প্রকৃতি একই রকম। বলতে গিয়ে আরও খাটো হতে হবে। কি করে? সহ্যও হচ্ছিল না। এক দিন সন্ধ্যাবেলা স্বামীকে ব'লে ফেললে,

"সিংহজী, ঘাঁচীর মেয়েরা আমায় যা তা কথা বলে, নানা রকম ঠাট্টা মস্করী করে। আমি আর দোকানে তেল বেচতে যাব না।"

সিংহজী তখন বেশ মৌতে আছে, কোন কথায় কান দেওয়ার মত অবস্থা নয়। উত্তর দিলে, "বেশী গোল করে, দিস্ দু ঘা ক'সে।"

"সে কি গো? আমি মারামারি করব কি?"

"তবে দোকান যাস্ না। কেন যাবি অপমান হতে?"

লছমী মাথায় হাত দিয়ে বসল। দোকানে যাবে না ত দুজনে খাবে কি? অথচ ঘাঁচীনদের ঠাট্টা তামাশা আর কিছুতে বরদাস্ত হচ্ছিল না। ভাবলে,

"যাক্ আবার একবার সিংহজীকে ব'লে দেখব সকালবেলা।"

পরদিন ভোরবেলা জল তুলে আনবার সময় রাস্তায় আবার ব্রিজলালের সঙ্গে দেখা হল। লছমী স্থির করলে, একবার একে ব'লে দেখি না। মুখ তুলে আস্তে আস্তে বললে, "তুমি কি গোপাল ভাইয়ের ছেলে?"

ব্রিজলাল একেবারে হাতে স্বর্গ পেলে। সলজ্জ হাসি হেসে বললে, "তুমি আমায় চেন? তোমার নাম লছমী, না? একটু বসা যাক চল ইঁদারার কাছে। কি বল?"

লছমী রাগে ঘৃণায় লাল হয়ে উত্তর দিলে, "আমি তোমার সঙ্গে ব'সে গল্প করব? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!"

ব্রিজলাল ভাবলে, "তবে কথা কইতে, এলে কেন?" মেয়েটী বড় লাজুক। কিন্তু মুখ লাল ক'রে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। প্রকাশ্যে বললে,

"তাতে দোষ কি লছমীবাই? আজ কালকার দিনে আমরা জাতে জাতে তফাৎ মানি না।"

লছমী সংসারের বেশী কিছু জানত না, কিন্তু এটুকু বুঝলে যে মূর্খতা ক'রে স্বামীর ইজ্জৎ খাটো করেছে। আর একটা কথাও না ব'লে চ'লে গেল। ব্রিজলাল হাঁ ক'রে চেয়ে রইল।

যখন লছমী বাড়ী ফিরল তখন হিম্মৎ ঘানি গাছে বসেছে। জল নামিয়ে স্বামীকে বললে,

"সিংহজী, তোমায় কাল রাত্রে বললাম, শুনলে না। ঘাঁচীনরা আমাদের গরীব ব'লে কত ঠাট্টা করে, মুখের উপর রোজ আমায় অপমান করে। আমার আর গাঁয়ের ভেতর যাওয়া চলবে না।" ব'লে কাঁদতে লাগল।

বৃদ্ধ সিংহজী অনেক কষ্টে নেমে লছমীর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "কাঁদিস্ না, লছমী। আমরা ত গরীব বটেই। কোন রকমে বাপ দাদার মান বাঁচিয়ে চলি। ঘাঁচীরা আজ বড় মানুষ হয়েছে। ইংরেজী রাজ্যে পয়সার কদর, বংশের কদর নেই। তুই চুপ কর, দুঃখ করিস্ না। আমি এক দিন ওদের এমন সাজা দেব যে সহজে ভুলবে না। এখনই ততটা রাগ হচ্ছে না, বুঝলি? একটু মাথায় খুন চড়া চাই। সবুর কর দুদিন, মৌকা আসবেই।"

সিংহজী একটু হেসে আবার ঘানির উপর চড়ল। লছমী বেচারা কাঁদতে কাঁদতে রান্নাঘরে চ'লে গেল। এক বার ভাবলে, "ব্রিজলালের কথা ব'লে দেখি খুন চড়ে কি না।" আবার মনে

করলে, "কিন্তু তাতেও যদি খুন না চড়ে ত আমায় ইঁদারায় ঝাঁপ দিতে হবে। কাজ নেই, দুদিন চুপ করেই থাকি।"

ভোরবেলা জল আনতে যাওয়া লছমী ছেড়ে দিলে। একটু বেলা ক'রে যেতে লাগল। এতে ব্রিজলালের হাত থেকে বাঁচল, কিন্তু ব্রিজলালের মার খর্পর বেশী ক'রে পড়ল। বেচারা লাচার হয়ে কোন রকমে সহ্য ক'রে যেতে লাগল। এই রকমে কদিন কেটে গেল।

এমন সময় একদিন, সন্ধ্যাবেলায় সিংহজী যখন মৌতাত ক'রে ঝিমোচ্ছেন, গাঁয়ের ডঙ্কা বেজে উঠল। দূরে একটা ভীষণ কোলাহল শোনা গেল। মূহুর্ত্তে সিংহজীর নেশা ছুটল। এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললেন, "লছমী, আমার হাতিয়ার দে।"

লছমী দেওয়াল থেকে খাপ শুদ্ধ তলোয়ারখানা পেড়ে দিলে, কিন্তু বললে, "তুমি এই বয়সে ডাকাতের সঙ্গে লড়তে যাবে, সিংহজী? যদি লেগে টেগে যায়। তার চেয়ে নিক্ না লুটে ঘাঁচীদের ঘর। কি এমন আমাদের বন্ধু তারা!"

সিংহজী চীৎকার ক'রে উঠল, "ছুঁড়ী, তোর মাথা বিগড়ে গেছে। আমি বুড়ো হয়েছি ব'লে ডঙ্কার ডাকে সাড়া দেব না? আমি কি ঘাঁচী, না চৌহান রাজপুত? ঘাঁচীরা তোকে গালাগালি দিয়েছিল? তা হোক্, হিম্মৎগড় আগে বাঁচাই, তার পর গোপাল দাসের সঙ্গে না হয় একবার দেখা ক'রে আসব।" ব'লে বুড়ো বেরিয়ে গেল গট্‌গট্ ক'রে, যেন আবার পঁচিশ বছরের জোয়ান হয়েছে।

ধেড় ভীলরা ততক্ষণে লাঠি নিয়ে চাউড়ীর সামনে জমা হয়েছিল। তাদের নিয়ে ডাকাতের উপর প'ড়ে তাদিকে খেদাতে হিম্মতের

বেশী ক্ষণ লাগল না। কিন্তু তার মাথায় ডাকাতের লাঠি লেগে জখম হল। রক্ত পড়তে লাগল। সেই অবস্থাতেই সে ঘাঁচী পাড়ায় গেল। গোপালদাস ঘাঁচীদের পটেল। তার বাড়ী গিয়ে দেখে, সে লুকিয়ে ঘানিশালে ব'সে আছে।

বজ্রগম্ভীর স্বরে হিম্মৎ তাকে বললে, "তোদের মেয়েরা নাকি আমার রাজপুতানীকে অপমান করে, গরীব ব'লে? হারামজাদা, আজ কোথায় থাকত তোদের গাঁ, হিম্মৎসিংহজী না থাকলে? তোদের জন্য জানও দেব, আবার তোদের কথাও সহ্য করব? এদিকে আয়।"

গোপাল কাঁপতে কাঁপতে কাছে এল। সেইখানে একখানা ছোট শাবল পড়েছিল। সিংহজী সেইটে তুলে নিয়ে দু হাতে সমস্ত শরীরের জোর দিয়ে বেঁকিয়ে গোপালদাসের গলায় হাঁসুলী ক'রে পরিয়ে দিলে। বললে, "এই আমার চিহ্ন রইল, ফের আমায় চটাস্ না।"

বাড়ী ফিরে গিয়েই হিম্মৎ শুয়ে পড়ল। লছমী তলোয়ার তুলে রেখে, স্বামীর মাথায় পটী বেঁধে দিয়ে, চরণ সেবা করতে লাগল। কিন্তু কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করার সাহস হল না।

পরদিন সকালে ঘাঁচীরা মেয়ে পুরুষ দল বেঁধে কেল্লায় এসে উপস্থিত হল। আগেকার দিনের মত দরজায় দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, "আর্জি আছে, ঠাকুর সাহেব। আপনার প্রজাদের আর্জি আছে।"

লছমী বেরিয়ে এল ঘোমটা টেনে। দেখলে গোপালদাসের গলার আভরণ। ঘাঁচী মেয়েরা কাঁদছে। রূপালী এগিয়ে এসে বললে, "লছমীবাই, তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। কিন্তু

আমি তোমার পায়ে ধ'রে মাপ চাইছি। দয়া ক'রে সিংহজীকে বল শেঠের গলা থেকে শাবলটা খুলে নিন।"

ব্রিজলালও সঙ্গে এসেছিল। সে সব কথা বুঝতে পারছিল না। সে তার কলেজের বিদ্যা নিয়ে এসব ঘটনার কিনারা করবে কি ক'রে? এই টুকু মাত্র স্পষ্ট দেখছিল যে তার বাপ মা আত্মীয় স্বজন সবাই লছমীর অনুগ্রহপ্রার্থী আর লছমীরা তাদের চেয়ে অনেক বড় একটা কিছু। তাই সেও জোড়হাত ক'রে দাঁড়িয়েছিল।

লছমী সিংহজীকে ডেকে, নিয়ে এল। তিনি এসে গোপাল দাসের পিঠে হাত রেখে বললেন,

"গোপাল পটেল, আমি এখনই শাবল খুলে নিতাম। তোমায় আর কষ্ট দিতাম না। কিন্তু আমার খোলবার সাধ্য নেই। বুড়ো হয়েছি, আধপেটা বই খেতে পাই না। রক্ত গরম না হলে ঐ শাবল সোজা করবার মত শক্তি কোথায় পাব? দুদিন সবুর কর। মৌকা আসবেই।"

ঘাঁচীরা সসম্ভ্রমে সেলাম ক'রে চলে গেল। ব্রিজলালের এ যাত্রা প্রেম করা হল না। কলেজ খুলতেই সে বোম্বাই চ'লে গেল।

বর্ণাশ্রম

আজ অনেক বছর হয়ে গেল, এক দিন আমি গুজরাতে আমার গাবুতে ব'সে আছি। দুজন বন্ধু গল্প করতে এসেছেন। একজন মুনসেফবাবু, জাতে মরাঠা ব্রাহ্মণ। অন্যটী ডাক্তারবাবু, জাতে গুজরাতী বেনে। আমাদের তর্কের বিষয় ছিল জাতিভেদ।

মুনসেফবাবু ব্রাহ্মণের উচ্চাসন থেকে সগৌরবে বলছিলেন, "জাতিভেদ গুণভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় স্পষ্টই বলেছেন যে গুণকর্ম্মের বিভাগ অনুসারে তিনি চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করেছেন।"

ডাক্তার বললেন, "গোড়ায় বর্ণ মানে ছিল রঙ্গ, অর্থাৎ আর্য্য-যুগের সাহেব-লোগ ও নেটিব। তারপর সাহেব-লোগেদের আবার প্রকৃতিগত বা ব্যবসায়গত ভাগ হল, গীর্জ্জার সাহেব, কেল্লার সাহেব আর পাটকলের সাহেব। এইখানে কিন্তু থামল না। গীর্জ্জার সাহেবের ছেলেরা গীর্জ্জাতেই রইল, কেল্লার সাহেবদের ছেলেদের কেল্লা থেকে বের হবার উপায় রইল না। পাটকলের সাহেবনন্দনদের পাটকল চালাতেই হবে স্থির হল। এ পর্য্যন্তও একেবারে বোঝা না যায় তা নয়। কিন্তু ভাগ হওয়া চলল। নানা রকম চুলচেরা ভাগ হতে থাকল। শেষ "বারা রাজপুতকে তেরা চৌকা"য় এসে দাঁড়াল। আজ যদি একবার আমাদের কোন গুজরাতী ভোজে আসেন ত দেখবেন যে ছুঁৎ বাঁচাবার জন্য কত রকমের আঁকাবাঁকা ক'রে আসন পাড়তে হয়। এর সঙ্গে গুণকর্ম্ম বিভাগের কি সম্বন্ধ রাও সাহেব কি বুঝিয়ে দেবেন ?"

রাও সাহেবের চোখে রাবিশের (কচ্‌রার) আবার তারতম্য কি? তিনি বললেন, "বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে ত আমরা দুই জাতই বুঝি। ব্রাহ্মণ জাতি আর ব্রাহ্মণেতর জাতি।"

আমি সবিনয়ে বললাম, "কথাটা কি অত সহজ? গীতাকার ত চার বর্ণের উল্লেখ ক'রে খালাস হলেন। অস্পৃশ্য পঞ্চম বর্ণ এল কোথা থেকে?"

এই থেকে আমাদের কথাবার্ত্তা পঞ্চম বর্ণের দিকে ফিরল। ঐ বর্ণের উপর অত্যাচার ব্রাহ্মণপ্রধান দাক্ষিণাত্যেই সব চেয়ে অমানুষিক। তাই মুনসেফ রাও সাহেব একটু গরম হয়ে বোঝাতে লাগলেন যে অনাচারী পূতিমাংস-ভোজীর সংস্পর্শে এলে ব্রাহ্মণের সত্ত্বগুণ বজায় রাখা অসম্ভব। আর ব্রাহ্মণ না থাকলে হিন্দু সমাজও দুদিনে ছারখার হয়ে যাবে।

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, "গেলই বা ওরকম ঠুনকো জিনিস," কিন্তু ভয়ে চুপ ক'রে গেলাম। প্রকাশ্যে বললাম,

"আমার বাঙ্গলা দেশে একটা কথা আছে, কালো বামুন, কটা শূদ্র আর বেঁটে মুসলমান। তিনটা জিনিসই অসামান্য ও অদ্ভুত, প্রায় দেখা যায় না। তাই সাক্ষাৎ হলে দূরে দূরে থাকাই ভাল। বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে, কথাটা মিথ্যা নাও হতে পারে। কিন্তু অন্তরের হিসেব নিলে কালো বামুন, কটা শূদ্র অনেক দেখা যায়। এই অন্তর বাহিরের একটা ভাল ক'রে হিসেব নিকেশের দিন এসেছে।"

ডাক্তারবাবুটী বর্ণাশ্রমের পক্ষপাতী ছিলেন না, অন্ততঃ কথায়। তিনি ভারী খুশী হলেন। তখনকার দিনে বর্ণাশ্রমের মানে

পরিষ্কার ছিল। আজ কাল তার নানা অর্থ করা হচ্ছে, নানা মতলবী লোকের সুবিধার জন্য। ডাক্তার এক গল্প বললেন,

"শ'খানেক বছর আগে এক রাজা শিকারে গিয়ে পথ হারিয়ে ছিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় অধীর হয়ে এক ক্ষেতে এসে উপস্থিত হলেন। চাষা লাঙ্গল দিচ্ছে। বলদ দুটো কিন্তু শ্রমে কাবু হয়েছে আর জোরে লাঙ্গল টানতে পারছে না। চাষা তাদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেও সন্তুষ্ট না হয়ে, মার দিতে লাগল পাঁচনবাড়ি নিয়ে। শেষ লাঙ্গল ছেড়ে গিয়ে রেগে একটা বলদের কান কামড়ে রক্ত বের ক'রে দিলে। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কি হে? অমন ক'রে গরুকে মারছ কেন?'

চাষা বললে, 'আমার গরু আমি মারব বেশ করব। তোর তাতে কি রে রাজপুত? আমি বামুন, তোর চেয়ে ঢের ভাল জানি কি ক'রে গরু রাখতে হয়।'

রাজার আর ঐ বামুনের জল খেতে প্রবৃত্তি হল না। পাসের ক্ষেতে গেলেন। সেখানেও এক চাষা লাঙ্গল দিচ্ছে জমিতে। তারও গরু শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে বাপু, বাছা, লক্ষ্মী, যাদু ব'লে পিঠ চাপড়ে তাদের চালাচ্ছে। কাজ শেষ ক'রে আগে গরুকে বিচালী জল দিলে, তারপর নিজের খাবারের পুটুলী খুলে বসল। তখন রাজা কাছে গিয়ে বললেন,

'আমায় কিছু খেতে দিতে পার ভাই? বড় ক্ষিদে পেয়েছে।'

চাষা বললে, 'আমি যে চামার, বাবা। তোমায় কি ক'রে খেতে দেব?'

রাজা বললেন, 'তুমি আমার চোখে বামুন। চামার ঐ ক্ষেতে লাঙ্গল দিচ্ছে।' ব'লে রাজা চাষার সঙ্গে রুটী ভেঙ্গে খেলেন।"

ডাক্তারবাবু গল্পটা ব'লে হেসে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কালো বামুন কটা শূদ্র দেখলেন ত? বেশীর ভাগই ঐ রকম।"

আমি বললাম, "তা দেখলাম। হয়ত কাল আপনাদের আরও দেখাতে পারব। রাও সাহেব আপনার গল্পটা বিশ্বাস করলেন না, ডাক্তার। দুজনেই আসুন না কাল সকালে আমার সঙ্গে খানাপুরে। এখান থেকে কোশ পাঁচেক দূরে নদীর ধারে। ব্যাপারটা হয়েছে এই। সেই গাঁয়ে অনেক বামুনের বাস। কয়েক ঘর বেনে পাটিদারও আছে। কিন্তু অস্পৃশ্য ধেড় প্রায় পঁচিশ ঘর গাঁয়ের লাগা ধেড়ওয়াড়াতে থাকে। এই ধেড়রা চাষবাস কিছু কিছু করে কিন্তু তাদের প্রধান উপজীবিকা নদীতে মাছ ধরা। মাছ ধ'রে কিছু খায়, কিন্তু বেশীর ভাগ শহরে নিয়ে গিয়ে বেচে। বহু বছর ধ'রে এই ব্যাপার ঠিক চ'লে আসছিল। কিন্তু গেল পাঁচ সাত বছর হতে গাঁয়ের বামুনরা আর বেনেরা তাদিকে মাছ ধরতে দিচ্ছে না। বেচারারা গরীব, চুপ ক'রে ছিল, কিন্তু ছাপ্পান্ন সংবতের দুর্ভিক্ষ থেকে আর এ জুলুম সহ্য করতে রাজী নয়। কেন না পেটে অন্ন নেই। এর প্রতিবিধানের জন্য দরখাস্ত করেছে।"

স্বজাতি বৎসল মুনসেফ বললেন, "আপনি সেখানে নিজে কখন গেছলেন কি? বামুনরা ধেড়দের মাছ ধরা কি ক'রে বন্ধ করতে পারে, আমি ত বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতে পারছেন না? বামুন বেনেরা মনে করলে গরীব বেচারাদের হাজার রকমে গাঁয়ে অতিষ্ঠ ক'রে তুলতে পারে। এ কথা ত বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু কথাটা আরও স্পষ্ট ক'রে বলি। নদীর ধারের ক্ষেতগুলোই সব চেয়ে ভাল। সুতরাং সেগুলো

আস্তে আস্তে সব এসেছে বামুন ও বেনেদের অধিকারে। এই ক্ষেতগুলো আর নদী এর মাঝখানে আগেকার দিনে ছিল এক তিন চার হাত চওড়া আল। তার উপর থেকে ধেড়রা মাছ ধরত। এখন সে আল নেই। ধেড়রা বলছে বামুনরা সেই আলের জমী নিজেদের ক্ষেতের সামিল ক'রে নিয়ে চষে ফেলেছে। বামুনরা বলছে যে আলটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে নদীর মধ্যে চ'লে গেছে। কাল আমি যাব দেখতে। আসবেন আপনারা দুজন? হয়ত কালো বামুন কটা শূদ্র দুই নজরে পড়বে।

ঠিক হল দুজনেই পরদিন ভোরে আমার সঙ্গে খানাপুর যাবেন। সন্ধ্যার আগেই এঁরা বাড়ী চ'লে গেলেন। আমার তাঁবুতে একা বড় বিশ্রী মনে হতে লাগল। ভারতবর্ষের জাতসমস্যা আমায় বড় কাবু ক'রে দেয়। শেষ স্থির করলাম যে তখনই খানাপুর চ'লে যাব, বন্ধুরা সকালে আসবেন এখন। সেদিন খুব চাঁদের আলো। খাবার দাবার এক বেতের বাক্সে বন্ধ ক'রে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম উটের পিঠে। আমার চাকরকে ব'লে গেলাম যেন সে খেয়ে দেয়ে বিছানাপত্র নিয়ে টাঙ্গায় আসে। ঘণ্টা দেড়েকে খানাপুর পৌছলাম। ধর্ম্মশালা সড়কের উপরেই। সেই খানে রাত কাটাবার ইচ্ছা। গ্রামটা রাস্তা থেকে এক হাঁক দূরে। ধর্ম্মশালার আঙ্গিনা পাড়াগেঁয়ে সব উঠানের মত গোবর নিকানো, পরিষ্কার। চাঁদের আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছে। ঘরের দাওয়ায় ব'সে খাবারের বাক্স খুলতে যাচ্ছি, এমন সময় ভেতরের দালান থেকে একটা গোঙ্গানি শব্দ শুনতে পেলাম। উটওয়ালাকে দেখতে পাঠালাম। সে এসে বললে যে এক জন সাধু অসুখ হয়ে পড়ে আছে আর যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করছে। উঠে তার কাছে গেলাম। লোকটা বয়স্থ। ময়লা

গেরুয়া পরা। ভুঁইয়ে পড়ে আছে এক ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে। পাসে এক কমণ্ডলু ও চিমটে। গা বেশ গরম ঠেকল। লোকটা মাঝে মাঝে কাসছে আর সেই সময় ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। আমি একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম। জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে কিছু বুঝতে পারলাম না। বেচারার কথা জড়িয়ে আসছে। ইতিমধ্যে কখন বাড়ীর পেছন থেকে এক বুড়ো আর বুড়ী বেরিয়ে এসেছে, আর আমার চাকরের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি কথা কইছে। আমি চাইতেই প্রণাম করলে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কে তোরা ?"

বুড়ী উত্তর দিলে, "আমরা এই গাঁয়ের ধেড়া, বাবা। আমার নাম জমনী। এই সাধুটার কাছে রয়েছি।"

"পটেল বুঝি তোদের এখানে থাকতে বলেছে ?"

"না, বাবা। কেউ থাকতে বলে নেই। আমি এই ধর্ম্মশালায় গোবর নিকোতে এসেছিলাম তিন চার দিন আগে। দেখি এক সাধু এসে নেমেছে। বেচারা বুড়ো, ব্যারামে ভুগছে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে বললে আগের দিন হতে উপোসী আছে। আমি গাঁয়ে গিয়ে, আমার মানুষ এই নানজীকে ডেকে আনলাম। এক কোণে খড় পেতে একটু বিছানা ক'রে দুজনে মিলে বুড়োকে শুইয়ে দিলাম। তার পর ঘর থেকে একটু দুধ নিয়ে এসে আস্তে আস্তে খাইয়ে দিলাম। আমাদের হাতে দুধ খেলে, বাবা। বললে, সাধুর আবার জাত কি ? কিন্তু, বাবা, সেই সময়ে রাস্তা দিয়ে দুজন বামুন যাচ্ছিল, গোবিন্দভাই আর রণছোড়ভাই, তারা দেখতে পেলে। দেখে চেঁচিয়ে ব'লে গেল, 'খুব সাধু, ধেড়ের ভাত খাচ্ছে।' সেই থেকে তিন দিন গেছে। পটেলকে বলেছি, গাঁয়ের বামুনদের বলেছি, কিন্তু কেউ একবার এদিকে এলও না, একটা পয়সাও

দিলে না। আমাদের আর কতদূর দৌড়, বাবা? ছেলেদের মুখের দুধ যা দুই এক পলা আনতে পেরেছি তাই খাইয়েছি।" বুড়ী কাঁদতে লাগল।

আমার প্রথম কাজ হল উট পাঠিয়ে দেওয়া ডাক্তারবাবুকে আনতে। একটুকরো কাগজে লিখে দিলাম,

"কটা শূদ্র পেয়েছি। বোধ হয় সকাল নাগাদ দু চারটে কালো বামুনও ধ'রে দিতে পারব। মুনসেফ রাওসাহেব যেন সকালে আসেন।"

নানজী ধেড়কে পাঠালাম পটেলকে ডাকতে। তার পর তাড়াতাড়ি নিজের খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলাম। পটেলকে ধমকা ধমকি করতে সে অম্লান বদনে মিথ্যাকথা বললে যে ধর্ম্মশালায় কেউ প'ড়ে আছে তা সে মোটেই জানত না। আমি বললাম,

"তা বেশ করেছ! ধর্ম্মশালায় কেউ না খেতে পেয়ে মরলে তার খবর রাখা ত তোমার কাজ নয়! এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরে কথাবার্ত্তা কইব। এখন তোমার চৌকীদার কয়েক জন এখানে হাজির রাখ। এখনই গরম জল আর গরম দুধ ঠিক করতে হবে রোগীর জন্য। ডাক্তারসাহেব আসছেন।"

পটেল বেচারা হাতে নাতে ধরা পড়েছে, ভয়ে কাঁপছিল। তাড়াতাড়ি সব কাজ ক'রে নিজের কসুর কতকটা শুধরে নিতে চেষ্টা করলে। গ্রামের বামুন বেনে প্রজারা কেউ সে রাত্রে উপস্থিত হল না। পটেল বললে যে তারা ঘুমিয়ে পড়েছে।

যথা সময় ডাক্তার এলেন। রোগী দেখে বললেন, খুব বেশী জ্বর, বুকে সর্দ্দি বসেছে, খাওয়ার অভাবে নাড়ী বড় দুর্ব্বল, জীবনের

আশা খুব কম। ডাক্তার লোকটী দার্শনিক কি তার্কিক ছিলেন না, মেজাজও ধীর। তাই বাক্য ব্যয় না ক'রে তৎক্ষণাৎ কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেলেন। ঔষধ পথ্য খাওয়ান, বুকে পলেস্তারা, পায়ে গরম জলের বোতল, সবই চলল সারা রাত। নানজী ও জমনী সমানে জেগে জোগাড় দিতে লাগল। পটেলকে শাস্তি স্বরূপ সেইখানেই বসিয়ে রাখলাম। কিন্তু সে একটু দূরে দূরে রইল। পাছে তার অমূল্য ধন জাতটা যায়। আমার বিছানা এসেছিল, তিনটা রাত্রে আমি শুয়ে পড়লাম পাসের কুঠুরীতে। কিন্তু এক ঘণ্টা না যেতে যেতে ডাক্তার ডেকে বললেন, "সাহেব, সাধুর হয়ে গেছে।" উঠে কাছে গেলাম। দেখি সাধুর শান্ত মুখে মৃদু মৃদু হাসি, যেন বলছে, "কি মজার দেশ এই দুনিয়া।" জমনী পাসে ব'সে অধীর হয়ে কাঁদছে। বুড়ো ভবঘুরেরও একজন কাঁদবার লোক জুটল শেষ পর্য্যন্ত।

দিনের আলো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দভাই, রণছোড়ভাই প্রমুখ প্রজারা উপস্থিত হলেন। তাঁরা জানালেন যে সন্ন্যাসীর সৎকারের সব বন্দোবস্ত করেছেন। তত ক্ষণে আমার চাকর ও উটওয়ালা (তারা দুজনেই ধেড়) গাঁয়ের ধেড়েদের সাহায্যে সাধুর দেহ ফুল দিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে উঠানে বের করেছে। আমি গোবিন্দকে বললাম,

"তোমরা কেন মিছেমিছি কষ্ট, খরচ পত্র করবে? ধেড় সাধু, তার শব ধেড়েরাই নিয়ে যাবে। আমার চাকরটা বোকা, সেই দুপয়সা খরচ করবে বলেছে। তোমরা বেলা নটার সময় নদীর ধারে মাছ ধরার জায়গায় হাজির থেকো।"

আমার মুখ দেখে বোধ হয় ওরা সন্দেহ করলে যে গতিক ভাল নয়। রণছোড়ভাই একটু মধুর হেসে কাছে এল, বললে,

"সাহেব, আমরা এই সাধুর অসুখের কথা কিছু জানতাম না। নইলে আমরা ওকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে সেবা করতাম।"

আমি খুব নীরস ভাবে বললাম, "জানতে না ভালই। হিন্দুর গাঁয়ের দরজার কাছে এসে একজন অতিথি, সন্ন্যাসী, না খেতে পেয়ে ম'রে গেল। ভরসা করি এতে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না, ইহলোকে কি পরলোকে।"

ধেড়রা সাধুকে নিয়ে গেল তার শেষ যাত্রায়। আমি মশান ঘুরে ন'টার সময় নদীর ধারে গেলাম। ডাক্তারবাবু ও রাও সাহেব দুজনেই সেখানে ছিলেন। আমি কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা পড়া করলাম না। সকলের সাক্ষাতে তিন হাত জমী জলের কিনার থেকে মেপে আলাদা ক'রে দিলাম। কাঁটার বেড়া তখনই দেওয়া হয়ে গেল।

ধেড়দের মাতব্বরদিকে জানালাম, "ঐ জমী সরকারী, ওর উপর থেকে তোরা যত খুশী মাছ ধরতে পারিস্। কারও অধিকার নেই তোদের মানা করবার।"

গাঁয়ের বামুন বেনেদেরও ব'লে দিলাম, "মনে রেখো, বেড়ার বাহিরে সরকারী জমী। ওখানে কখনও তোমরা গোলমাল করলে আমি তার প্রতিবিধান করব। আর, গাঁয়ের ভেতর এই নিয়ে যদি ধেড়দের উপর কোন রকম জুলুম কর, ত আমি তাদের ডেকে শিখিয়ে দেব তাঁরা কি ক'রে সেই জুলুমের পাল্টা জবাব দিতে পারে। আমি পেছনে আছি জানলে ওরা অতি সহজেই তোমাদিকে নাস্তানাবুদ করতে পারবে।"

রণছোড়ভাই এগিয়ে এসে খুব গরম হয়ে বললে, "সাহেব, তুমি হিন্দু হয়ে এই রকম ক'রে ছোট লোকদের প্রশ্রয় দিচ্ছ আর ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নষ্ট করছ?"

আমি বলতে পারতাম আমি কি রকমের হিন্দু। একে বাঙ্গালী তায় শূদ্র, তার পর অন্য অনেক কিছু। সে সব ব্যাখ্যা না ক'রে শুধু উত্তর দিলাম,

"এ গ্রামে কে ব্রাহ্মণ, কে নয়, সে সম্বন্ধে আমার বেশ স্পষ্ট জ্ঞান হয়েছে। যাদের মানুষ মেরে জাত না যায়, তাদের কি আর দুটো মাছ ধরা দেখলে জাত যেতে পারে?"

মুনসেফবাবু সব কথাই শুনছিলেন। তিনি ইংরেজীতে বললেন,

"বিন্ধ্যাচলের উত্তরে যথার্থ ব্রাহ্মণ নেই। এরা সব বর্ণশঙ্কর, ব্রাত্য। তবু আপনার পঞ্চম বর্ণকে প্রশ্রয় দেওয়াটা বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হচ্ছে। আপনি বেদজ্ঞ হয়ে এটা কি ক'রে করলেন?"

আমি উত্তর দিলাম,

"বেদজ্ঞ ব'লেই হয়ত করলাম। তার পর, আমার কালো আর কটার philosophy (তত্ত্ব) ত আপনাকে কালই বলেছি। বর্ণভেদ ভেঁতরের জিনিস, বাইরের নয়। জমনী আর নানজীর মনে কি ক'রে কষ্ট দেব? আপনাদের সামনে লজ্জা হল, তাই। নইলে গোবিন্দ ভাইয়ের দলকে হয়ত আমার তমোগুণের তাণ্ডব একটু দেখিয়ে দিতাম।"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন,

"সাহেব, তোমরা বাঙ্গালীবাবুরা কি সত্যি হিন্দু? না এতকাল মাছ খেয়ে খেয়ে সব হিন্দুয়ানী খুইয়েছ?"

বঞ্জারা সরদারনী

পশ্চিম ভারতে আজও কত রকমের ভবঘুরে জাত আছে। তাদের আচার ব্যবহার চাল চলন, সাজপোষাক নানা বিচিত্র ধরণের। এদের মধ্যে অনেকগুলো জাত আছে যারা সমাজের শত্রু, চুরী ডাকাতী ক'রে খায়। আবার দুই একটা এমন জাত আছে যারা সমাজের বন্ধু ও সেবক; যেমন গুজরাতের বঞ্জারা (**বন্জারা**)। এক সময় এই বঞ্জারাদের গুজরাতে ও তার আসে পাসে সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু দেশে রেল ও পুলিশের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় এখন এদের জাত ব্যবসায় এক রকম বন্ধ হয়ে গেছে। তবে রেল থেকে দূরে, দেশী রাজ্যের সীমানার ভেতর দুপাঁচটা ছোট ছোট দল এখনও তাদের পূর্ব্ব পেশা চালাচ্ছে। বেশীর ভাগ বঞ্জারা এখন রেল লাইনের উপর মজুরী ক'রে খায়, কোম্পানীর জন্য পাথর বালি বয়ে আনে। কি অবস্থার পরিবর্ত্তন! এমন কি, দুমুঠো অন্নের জন্য কেউ কেউ ঘর বেঁধে গাঁয়ে বাস করেছে, লোকের ক্ষেতে রোজ মজুরী করে।

আগেকার দিনে এদের পেশা ছিল বড় বড় সওদাগরদের লক্ষ লক্ষ টাকার মাল নগর হতে নগরান্তরে গাধার পিঠে বোঝাই ক'রে নিয়ে যাওয়া। দরকার হলে শেঠ সাহুকাররা নগদ টাকাও এদের মারফতে চালান করতেন। বিশ্বাসঘাত কাকে বলে এরা জানত না। মাল কি টাকা এদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত, পাত্তায় পৌছে দেবেই। কখনও অন্যথা হত না। স্ত্রী সন্তান নিয়ে বড় বড় দল বেঁধে রাস্তায় চলত, কাউকে ভয় করত না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলেও এরা

সমাজ সেবক ব'লে কোনও রাজা এদের গায়ে হাত তুলতেন না। চোর ডাকাতের সঙ্গে যুদ্ধ করার জোর এদের নিজেদেরই যথেষ্ট ছিল। রাত্রিবেলা বঞ্জারাদের ডেরা বা পাড়াও পাহারা দিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঘের মত ভয়ানক কুকুর। এই কুকুর আজও পাওয়া যায়। চৌকীদারী কাজের জন্য এদের সমকক্ষ কোন দেশে আছে কি না সন্দেহ।

বঞ্জারারা কাব্যপ্রবণ। বেছে বেছে নদীর ধারে কি ঝরণার পাসে রমণীয় আবেষ্টনের মাঝে ডেরা গাড়ে। চাঁদ উঠলে বাঁশী বাজিয়ে নাচে গায়। সদানন্দ, কারও সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে না। পাড়াওয়ে অতিথি এলে তাকে কত আদর যত্নে তুষ্ট করে। দিবারাত্র খোলা হাওয়ায় থেকে অনিন্দ্য স্বাস্থ্য। পুরুষদের লম্বা ছিপছিপে অথচ বলিষ্ঠ গড়ন। আর মেয়েরা হরিণের পালের মাঝে ঘুরে ঘুরে হরিণীর চাহনি আর হরিণীর দেহভঙ্গী পেয়েছে। দেখলে চোখ জুড়ায়।

বৎসরান্তে একবার শিবরাত্রির সময় সব দলগুলো একত্র হতে চেষ্টা করে কোন বিখ্যাত মেলায়। সব দল একই মেলায় জুটে উঠতে পারে না। কিন্তু এরা শিবরাত্রি উপলক্ষে ছুটী নেয় আর আনন্দ করে সবাই। সেই কদিন মেয়ে পুরুষ মিলে অভ্র কি কাঁচ বসান ফুলকারীর রঙ্গীন পোষাক প'রে ঘুরে বেড়ায়। নাচে গায়, খাওন দাওন করে। ওদের বিয়ে থা করবার মৌসুমও ঐটে। সাধারণ হিন্দুর চেয়ে একটু বেশী বয়সে বিয়ে করে। বিয়ে করে বললাম, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বরই বরকর্ত্তা, কনেই কন্যাকর্ত্তা, বিয়ের রীতি গান্ধর্ব্ব। তবে সনাতন প্রথামত বাপে বাপে দরদস্তুর ক'রে বিয়েও কখন কখন হয়। অনেক সময় এমন হয় যে বিয়ে

ক'রে মেয়ে তার স্বামীর দলের সঙ্গে মেলার শেষে চ'লে গেল, তার পর দশ বছর আবার বাপের দলের সঙ্গে জুটতে পারলে না। মোটের উপর এদের জীবনযাত্রা বাস্তবিকই romantic, রহস্যময়, চমৎকার। একেবারে আমাদের জীবনের উলটো। রাস্তার কষ্ট, রাস্তার বিপদ, গ্রাহ্য না ক'রে লম্বা লম্বা পাড়ি। মনোরম নূতন নূতন জায়গায় পাড়াও ফেলে দুচার দিন বসা। আবার সমস্ত সংসার মাথায় নিয়ে পাড়ি। এই ক'রে হেসে খেলে, নেচে গেয়ে, দিনের পর পর দিন কাটান। অতি সহজভাবে, বিনা আয়াসে, কর্ত্তব্য পালন। দরকার পড়লে সেই কর্ত্তব্যের খাতিরে মুহূর্ত্তের মধ্যে অজানা সাগরে চিরদিনের জন্য ডুব মারা। আপশোশ নেই, পিছটান নেই, চিন্তা নেই, "আমি ম'লে এদের কি হবে।"

প্রায় আশী বছর আগের কথা বলছি। বাহাদুরসিং ব'লে এক বঞ্জারা দলপতি ছিল। তার দল মস্ত বড়, আর তারা পাড়ি দিত খুব লম্বা লম্বা। পুরানো দল। বাহাদুরের বাপের আমলে একবার এরা আমীর খাঁর পিণ্ডারী পলটনকে হটিয়ে দিয়েছিল। সেই যুদ্ধের কথা শুনে হোলকার মহারাজ এদের ডেকে পাঠান, তাঁর ফৌজে চাকরী নেবার জন্য।

বাহাদুরের বাপ মহারাজকে ব'লে এসেছিল, "ধর্ম্মাবতার, আমরা আসমানের চিড়িয়া। আমাদের চাকরী দেওয়া মানেই আমাদের ডানা ভেঙ্গে দেওয়া।"

মহারাজ বলেছিলেন, "তোর মত জঙ্গী জোয়ান কি মুটে মজুরের কাজ ক'রে জীবন কাটাবে?"

তাতে বঞ্জারা সরদার সগর্ব্বে উত্তর দিয়েছিল, "হুজুর, আমিও রাজা। তবে আমার রাজ্য মাথায় বয়ে বেড়াই, এই যা তফাৎ।

কেন মিছেমিছি হুজুর আমার রাজ্য কেড়ে নেবেন, আমার পায়ে জবরদস্তী ক'রে শেকল বাঁধবেন?"

যশোবন্তরাও মহারাজ এই কথা শুনে হেসে বহুমূল্য খেলাৎ দিয়ে সরদারকে ছুটি দিয়েছিলেন। সেই বাপের ছেলে এই বাহাদুরসিং।

বাহাদুরের দলও আছে, সবই আছে। কিন্তু দুঃখ তার যে একটা ছেলে নেই, ভাইও নেই। তার কিছু হলে এত বড় দলটা একত্র রাখবে কে, চালাবে কে? স্ত্রী নেই, মেয়ে একটী আছে তার নাম হাসি। বাপের সাধ যে হাসির বিয়ে দিয়ে জামাইকে এনে দলপতির কাজ শিখিয়ে তৈরী ক'রে নেবে। জামাই পাওয়ার ত কোন মুস্কিল নেই। হাসির মত রূপসী বঞ্জারার ঘরে বড় একটা জন্মায় না।

দলের লোকে বলে, "পৃথিবীতে যত সুন্দর জিনিস আছে, নদী পাহাড় ঝরনা, আসমানে যত সুন্দর জিনিস আছে, চাঁদ, তারা বিজলী, সকলের হাসি চুরী ক'রে এনে আমাদের হাসিবাইকে গড়া হয়েছে। এর জোড়া কোথা পাবি?"

তার উপর হাসিবাই বাহাদুরসিং নায়কের একমাত্র কন্যা। অমন মেয়েকে পেলে কত রাজা রাজড়া লুফে নেবে। কিন্তু ঐখানেই ত যত গোল। লুফে নেবে কোথা থেকে? বাহাদুর মেয়েকে কোথাও যেতে দেবে না। কিছুতেই নিজের দল ছাড়া করবে না। ভাল ঘরের ছেলে কি আর কেউ নিজের দল ছেড়ে শ্বশুরের দলে বাস করবে? যাক, এখনও দেরী আছে। এই ত হাসি সবে পনের বছরে পা দিয়েছে।

একবার বাহাদুরসিং অমদাবাদে নওলচাঁদ শেঠের কাছ থেকে অনেক টাকার মাল নিয়ে বের হল। মাল পৌছে দিতে হবে রতলাম রাজ্যে। যেতে হবে পালনপুরের আসে পাসে অনেকগুলো ছোট ছোট পাহাড়ে রাজ্যের মধ্য দিয়ে।

রওয়ানা হওয়ার আগে নওলশেঠ সাবধান ক'রে দিলেন, "বাহাদুর নায়ক, আমি খবর পেয়েছি, যে রাস্তায় ভীলেদের লুটেরা দল মহা গোলমাল সুরু করেছে, রাজওয়াড়ার অকর্ম্মণ্য সেপাইগুলো কিছুই বন্দোবস্ত করতে পারছে না। তুমি খুব সাবধান।"

বাহাদুরসিং বললে, "শেঠজী, তুমি বে-ফিকির থাক। বাহাদুর মাল পৌছে দেবেই। যতক্ষণ তা না করছে, তার জান দেবারও ফুরসৎ নেই।"

কদিন পরে, এক পাহাড়ে রাজ্যের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে বাহাদুররা ডেরা করলে এক বড় নদীর পারে। কাছাকাছি কোথাও পাড়াওয়ের উপযোগী খোলা জমী না পেয়ে একেবারে নদীর বালির উপর রাত কাটাবে স্থির করলে। নদী তখন শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে, হেঁটে পার হওয়া যায়। চারিদিকে বালি আর বালি। প্রথম রাত্রে চাঁদের আলো ছিল। খুব গান বাজনা হল। চাঁদ অস্ত যাওয়ার পর, "ভাই সব, হুশিয়ার", হেঁকে বাহাদুরসিং শুয়ে পড়ল। দলের ছোট কর্ত্তা রতনসিং খানিকক্ষণ টহল দিলে। তার পর সেও শ্রান্ত হয়ে ব'সে ব'সে ঝিমোতে লাগল। চারিদিক নিঝুম। প্রায় তিন প্রহর রাতে হঠাৎ কুকুর-গুলো সব একসঙ্গে ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠল। বঞ্জারারা জেগে উঠে চকিতের মত লাঠি ধ'রে দাঁড়াল, মশাল দুচারটে জ্বালালে। সেই আলোয় দেখা গেল যে প্রায় তিরিশজন ভীল তাদের ঘিরে

ফেলেছে চারিদিক থেকে। কেবল কুকুরের ভয়ে এগোতে পারছে না। তখন, বাহাদুরের জোয়ানরা শেঠের মালের বস্তা আর মেয়েছেলেদিকে মাঝে রেখে, গোল দুই সারি হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কুকুরগুলো আর ভীলেদের ঠেকাবে কতক্ষণ? তারা তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করলে। তীরের ঘায়ে দুতিনটে কুকুর শুয়ে পড়ল। তখন সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ল ভীলেরা জলের স্রোতের মত। বঞ্জারারা তৈরী ছিল। লেগে গেল দুই দল লাঠি নিয়ে। লাঠির ঠকাঠক্ আওয়াজে আর যোদ্ধাদের হুঙ্কারে সেই নির্জ্জন নদীতীর গমগম ক'রে উঠল। কাছে বালির উপর কয়েক জোড়া চকাচকী বসেছিল। তারা এই দাঙ্গা হাঙ্গামার শব্দে বিরক্ত হয়ে কাঁ কাঁ ক'রে আকাশে উড়তে লাগল।

নদী থেকে একটু দূরে এক ভাঙ্গা ধর্ম্মশালা ছিল। সেখানে সেই রাত্রে চারজন পথিক শুয়েছিল। চারজনেরই পাসে প্রকাণ্ড লাঠি। একজনের কাছে আবার তার উপর এক তলোয়ার।

আর আসে পাসে জন মনুষ্য নেই। বর্ষাকালে যখন নদী জলে ভ'রে যায়, তখন এই জায়গায় পারঘাট হয়। ধর্ম্মশালা রাত্রে লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকে। দুদিকে ছোট ছোট দোকান বাঁধে। এখন কিছুই নেই। লাঠির আওয়াজ শুনে চার জনেই চমকে জেগে উঠল। তলোয়ারওয়ালা আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলে, "কিসের আওয়াজ বল্ ত, বেচরসিং?" বেচর বললে, "কে জানে, সরদার! এখানে ত কাছাকাছি কোনও বসতি নেই। আচ্ছা দেখে আসি।" ব'লে বেরিয়ে গেল লাঠি নিয়ে। একটু বাদে ফিরে এসে বললে,

"নদীর বালির উপর লড়াই চলেছে, সরদার। মশাল জ্বলছে। এক দিকে মনে হল ভীল ডাকাত, কিন্তু কাদের সঙ্গে লড়ছে বুঝতে পারলাম না।"

সরদারের নাম জেসংজী। জোয়ান, সুপুরুষ। সে তাড়াতাড়ি তলোয়ার কোমরে বাঁধতে বাঁধতে বললে, "চল্, দেখাই যাক না। দরকার হয় লেগে পড়া যাবে।" নদীর পার বরাবর যেতেই হাঁক শুনে বুঝতে পারলে যে ভীলরা বঞ্জারাদের পাড়াওয়ের উপর চড়াও করেছে। তারা নিজেরাও বঞ্জারা। চারজনেই দৌড়ল চেঁচাতে চেঁচাতে, "এই এলাম ব'লে, ভাই সব।"

যখন যুদ্ধস্থলে পৌঁছল, তখন বাহাদুরসিং লাঠি খেয়ে ভুঁইয়ে পড়েছে, কিন্তু তলোয়ার হাতে এক ছোকরা তার পাসে দাঁড়িয়ে হুকুম চালাচ্ছে,

"মজবুত হয়ে দাঁড়াও, ভাই সব। কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দিও না ডাকুদের। শেঠের মাল এক বস্তাও যেন না যায়। রাত ফরসা হওয়া পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতেই হবে কোন রকমে। ততক্ষণে লোকজন এসে পড়বে। ঐ শোন! কে সাড়া দিচ্ছে। এইবার জোর লাঠি চালাও। এক সারি এগিয়ে গিয়ে ডাকুর উপর পড়। পেছনের সারি দাঁড়িয়ে থাক।"

ভীলরা লাঠি-সোটার যুদ্ধে বড় একটা সুবিধা করতে পারে না। দূর থেকে তীরন্দাজীই হচ্ছে ওদের লড়াই। বাহাদুরের দল এগিয়ে জোরে লাঠি চালাতেই তারা নড়বড় করতে লাগল। তার উপর আবার যখন জেসং ভাই আর তার সঙ্গীরা "মার, মার" ক'রে মাঝে এসে পড়ল তখন ভীলরা আর মোটে দাঁড়াতে পারলে না। রণে ভঙ্গ দিলে। দূর থেকে বার দুই তীর ছুঁড়লে কিন্তু অন্ধকারে

তাতেও সুবিধা করতে না পেরে সব পালাল, বঞ্জারারা হাসি-বাইয়ের জয়জয়কার করতে লাগল।

জেসংজী যখন ভীলেদের দূরে খেদিয়ে দিয়ে ফিরে এল, তখন পূর্ব্ব আকাশে ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। সরদার তখনও ভুঁইয়ে পড়ে রয়েছেন আর সেই ছোকরাটী কাঁদতে কাঁদতে তাঁর মুখে জলের ঝাপটা মারছে। জেসংজী দেখেই বুঝতে পারলে সে ছেলে নয় মেয়ে, ওই হাসিবাই হবে। বাহাদুরের বেশী লাগে নেই। একটু পরেই উঠে বসল। তখন মেয়েটী আস্তে আস্তে উঠে বাপের হুকুম নিয়ে রতনসিংএর সঙ্গে চারিদিক ঘুরে জখম মানুষ ও কুকুরের সেবার বন্দোবস্ত করতে লাগল।

বাহাদুর জেসং ভাইকে কাছে বসিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে। জেসং জানালে যে তার দল বহুদূরে আজমীরের দিকে আছে, সে তার সঙ্গীদের নিয়ে সেইখানে যাচ্ছে। তার বাপ বেঁচে আছেন, তাঁর নাম রাজসংজী। বাহাদুর রাজসংকে এক সময়ে চিনত। খবরাখবর জিজ্ঞাসা করতে লাগল। শেষ নিজের মাথার পাগড়ী খুলে জেসংএর মাথায় বেঁধে দিয়ে বললে,

"বাবা, তুমি এলে ব'লে আমার ইজ্জৎ রক্ষা হল। তোমার মত আমার যদি একটী ছেলে থাকত ত আজ আমার ভাবনা কি ?"

হাসি কাছে ছিল, বললে, "বাবা, জেসংজী না এলে কি হত ? আমি শেঠের মাল খোয়াতাম ? তবে যে আমাকে তুমি তোমার বেটা বল ?"

বাপ মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে উত্তর দিলে, "তুই ত আমার বেটা বটেই। কিন্তু বড় ছেলেমানুষ যে তুই। তা, মানুষের কি আর দুই বেটা থাকে না ?"

হাসি সত্যি বড় ছেলেমানুষ। বাপের মনের ইচ্ছা যে কি তা মোটে বুঝতে পারলে না। জেসংজী কিন্তু পারলে। তার মুখ লাল হয়ে উঠল।

বাহাদুর শুধু এইটুকু বললে, "এবার মেলার সময় তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

এর ভেতর কিন্তু একটু গোলযোগ ছিল। জেসংজীর নিজের দল নেই। এ কথা সে কবুল করতে লজ্জা পাচ্ছিল। রাজসংজী শেষ জীবনে আফিম ধ'রে কাজের এ রকম অব্যবস্থা করেছিলেন যে, তাঁর জীবদ্দশাতেই দল প্রায় ভেঙ্গে গেছল। কোন শেঠ তাঁকে আর মাল দিতে চাইত না। স্পষ্ট বলত যে ভরসা হয় না। এই সবে বুড়োর মন ভেঙ্গে গেল, আস্তে আস্তে জীবনটাও গেল। লোকজন সব ছত্রভঙ্গ হল। কেউ বা অন্য দলে ভর্তি হল। কেউ বা মজুরী ক'রে খেতে বেরিয়ে গেল। জেংসএর বয়স কুড়ির উপর নয়। সংসারের জ্ঞানই বা কতটুক? সে পারলে না দলটা একত্র রাখতে। কেবল তিনটী জোয়ান, যারা তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, তারা কিছুতেই তাকে ছাড়লে না। চারজনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল একটা নূতন দল গড়বার উদ্দেশে যখন এই ব্যাপার ঘটল।

খাওয়া দাওয়ার পর বাহাদুররা আপন গন্তব্য পথে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে রতনসিং জেসংকে এক পাসে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে,

"নায়ক, তুমি আমাদের সরদারের মেয়েটীকে বিয়ে কর না। এ রকম মেয়ে আর কোথাও পাবে না। তোমাদের দুজনকে বড় মানাবে। আমাদের জোয়ানরা তোমার উপর এত খুসী যে কি বলব!"

জেসংজী গম্ভীর হয়ে গেল। মুখ না তুলেই উত্তর দিলে, "তোমাদের সরদার বোধ হয় আমার বাবাকে বলবেন ঐ কথা শিবরাত্রির মেলায়।"

চ'লে যাওয়ার সময় হাসি জেসংএর কাছে এসে তার নিজের তৈরী এক ফুলকারীর ফতুয়া দিয়ে বললে, "জেসং ভাই, বাবা ঠিক কথাই বলেছিলেন, তুমি ঠিক সময়ে না এসে পড়লে আমি কি ডাকাত তাড়াতে পারতাম? এই জামাটা আমাদের মনে ক'রে কখন কখন প'র।"

জেসং হেসে বললে, "হাসিবাই, আমার ত লাঠি তুলতেও হয় নেই। তুমি ত ভালগুলোকে আগেই ভাগিয়ে দিয়েছিলে। জামাটা দাও, তুলে রাখব। ফের যখন তোমাদের কাছে আসব তখন পরব। আমাকে মনে থাকবে ত?"

হাসি উত্তর দিলে, "তোমাকে ভুলতে পারতাম, কিন্তু আপন হাতের তৈরী জামা ত দেখলেই চিনতে পারব।"

হাসি চ'লে গেলে পর জেসংজী সেই ফতুয়া গায়ে দিয়ে বসল সেইখানে। বেচর কাছে এসে বললে, "সরদার, কি ভাবছ? বাই বড় সুন্দর মেয়ে। কি লড়াইটাই লড়ছিল কাল রাত্রে। আবার আজ সারা সকাল পাখীর মত গান গেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

জেসং হতাশভাবে উত্তর দিলে, "বেচরসিং, তোদের সরদারনী হওয়ার যোগ্য মেয়ে বটে। কিন্তু তুই একটা দলের মত দল বাঁধতে চেষ্টা কর, নইলে আমি কোন মুখে ওর বাপের কাছে যাব?"

বেচর বন্ধুকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য বললে, "এই দেখ না। শিবরাত্রির পরই জোগাড় ক'রে দিচ্ছি। মেলাতে সারা জাতটার জমায়েৎ হবে। সেইখানে সকলের সঙ্গে কথা কইব।"

জেসং কিন্তু খুব শক্ত হয়েই বললে, "মেলায় আমি এবার যাব না, বেচর। ভিখারী হয়ে সেখানে গেলে নিজের মুখে আরও চুনকালী পড়বে।"

"আচ্ছা, সরদার। পরোয়া নেই। অন্য রকমে চেষ্টা করব। মাল কিছু কিছু পেলে আমরা চারজনেই ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারি। দরকার হয় দুটো বন্দুক রাখব। একবার শেঠদের বিশ্বাস জন্মান চাই। তাহলেই আর কোনও গোল হবে না।"

কয়েক মাস পরে শিবরাত্রির মেলায় বাহাদুরসিং সদলবলে উপস্থিত হল। লোকও এবার জমেছে অনেক। খুব ধুমধাম, আমোদ আহ্লাদ চলল। হাসি অন্য মেয়েদের সঙ্গে নাচ গানে মেতে থাকে সমস্ত দিন। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা শোবার আগে রোজই একবার মনে হয়, "কই, জেসং ভাই ত আজও এল না। কাল নিশ্চয় আসবে।" কিন্তু জেসং এবার এল না। বাহাদুরও নিরাশ হল। তার বিষয় নানা লোককে জিজ্ঞাসা পড়া করলে কিন্তু কেউই ঠিক খবর দিতে পারলে না। একটা গুজবমাত্র কানে গেল যে তার বাপ রাজসংজী মারা গেছে। বাহাদুর মনে স্থির করলে যে তাদের দল আজমীর থেকে ফিরতে পারে নেই, দূর দেশে ঘুরছে।

আরও এক বছর কাটল। এই বছরটা জেসং প্রাণপণে চেষ্টা করেছে নিজের একটা নিয়মিত ব্যবসায়ের গোড়া পত্তন করতে। কিন্তু তার বাপ এমন বদনাম রেখে গেছে যে কোন বড় সওদাগর তাকে আমল দেয় না। অল্প স্বল্প মাল কাছাকাছি নিয়ে যাবার ভার সে পাচ্ছিল বটে। তাতেই তাদের কজনের কোন রকমে গুজরান হচ্ছিল। কিন্তু তা নিয়ে বাহাদুরের মত সরদারের কাছে মেয়ের মাগনী করতে যাবে কোন মুখে ?

এই এক বছরে হাসিও বড় হয়েছে। আর তাকে ছেলে সেজে মানায় না। তার কাজ কর্ম্মও এখন অনেক বেড়েছে। বাহাদুরসিং বুড়ো হচ্ছে তাকে যত্ন আত্তি করবার সমস্ত ভার হাসির উপর। এখন সমস্ত দিনের পাড়ির পর বৃদ্ধের গা হাত পা কামড়ায়। গরম তেল নিয়ে সন্ধ্যাবেলা বাপের চরণ সেবা হাসির একটা নিত্যকর্ম্ম। তা ছাড়া ঘরকন্নার কাজ, রতনসিংএর সঙ্গে দলের কাজ, সবই করতে হয়।

বাহাদুরের মন ভাল নেই। প্রায় রোজই মেয়েকে বলে, "আমার দেহ ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছে। আর দুদিন পরে কি হবে?"

হাসি বলে, "তুমি ভেব না বাবা। আমি রতনসিংকে নিয়ে সব চালিয়ে নেব।"

তাতে অনেক সময় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাহাদুর বলে, "জেসং ছোকরা.ত কই আর এল না।"

হাসি বেশ একটু জোরে বলে, "নাই বা এল। তুমি একটা বেগানা লোকের জন্য মন খারাপ করতে পাবে না, বাবা। এত ভাব কেন বল ত।"

এই রকম করতে করতে আবার শিবরাত্রি এসেছে। মেলায় বঞ্জারারা দলে দলে এসে জমেছে। বাহাদুরের দল এক পাসে নদীর ধারে খুব সুন্দর জায়গা বেছে পাড়াও ফেলেছে। হাসি জায়গাটা দেখে পছন্দ করেছে। বাহাদুর নিজে এবার বড় একটা আমোদ উৎসবে যোগ দিতে পারে না। হাসিকে কেবল বলে,

"তুই অন্য মেয়েদের সঙ্গে সব জায়গায় যাওয়া আসা করবি। তুই কেন বুড়ো বাপের কাছে সারাদিন বসে থাকিস্?"

কিন্তু হাসিরও ভাল লাগে না নাচ গান। মন ভাল নেই। সন্ধ্যার সময় এক এক দিন নদীর চরের উপর ঠাণ্ডা হাওয়ায় দু দণ্ড ঘুরে আসে। নইলে সারাক্ষণ বাপের কাছে কাছেই থাকে। গেল বছর শোবার সময় সে রোজ একবার ভাবত, "কই জেসংভাই ত এল না।" এবার তাও ভাবে না। তারা শুনেছে যে জেসংএর বাপ মারা গেছে। তার দল ছত্রভঙ্গ হয়েছে। সে কি আর আসবে? কিন্তু মাঝে মাঝে বিনা কারণে বুক দুড় দুড় করে। অচেনা পায়ের শব্দ শুনলেই কি রকম চমকে ওঠে।

মেলার তিন চার দিন হয়ে গেছে। এক দিন সন্ধ্যার সময় হাসি নদীর চরে বেড়াতে গিয়ে জলের ধারে বসেছে। জলে পা ডুবিয়ে দিয়েছে। দু হাতে আঁজলা ভ'রে জল তুলছে, আবার হাত ঘুরিয়ে জল চারিদিকে উড়িয়ে দিচ্ছে। এমন সময় শুনতে পেলে সেই চরের উপর কাছেই কে বাঁশী বাজাচ্ছে। সুরটা একটা তাদের সাধারণ নাচের সুর। হাসি নিরিবিলি ব'লে এই জায়গাটায় আসে। এ আবার কে আপদ এসে জুটল। হুড়মুড় ক'রে উঠে পড়ল, পাড়াওয়ে ফিরে যাবে ব'লে। কিন্তু পা চলতে চায় না। কে বাজাচ্ছে বাঁশী? আবার ব'সে পড়ল। তখন কে আস্তে আস্তে ডাকলে, "হাসিবাই।" মুখ ফিরিয়ে দেখলে একজন বঞ্জারা জোয়ান, মুখটা চেনা চেনা।

"আমায় চিনতে পারছ, বাই? আমি বেচরসিং।"

"মনে নেই ত। আমি কি কখনও দেখেছি তোমাকে?"

"আমি জেসংজীর দলের লোক। এক দিন নদীর ধারে আমায় দেখেছিলে। মনে পড়েছে?"

"না, কই মনে পড়ছে না ত। চল, তোমায় পাড়াওয়ে বাবার কাছে নিয়ে যাই।"

"তাঁকে সেলাম ক'রে এসেছি। তিনিই বললেন, তুমি এদিকে বেড়াতে এসেছ। তা চল, হাসিবাই, আবার পাড়াওয়ে যাই সরদারের কাছে।"

দুজনে যখন গেল বাহাদুরের কাছে, বাহাদুর হেসে বললে, "শুনেছিস্ হাসি? জেসংজী এসেছে মেলায়। খানিক দূরে পাড়াও ফেলেছে। আমাদের খবর নেবার জন্যে বেচরকে পাঠিয়েছে। কাল দুপুরবেলা দুজনকে এখানে রুটী খেতে আসতে বলেছি তোর কাছে।"

হাসির মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হল না। তার কেবল মনে হচ্ছে কোথাও পালিয়ে যাই। যদি অন্ধকার না হত, সবাই দেখতে পেত যে তার মুখ একবার লাল হচ্ছে, একবার সাদা হয়ে যাচ্ছে। বেচর সেলাম ক'রে চ'লে গেল। হাসি যত শীঘ্র পারে বাপকে খাইয়ে দাইয়ে শুয়ে পড়ল। দলের লোকেরা উৎসব থেকে ফিরে আসা পর্য্যন্ত আজ আর অপেক্ষা করলে না।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, "জেসং ভাই কেন এসেছে? আসবে না কেন? মেলা দেখতে এসেছে, আর পাঁচজন যেমন আসে। তুই সেজন্য ঘেবড়ে যাচ্ছিস্ কেন?" ছেলেমানুষ ত! ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে দ্বিগুণ বেগে খুব সশব্দে ঘরকন্নার কাজ করতে লেগে গেল। খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে নিজে সযতনে সাজগোজ করতে বসল। হাতে কত চুড়ী কঙ্কন পরালে, চুলে সোনা রূপোর যত ফুল ছিল সব লাগালে, চোখে সুরমা টেনে দিলে। তার

পর তার মার দরুন খুব ভাল রঙ্গচঙ্গে কাপড় যেটা ছিল সেইটা পরলে। আসুক না জেসংজী, দেখুক সে কেমন আনন্দে আছে! ওদের খাইয়ে দাইয়ে আজ সে নিশ্চয় নাচতে যাবে। যদি জেসংজী মনে করে যে তার জন্য উৎসবে যাচ্ছে না ত কি লজ্জার কথাই হবে!

দুপুরবেলা জেসংজী আর বেচাসিং খেতে এল। দুজনে বাহাদুরের পায়ের ধূলো নিয়ে বসল। হাসি একটু দূরে রান্নার জায়গায় ছিল। আড়চোখে দেখতে লাগল। জেসং তার তৈরী সেই ফতুয়াটা পরে এসেছে। হাসির মুখটা অকারণ লাল হয়ে উঠল। মনে হল, পালাই। কিন্তু এ রকম করলে ত চলবে না, অতিথি এসেছে, তাদের আদর অভ্যর্থনা করতে হবে ত! আস্তে আস্তে কাছে গেল। কিন্তু অতিথিদের দিকে চাইতে পারলে না। বাপকে জিজ্ঞাসা করলে,

"বাবা, খাবার দেব? সব তৈরী আছে।"

বাপ বললে, "তাড়াতাড়ি কি? জেসং ভাই এসেছে দেখতে পাচ্ছিস্ না? মনে আছে ত? সেই নদীর ধারে, এক দিন যখন ভীলেরা আমাদের উপর চড়াও হয়ে এসেছিল।"

জেসং সঙ্কোচ ক'রে আস্তে আস্তে বললে, "আমায় হয় ত ভুলে গেছেন। কিন্তু নিজের তৈরী ফতুয়াটা মনে আছে ত? আর এই পাগড়ী, সেদিন সরদার নিজের মাথা থেকে খুলে বেঁধে দিয়েছিলেন।"

হাসি আবার অনর্থক লাল হয়ে উঠতে লাগল। পালাতে পারলে বাঁচে। চেষ্টা ক'রে সহজ গলায় বললে,

"জেসং ভাই, ও ফতুয়া ফেলে দাও নেই এখনও?"

"আমি ত বলেছিলাম যে যেদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসব সেই দিন এ ফতুয়া প'রে আসব।"

"বাবা, এইবার তোমাদের খাবার দিই," ব'লে হাসি পালিয়ে গেল।

হাসি চ'লে যেতেই বেচরসিং দাড়িয়ে উঠে বাহাদুরকে সসম্ভ্রমে সেলাম ক'রে বললে, "সরদারজী, আমার সরদার আপনার কাছে কিছু মাগবার জন্য এসেছেন। আপনি মেহেরবানি ক'রে মঞ্জুর করবেন এই আমার প্রার্থনা।"

"খাওয়া দাওয়ার পর শুনব, এখন তোমাদের ক্ষিদে পেয়েছে। সম্ভব হয় ত নিশ্চয় মঞ্জুর করব। এক দিন তোমরা আমার জান বাঁচিয়েছিলে আমি ভুলি নেই।"

খুব আনন্দে ভোজন সমাধা হল। অন্য দুপাঁচজন দলপতিও এসেছিলেন। এক মস্ত বটগাছের ছায়ায় সবাই পান তামাক নিয়ে বসল। তখন বাহাদুর সকলকে জানালেন যে জেসংজী কিছু বলতে চায়, তাঁর ইচ্ছা যে সকলের সাক্ষাতেই কথাবার্ত্তা হোক।

জেসং উঠে দাড়িয়ে মণ্ডলীকে নমস্কার ক'রে বললে, "আমার বাপ খুড়ো কেউ নেই। তাই আমাকে নিজেই বলতে হচ্ছে। আমি বাহাদুরসিং নায়কের কাছে তাঁর মেয়ে হাসিবাইকে চাইতে এসেছি। আমি যথাসাধ্য যত্ন ক'রে তাকে রাখব, কোন কষ্ট হতে দেব না। পণ বাবং সরদারজী যা চাইবেন আমি দিতে প্রস্তুত আছি।"

একজন বৃদ্ধ বললে, "জেসং ভাই, শুনতে পাই তোমার বাবার দল ভেঙ্গে গেছে। তুমি হাসিবাইয়ের মত মেয়েকে রাখবে কি ক'রে?"

জেসংজী অধোবদন হয়ে উত্তর দিলে, "আমি দু বছর প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে ছোটখাটো এক দল খাড়া করেছি। দিন দিন বাড়ছে। আপনাদের দয়াতে শীঘ্র বংশের উপযুক্ত দল গ'ড়ে তুলতে পারব।"

বাহাদুর বললে, "ওসব আলোচনা ক'রে কোন ফল নেই। আমি হাসিকে ছেড়ে থাকতে পারব না। যে হাসিকে চায় তাকে আমার দলে আসতে হবে। রাজী আছ, জেসং ভাই?"

জেসং কিছু বলতে পারলে না দেখে বেচর হাত জোড় ক'রে বললে, "আপনার মত সরদার কি ক'রে ওকথা বলছেন? জেসংজী তাঁর বাপের নাম একেবারে জলে ডুবিয়ে দেবেন?"

বাহাদুর একটু চেঁচিয়েই উত্তর দিলে, "অত কথা আমি ভাবতে পারব না। আমি এই মাত্র বুঝি যে আমি বুড়ো মানুষ, মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারব না। তার পর একথা আমি ভুলতে পারি না যে হাসির ছেলেই ত এক দিন আমার দলের মালিক হবে।"

জেসংজীর মুখে কথা নেই। বেচর আবার জোড় হাত ক'রে বললে, "এক আর্জী আছে সরদারজী। এখনই শেষ কথা কইবেন না। মেলা থেকে যাওয়ার আগে আপনার হুকুম জানিয়ে যাবেন।" তারপর সভাভঙ্গ হল।

হাসি এ সব কথাবার্ত্তার কিছুই শোনে নেই। শুধু দেখলে যে অতিথিরা চ'লে যাওয়ার পর বাপ মুখ গম্ভীর ক'রে ব'সে রইলেন।

জিজ্ঞাসা করলে, "বাবা, তোমার শরীর ভাল আছে ত?"

"খুব ভাল আছে, মা। একটা বিষয় কর্ম্মের কথা হচ্ছিল। একটু শ্রান্ত হয়ে গেছি। পরে তোকে সব কথা বলব।"

সকাল বেলা হাসি খুব লম্ফ ঝম্প করেছিল আজ উৎসবে নাচ গান করতে যাবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া হল না। মনটা

সে রকম হাল্‌কা মনে হচ্ছিল না। পাড়াওয়ে সারা বিকেলটা ঘুরে ফিরে, সন্ধ্যাবেলা একা নদীর ধারে বেড়াতে গেল। কে জানে কেন, ঠিক আগের দিনের জায়গায় গিয়ে বসল। ব'সে ব'সে নানা কথা ভাবতে লাগল। কই, জেসংজী ত তাদের ভোলে নেই। ঠিক মনে ক'রে সেই জায়গায় প'সে এসেছে। মুখে সেই হাসি, যেন তাদের দেখে কত আনন্দ হয়েছে। এমন সময় বাঁশী বেজে উঠল। "আবার বেচর কি করতে এসেছে আজ? জ্বালাতন হয়ে গেলাম।" উঠে দাঁড়াল। কিন্তু যে কাছে এল সে বেচর নয়, জেসং।

হাসির বিরক্তির কোন চিহ্ন রইল না। বললে, "বস। এদিকে বেড়াতে এসেছ বুঝি? নাচতে যাও নেই?"

"না, হাসিবাই। তোমার কাছেই এসেছি। সরদার কি তোমায় বলেছেন আমাদের দুপুর বেলা কি কথা হচ্ছিল।"

"আমি কিছুই জানি না। কিছু বিষয় কর্ম্মের কথা হচ্ছিল এই মাত্র বাবা বলেছেন। তুমি আমাদের দলে আসতে চাও বুঝি, জেসং ভাই?"

"কি ক'রে আসব বল, বাই? অন্য সরদারের দলে ঢুকলে আমার বাবার নাম ডুবল চিরদিনের জন্য। বাবা অনেক কষ্ট পেয়ে মরেছেন। সে কথা ভোলা আমার পক্ষে শক্ত।"

হাসির গলা ভারী হয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছিল?" জেসংএর কাছে পুরানো ইতিহাস শুনে হাসি চোখ মুছতে মুছতে বললে, "সরদার, তোমার গল্প শুনে আমার বড় কষ্ট বোধ হচ্ছে। তুমি চেষ্টা ক'রে একটা বড় দল জমাও।"

"চেষ্টা ত করছি, হাসি। কিন্তু এক বিপদ হয়েছে। কিছুতেই কাজ কর্ম্মে সে রকম মনোযোগ করতে পারছি না। এই

বছর দেড়েক থেকে আর একটা কথা সমস্ত মন জুড়ে ব'সে রয়েছে।"

"এমন কি কথা হতে পারে, যা নিজের ব্যাপার ধান্দার চেয়ে বড় জিনিস?"

"এমনই বড় জিনিস, হাসি, যে যা নইলে ব্যাপার ধান্দা সব মিছে।"

"কি কথা আমায় বলবে না?"

"কেন বলব না হাসি? একটু লজ্জা হচ্ছে। তোমায় ত আগে কোন দিন জিজ্ঞাসা করি নেই।"

হাসির গলার ভেতরটা কি রকম করছিল, কথা কইতে পারলে না। অন্ধকারে জেসং তার মুখ দেখতে পাচ্ছিল না, এটা মস্ত সুবিধা। কিন্তু কথা কইতে গেলেই ধরা পড়বে। লজ্জায় চুপ ক'রে রইল। জেসংজী তখন আস্তে আস্তে তার দুটি হাত ধ'রে খুব ধীরে বললে, "এই সেই জিনিস, হাসি। এ নইলে আমার সবই মিছে।"

হাসি জেসং-এর হাতের উপর মুখ লুকিয়ে তেমনই ধীরে ধীরে উত্তর দিলে, "এই জিনিস! তা নিচ্ছ না কেন?" ব'লে হাসি কাঁদতে লাগল। হাসি যদি কাঁদল, ত জেসং না কেঁদে কি ক'রে থাকবে? দুজনের চোখের ধারা এক হয়ে যাওয়ায় কি আনন্দ তা কে জানে! কিন্তু হাসি আর জেসং মনের সুখে কাঁদলে। কথা কওয়ার অবকাশ হল না।

এমন সময় নদীর পাড় থেকে ডাক এল, "হাসিবাই!" হাসি শুনে লাফিয়ে উঠল, বললে, "বাবা ডাকছেন। আমি যাই?

তুমি কাল আসবে ত ?” ব’লেই দৌড়ল। জেসংজী ব’সে ব’সে নিজের হাতের উপর বার বার মুখ ঠেকাতে লাগল।

বাপ জিজ্ঞাসা করলেন. “হাসি, তোর কাছে ও কে ছিল ?”

“জেসং ভাই এসেছিল, বাবা। সে আমায় নিতে চায়।”

“তুই চ’লে যাবি বুড়ো বাপকে ছেড়ে ? আমি যে তোর বাপ মা দুই রে, হাসি !”

“তা বাবা, জেসংজী আমাদের এখানে এসে থাকুক না। বেচারা জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে।”

“সে কথা আমিও তাকে বলেছি। দেখি কি বলে ?”

সন্ধ্যাবেলা বেচরসিং সব পাড়াও ঘুরে ঘুরে মাতব্বরদের সঙ্গে পরামর্শ ক’রে এসেছে। তাদের সবাইকার এক মত যে এক দলের দুই সরদার ত আর হতে পারে না। জেসং যদি বাহাদুরের দলে যায় ত নিজের দল ছেড়ে দিতে হবে। আর বাহাদুরের দলে এলেও সে বড় জোর রতনসিংএর জায়গা নিতে পারে, তার বেশী নয়। ঠিক হল সকলে বেচরের সঙ্গে বাহাদুরসিংএর কাছে যাবে।

বাহাদুর সারারাত ভেবেছে। সে এটুকু বুঝেছে যে জেসংকে না পেলে হাসির মন ভেঙ্গে যাবে। “এই জন্য কি মেয়েটাকে মানুষ করলাম, এই যন্ত্রণা দেবার জন্য ? নিজের কষ্ট সহ্য করতে আমি রাজী আছি। কিন্তু হাসিকে যদি ছেড়ে দিই ত আমি মলেই দল ভেঙ্গে যাবে। এ কথা আমি ভুলি কি ক’রে ?”

ভোর বেলা উঠেই রতনসিংকে ডাকলে পরামর্শের জন্য। তাকে সব কথা বুঝিয়ে দিলে। সে বললে, “হাসির যখন এত ইচ্ছা তখন তাকে জেসংএর হাতে দিতেই হবে। জেসংজী আমাদের দলে এলে

সবাই আমরা খুসী হব তাও ঠিক। কিন্তু তোমার কি হবে সরদার?"

বাহাদুর বললে, "ডাক সকলকে।" সব দল উপস্থিত হলে পর হাসির হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে উঠল। বললে, "ভাই সব, আমি বুড়ো হয়েছি আর আমার দ্বারা সরদারী হয় না। আমি ছুটী চাই। তোমরা যদি হাসিবাইকে সরদারনী ব'লে মেনে নাও, ত আমার কোন ভাবনা থাকে না। হাসি আমায় দু মুঠো খেতে দেবে, যত দিন বেঁচে আছি।"

রতন সেলাম ক'রে বললে, "আমরা সবাই রাজী। জয় সরদারনী হাসিবাইয়ের।"

এমন সময় বেচর সেই মাতব্বরদের নিয়ে এল। সবাই আবার বটতলায় বসলেন। বাহাদুর বললে, "সরদার ভাই সব, আমি আমার কাজে ইস্তফা দিয়েছি। আজ থেকে হাসিবাই আমার দলের সরদারনী।"

তখন বেচরসিং দাঁড়িয়ে উঠে জোড় হাত ক'রে বললে, "সরদারনী আমার সরদার দলশুদ্ধ আপনার তাবে আসতে রাজী আছেন মাতব্বররা বলুন এটা কি হতে পারে?"

একজন বুড়ো হেসে বললেন, "তা হতে পারে বই কি? একটা দলে দুজন সরদার থাকতে পারে না সত্যি। কিন্তু একজন সরদার আর একজন সরদারনী ত সব দলেই থাকে। রাজসংজী আমাদের পরিচিত ছিলেন, বাহাদুর আমাদের বন্ধু, দুজনের বংশধর এক দিন এই দলের নায়ক হবে এতে আমরা সবাই খুশী।"

বিকেল বেলা মেয়ে পুরুষ সব বঞ্জারীরা জমল সেই বটতলায়। মিছিল ক'রে গান গেয়ে বর ক'নেকে নিয়ে গেল শিবমন্দিরে জোড়ে

প্রণাম করতে। রতনসিং বেচরকে বললে, "ধন্য আমার বুড়ো সরদার। বেঁচে থাক্ তার বেটা বেটী। জীবদ্দশায় সরদারী ছেড়ে দেয় এ রকম কখনও শুনি নেই।"

মন্দির থেকে বর ক'নে ফিরে এলে বাহাদুরসিং জেসংএর মাথায় হাত রেখে বললে, "এটা হবে আমার জানা উচিত ছিল সেদিন, যেদিন মাথার পাগড়ি খুলে তোর মাথায় বেঁধে দিয়ে ছিলাম।" জেসংজী হেট হয়ে বাহাদুরের পায়ের ধুলো নিলে।
